বইয়ের জগৎ

বারোতম সংকলন ।। নভেম্বর ২০১৪

বইমেলা ২০১৫

ফরিদুর রেজা সাগরের নতুন বই

বাংলা টেলিভিশনের ৫০ বছর
অন্যপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা

একাত্তরে ওরা
পাঠক, কলকাতা

হিজলতলীর মাঠে সশার এসেছিলো
কুঁড়েঘর, ঢাকা

কটগাছের মধুরহস্য ও ১২টি গল্প
কথাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা

একটি পোষা ভূতের গল্প
ছায়াবীথি, ঢাকা

ছোটদের জন্য কিছু লেখা
অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা

জানা মুখ অজানা রূপ
মানুষের মুখ-৪

কুয়াকাটায় কারসাজি

ছোটনায়ক

সাতটি সাত রকম

আমরা সবাই রাজা
অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা

কিশোর সমগ্র-১১
সময় প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

মমির লাঠি রহস্য
চিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা

রাতুল মামা ফিল্মস্টার
চন্দ্রাবতী একাডেমী, ঢাকা

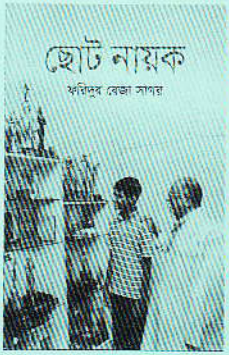

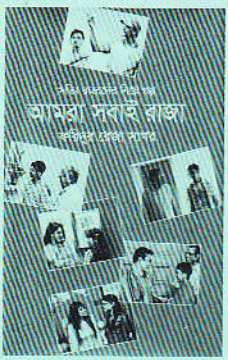

বইয়ের জগৎ

বারোতম সংকলন ।। নভেম্বর ২০১৪

বইয়ের জগৎ বারোতম সংকলন

সম্পাদক
আহমাদ মাযহার

সম্পাদনা সহযোগিতা
পিয়াস মজিদ
প্রামাণ্যকরণ সহযোগিতা
ওয়াসিফ-এ-খোদা

প্রচ্ছদ ও নামলিপি
লুৎফর রহমান রিটন

প্রাকমুদ্রণ
গতি প্রকাশনী
২০ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

কপি-সম্পাদনা
sompadona@gmail.com

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক ৩৬/ডি, ব্লক ডি, সড়ক-২, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত
এবং সংবেদ প্রিন্টিং প্রেস, ৮৫/১, ফকিরের পুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৪। মুঠোফোন : ০১৭১১৮১৯১৪১, ই-মেইল : boierjagat@gmail.com

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫-তে আমরা

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য

জীবনস্মৃতি এবং রচনাসমগ্র

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বুলবুল চৌধুরী এখনও এক জীবন্ত কিংবদন্তি। নৃত্য ও শিল্পকলায় তাঁর সৃষ্টি এখনও অনুপ্রেরণা জোগায় অসংখ্য মানুষকে। জীবনকাল ছিল মাত্র ৩৫ বছরের। এরই মধ্যে শিল্পী ও শিল্পস্রষ্টা হিসেবে রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় কীর্তি। চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্য রচনায়ও তাঁর আগ্রহ ছিল, যদিও প্রতিভার সার্বিক স্ফুরণ ঘটেছিল নৃত্যশিল্পে। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে হয়ত স্বল্পস্থায়ী ছিল তাঁর জীবন, কিন্তু গভীরতা, কীর্তি ও তাৎপর্যে তা ছিল সমুদ্রসম। বুলবুলকে নিয়ে জীবনসায়াহ্নে আফরোজা বুলবুল তাঁর স্মৃতিকথা লিখে গেছেন সুন্দর এই পৃথিবী আমার শিরোনামে। শিরোনামটি থেকে বোঝা যায়, তাঁর এই সুন্দর পৃথিবীটি ছিল বুলবুল চৌধুরী।

সদ্য প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ বাঙালির ইতিহাস চর্চায় ও ইতিহাস সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন গত প্রায় ৮টি দশক। তিনি স্মৃতিকথা শুরু করেছিলেন তাঁর শৈশবকাল থেকে। ইচ্ছা ছিলো ১৯৭১ পর্যন্ত স্মৃতির প্রথম অংশ শেষ করবেন। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি স্মৃতিকথা লিখেছেন, শেষ করেছেন ১৯৬০ পর্যন্ত। জাতি তাঁর পুরো স্মৃতিকথা পেলে জানা যেতো অনেক অজানা কথা। এ অসমাপ্ত স্মৃতিকথায় তবুও আমরা পাঠককে উপহার দিতে পারছি বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি গঠনে টুকরো টুকরো প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের কথা। তাঁর শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি বাঙালির জাতিগঠন ও ইতিহাস মনস্কতা সৃষ্টিতে বিশেষ বার্তা রয়েছে।

বাংলাদেশে নোবেলবিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের মত জগৎখ্যাত ব্যক্তিত্বের ছেটবেলা শুরু হয় এভাবেই, "বুবু, বড়দা, আমি, ইব্রাহীম ও টুনু–এই পাঁচ ভাইবোনের পর আমার আম্মা আরও চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। আইয়ুব, আজম, জাহাঙ্গীর ও মঈনু ছিল তাদের নাম। চৌদ্দটি সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন আম্মা। তবে এদের মধ্যে পাঁচটি সন্তান শিশুকালেই নেয় চিরবিদায়। এত বড় এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে খুবই অল্প বয়সে আমি অনেক ভার নিতে শিখেছিলাম। শিখেছিলাম শিশুপালন ও পারিবারিক বিশ্বস্ততার গুরুত্ব। পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সমঝোতার মূল্য।".... মুহাম্মদ ইউনূসের ছোটবেলা নিয়ে লিখেছেন সিরাজ উদ্দিন সাথী

কমরেড আলাউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের সুপরিচিত নাম। মতিন-আলাউদ্দিন গ্রুপটির ছিল শ্রেণি সংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর স্নেহধন্য ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। সংগ্রামী মানুষটি শুধু একজন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, ছিলেন চিন্তক ও লেখক। রচনাসমগ্র গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা কবি আফরোজা অদিতি। এই রচনাসমগ্র প্রকাশ এদেশের রাজনৈতিক সচেতন মানুষের জন্য নিঃসন্দেহে এক প্রাপ্তিযোগ।

মানুষ জীবনসায়াহ্নে এসে তার অতীত জীবনে ফিরে যেতে চায়। জীবনচক্রের ঘূর্ণায়মান কাঁটা শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়, প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ– এই আবর্তে মানুষ জীবনকে খুঁজে। এ বি এম হোসেন এই চক্রাকার পথ ধরেই রচনা করেছেন তাঁর আত্মজীবনী। লেখকের কাছে এটি নিছক স্মৃতিচারণ হলেও পাঠক এর মধ্যে শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের খুঁটিনাটিও খুঁজে পেতে পারে। এই গ্রন্থে যথাযথভাবে একজন ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বেরিয়ে এসেছে।

নতুন-পুরনো আরো রয়েছে

আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি
আবুল হাশিম

My Life In Melodies
Abbasuddin Ahmed
Translated by Nashid Kamal

আত্মজীবনী
আবু রুশদ

আমার ছেটবেলা
কবীর চৌধুরী

পথে যা পেয়েছি
১ম ও ২য় পর্ব
মোঃ আনিসুর রহমান

কত যারে দিলে ঠাঁই
১ম ও ২য় পর্ব
মাহফুজুর রহমান

আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবির চান্দ অনূদিত

Aide-Memoire
1943-1954
Hasnat Abdul Hye

All Those Yesterdays
1954-1964
Hasnat Abdul Hye

From the Horse's Mouth
1965-2000
Hasnat Abdul Hye

গুরুস্মৃতি ও জাতিস্মৃতি
জীবনের জলরেখা
মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

আইভান মেলভিন রজার্স
দ্য চাইল্ড সোলজার
আশরাফ আল দীন অনূদিত

প্রাঙ্গণে মোর
টোকা ডায়েরির পাতা থেকে
জয়নাল হোসেন

From Naogaon To
New Yourk
Mahfuzur Rahman

Adorn BOOKS

অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০, ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ০১৯২২১০৬৬৩৫
e-mail : adorn@bol-online.com www.adornbooks.com
ঢাকায় পাওয়া যাচ্ছে : প্রথমা, মধ্যমা, পাঠক সমাবেশ, পলল প্রকাশনী, বিদিত, পাঠশালা, প্রকৃতি বাতিঘর, অরণি প্রজেক্ট, Words 'n Pages, PDS ও নিউমার্কেট এবং চট্টগ্রামে জামাল খানের বাতিঘর

চট্টগ্রামে প্রাপ্তিস্থান
বই আড্ডা
মোহনা ম্যানসন (৩য় তলা), আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম, ফোন: ৬১৬০১০, ০১৮১৯০১৬২৬২

ঘরে বসে অ্যাডর্নের বই পেতে রকমারি অনলাইনে www.rokomari.com/adornpublication অথবা ফোনে ০১৫১৯৫২১৯৭১ হটলাইন: ১৬২৯৭

অন্তরশক্তির শ্রীবৃদ্ধির কারিগর

সম্পাদকীয়

শুরু থেকে ১২তম সংকলন মিলিয়ে এ পর্যন্ত বইয়ের জগৎ দুইশত উনষাটটি বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ করেছে। এর সবই বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ নিয়ে। যে-সব বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, যথা–কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ তো ছিলই; এর বাইরে ছিল ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্পকলা, সিনেমা, তুলনামূলক ধর্ম, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, টেলিভিশন, জীবনী, সংকলন, ছড়া, ছোটদের গল্প, ছোটদের উপন্যাস, ভ্রমণ, প্রকৃতি, গণিত, কল্পবিজ্ঞান, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়! সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বই-প্রকাশনায় বিষয়বৈচিত্র্যের যে বিস্তার ঘটেছে তার একটা প্রতিফলন বইয়ের জগৎ-এ ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

২০০৯ সালের নভেম্বরে যাত্রা শুরু হয়েছিল বইয়ের জগৎ-এর। বছরে ৪টি সংকলন বের করা সম্ভব হয়নি। বরং পূর্ববর্তী সংকলনের সাথে পরবর্তী সংকলন প্রকাশের সময়ের ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে। এই প্রতিকূল সময়েও যাঁরা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা বিলম্বেও ধৈর্য্যহারা হননি। সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছায় শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখল বইয়ের জগৎ বারোতম সংকলন। পাঠকদের এই বলে আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে বিলম্ব হলেও বইয়ের জগৎ-এর প্রকাশে যত্নের কোনো ঘাটতি রাখা হয়নি। পরের সংকলনের কাজও অনেকদূর এগিয়ে রয়েছে। আশা করা যায় পরবর্তী সংকলন শীঘ্রই প্রকাশ করা সম্ভব হবে এবং সময়ের ব্যবধান অনেকখানি কমে আসবে।

যাঁরা নিয়মিত বইয়ের জগৎ দেখেন তাঁরা অনুভব করবেন যে প্রবীণের প্রজ্ঞা ও তারুণ্যের উজ্জীবন বইয়ের জগৎ-এ সমাহৃত হয়েছে। কারণ আমরা মনে করি বর্তমানের পৃথিবীটা আগামীর জন্য ক্রিয়াশীল। তাই সচেতন পাঠকেরাই আমাদের লক্ষ্য, তাঁরাই আমাদের অবলম্বন ও ভরসা। সুতরাং আমরা আশাবাদী। বইয়ের জগৎ প্রকাশিত হয়ে চলবে স্বাভাবিক গতিতে।

সূ | চি | পা | তা

কিশোর উপন্যাস

চোরাগঞ্জের গল্প
কাইজার চৌধুরী
.....
মার্জিত হাস্যরসের কিশোর-কাহিনি
রুশিদান ইসলাম রহমান ▮ ৯

আত্মজীবনী

অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান
.....
শেখ মুজিবের আত্মজীবনী : পাঠ পর্যালোচনা
১৩ ▮ হাসান শফি

কবিতা

জগৎ ভ্রমিয়া...
বায়তুল্লাহ্ কাদেরী
.....
'সেই মত চলিছে প্রাণের মীন'
নিপা জাহান ▮ ১২৬

স্মৃতিকথা

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
লুৎফর রহমান রিটন
.....
লুৎফর রহমান রিটনের স্মৃতিগদ্য
৫১ ▮ ইফতেখারুল ইসলাম

উপন্যাস

নার্গিস
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
.....
নার্গিস : একটি পুষ্পের বিস্তার
মহীবুল আজিজ ▮ ৫৬

কবি ও কামিনী
জাকির তালুকদার
.....
আইয়ামে জাহেলিয়ার প্রেমোপাখ্যান কবি ও কামিনী :
শৈল্পিক সুবাতাসে শাশ্বত কবি-হৃদয়
৯৯ ▮ খোরশেদ আলম

সাবিত্রী উপাখ্যান
হাসান আজিজুল হক
.....
রূঢ় বাস্তবতা, খটখটে ডাঙা ও সাবিত্রী উপাখ্যান
রাজীব সরকার ▮ ১০৭

রাজনীতি

বাঙালির জাতীয়তাবাদ
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
.....
পুনশ্চ জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ
জাকির তালুকদার ▮ ৬২

Bangladesh : State of the Nation
আবদুর রাজ্জাক
.....
জাতীয় অধ্যাপকের জাতির অবস্থা বিচার
১১৪ ▮ আহমেদ লিপু

সংকলন

গদ্যমঙ্গল
বিলু কবীর

গদ্যমঙ্গল : কুষ্টিয়া যেখানে গদ্যময়
আদিত্য শাহীন ▮ ৭৮

ব্যাকরণ

অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ
শিশির ভট্টাচার্য্য

ব্যাকরণের সদর ভাষার অন্দর
৮৩ ▮ মোহাম্মদ আজম

দিনলিপি

ভাব-বুদ্বুদ
আহমদ শরীফ

আহমদ শরীফ, ভাবনালোক
আহমেদ লিপু ▮ ১২০

প্রতিক্রিয়া

ফ্রিডরিখ নিৎসে
ফজলুল আলম

সমালোচক-লেখক দ্বন্দ্ব : আহমেদ লিপুর সমালোচনার দিক দিগন্ত– বিস্তৃত ও সংকীর্ণ
১৩৬ ▮ ফজলুল আলম

কি|শো|র|-|উ|প|ন্যা|স

মার্জিত হাস্যরসের কিশোর-কাহিনি

রুশিদান ইসলাম রহমান

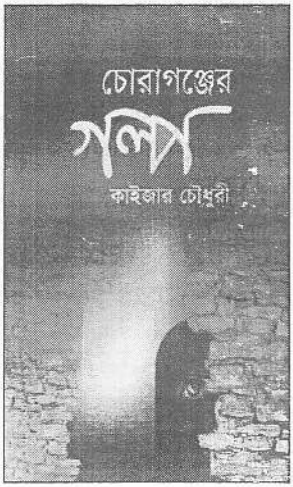

চোরাগঞ্জের গল্প
কাইজার চৌধুরী
প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : ২০১৩
৮০ পৃষ্ঠা
১২০ টাকা

২০১৩ সালের অমর একুশের বইমেলাতে খুঁজে খুঁজে বেশ কিছু কিশোর-উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহ কিনেছিলাম। তার মধ্যে কাইজার চৌধুরীর বই *চোরাগঞ্জের গল্প* বইটি ছিল। দেখলাম তাঁর রচনা নিয়ে বেশ কয়েকখণ্ড *কিশোরসমগ্র*ও প্রকাশিত হয়েছে। বইতো পড়বোই, কিন্তু তার কোনো একটি বইয়ের ভূমিকা পড়েই মনে হলো, একটু নতুন কিছু পড়লাম, নতুন কথা, নতুন স্টাইলে বলা কথকতা।

যে বইটির বিষয়ে এখানে লিখবো তার ব্লার্বে যা লেখা হয়েছে সেটাও একটু সন্দিগ্ধ হবার মত, লেখকের নিজের স্বীকারোক্তি, গল্পগুলোতে পুনরাবৃত্তির সন্দেহ। একটু উদ্ধৃত করলে স্পষ্ট হবে:

> ...সব কটি গল্পে ঘুরে ফিরে ওই একই বয়ান, একই সংলাপ। ... কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম আর পেশার পরিচয় বাদে সব গল্পই যেন একটা অন্যটার কার্বন কপি।

একটু পড়লেই মনে হবে, আচ্ছা দেখা যাক, এটা কি সত্যি! বইয়ের বিষয়ে আগ্রহ লাগানোর জন্য গল্পের সারসংক্ষেপ বা প্রশংসাসূচক বক্তব্যের তুলনায় এটা তো বেশিই কার্যকর। কাজেই বইটি পড়তেই হলো।

সঙ্গে সঙ্গে লেখকের আরো কিছু গল্প, রোমাঞ্চ-উপন্যাস ধরলাম। এই লেখক চোর-ডাকাতদের ভালো করেই ধরেছেন দেখা গেল। না, মানে দেখতে পাইনি—মানে চোর-ডাকাত ধরাটা দেখতে পাইনি, জানতে পেরেছি। (তবে লেখককে দেখিনি, এমন কথা কিন্তু বলছি না)।

এবার সরাসরি কাহিনীর কথায় চলে আসি। কাহিনী যেভাবে বুনেছেন লেখক, তাতে বুদ্ধির দীপ্তি রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দামু আর দোকানদার গনেশ হালদারের সাক্ষাৎ। তা থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় চোরা পাঁচু ও বুড়োকর্তার। তার পরের অধ্যায়েই চোরা পাঁচুর আবির্ভাব, আরেকটা কাকির বাড়িতে। কাকি তাকে শোলমাছ সহযোগে ভাত খেতে দেয়। পাঁচুর মায়ের কথা মনে পড়ে। বর্ণনাগুলো এমন যে, চোরা পাঁচুর 'চোরাত্ব' বিষয়ে সন্দেহ ঘনায়। পাঁচু কেন 'চোরা পাঁচু' সে-কথা খোলাসা হয় অনেকটা পরে। মাঝে কয়েকটি অধ্যায় থানার দারোগাদের ভূমিকা বা ভূমিকাহীনতার বয়ান, জমিদার, অর্থাৎ বুড়োকর্তার ব্যাপার-স্যাপার।

পাঁচুর অর্থাৎ তার বাবার ঘরদোর, জমি-জিরেত জয়নাল মোড়ল কবজা করেছে। আর পাঁচুর বাবা-মাকে খুন করেছে, করে লাশ গুম করেছে। তারপর পাঁচুর ঠাঁই হলো নিজের বাড়িই মানে যেটা এখন জয়নালের, গোয়াল ঘরে। তারপর নিজের বাড়িতেই সে বেগার খাটে, মোড়লগিন্নি তাকে একবেলা খাওয়ায় তো আর কয়বেলা উপোস রাখে।
'এমন জ্বালা আর কয়দিন সইবে পাঁচু? তাই চুরি-ডাকাতিতে মন দিতে হলো'। শুরু হলো মোড়ল গিন্নির থালা-বাসন দিয়ে, তারপর গ্রামের হাঁস, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি। সেই থালা-বাসন চুরির বিষয়ে জয়নাল থানায় নালিশ করেছে। গ্রামছাড়া হয়েছে পাঁচু। এ যেন 'দুই বিঘা জমির' সেই 'তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।'
জয়নাল মোড়ল শুধু যে পাঁচুকেই চৌর্যবৃত্তিতে ঠেলে দিয়েছে তা নয়। আরও চোর-ডাকাত আছে কাহিনীতে। নিজের শ্যামল কিসলুকে সিঁদ কাটার দীক্ষা দিয়েছে। কেমন করে সে ভাঙা ভূতুড়ে রাজবাড়ি বা বহুআগে খুন হওয়া জমিদারের (নাকি আসলে ডাকাতের) বাড়িতে ট্রেনিং নিচ্ছে তার উপভোগ্য বর্ণনা, কিছুটা উদ্ধৃত না করলেই নয়।

> গাঁয়ের মাথায় নদীর ধার ঘেঁষে দরদালানের যে ধ্বংসাবশেষ... ওই রাজবাড়ির ধারে কাছে ঘেষতে চায় না কেউ। ... সিঁদ কাটার পয়লা সবক হিসেবে শাবলের ঘা বসিয়ে দেয় রাজবাড়ির দেয়ালের গোড়ায়। এমন ধারাতেই চলল রাতের পর রাত। [পৃ. ২৪]

কখনও হয়তো ধারে কাছে পেঁচা বলে হুতুম। কিসলু সেই পেচকের সাথে সংলাপে বলে

> ...হুতুম নয়, বল হুকুম, ওই দুলামিয়ার (জয়নাল) হুকুম। [পৃ. ২৩]

তারপর

> ...দেয়ালটা কেন যেন ঘায়েল হয়ে পড়ে। হারিকেনের আলোয় কিসলু স্পষ্ট দেখল, একটা ফোকর হাঁ করে উঠেছে। [পৃ. ২৬]

গ্রামের থানার দারোগার প্রকৃত দায়িত্ব পালন স্বল্প হলেও কাহিনীতে নতুন নতুন যোগ দেওয়া দারোগার ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। একেকজন আসে। বহু আগে মৃত, ধ্বংস হওয়া বুড়োকর্তা চুরির নালিশ নিয়ে আসে। ভূতুড়ে ঘটনাগুলোর বর্ণনাও বিস্তৃত, এবং বলাই বাহুল্য। সেই বিবরণ উপভোগ্য। কাজেই গল্পের বেশ কিছু পৃষ্ঠা তারা যদি নেয় তো নিক।

তবে তার মধ্যে জ্ঞানের কথাও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু। যেমন,

> ... থানার যে দারোগা, তার তো কাজের মধ্যে হয় আপিসঘরে টোকা মেরে যাওয়া, নয়তো খেতের পটল-ঢ্যাড়সের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপজোখ করা, এই তো। [পৃ. ১৪]

কেন কাজ নেই তার? কারণ 'গায়ের তামাম চোর-ডাকাত ডেরা বেঁধেছে শহরে।' কেন গাঁয়ের যোগ্য ছেলেগুলো শহরপানে ধায়? তার উত্তর দিয়েছে দুপাতা জুড়ে,

> ... গাঁয়ে বসে টাকাকড়ি কতই বা আর কামাবি? [পৃ. ১৬]
>
> .... রাজ্যির যত টাকা, সব তো ঢাকাতেই। বলতে পারিস, টাকাকড়ির চাপে ঢাকা পড়ে আছে... [পৃ. ১৬]

গল্পের সবটাইতো আলোচনার ভেতর দিয়ে ফাঁস করে দেওয়া যায় না, শুধু রাজবাড়ির, বুড়োকর্তাদের রহস্যটা একটু বলা দরকার। আসলে বুড়োকর্তা, যিনি কিনা হয়ে উঠেছেন, জমিদার, আসলে ছিল ডাকাত। তার ছেলে ভোলা খাঁ বাবার অত্যাচারের বিষয়ে ভীষণ ঝেড়েছে। তারপর বাড়ি ছেড়েছে। সেই জমিদারের ভাই চলে গিয়েছে নিরুদ্দেশ, ভাস্তের 'কমিউনিস্ট' মার্কা ভাষণে সে আপ্লুত হয়েছে।

এসব পড়ে মনে হয়েছে, 'আহারে, আজকের দুর্নীতিবাজ-অত্যাচারী-অত্যাধুনিক চোর-ডাকাতদের ছেলে ভাইয়েরাও যদি এরকম বিপ্লবী বুলি ঝেড়ে সেই সম্পদের সংস্রব ত্যাগ করতো, তাহলে এদেশ কেমন সোনার দেশ হয়ে যেত।' তাতো আর হবেন না। বরং চোরা পাঁচুর মত ক্ষুদে বা প্রান্তিক চোরদের বস্তাবন্দী হয়ে আসতে হবে থানাতে, যেমনটি এই কাহিনীর শেষের দিকে ঘটেছে।

এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ, অন্তত আমার কাছে মনে হয়েছে গল্প বা প্লট নয়। গল্পের ভিতটি ভালো কিন্তু সেটা উপস্থাপন করা হয়েছে যেভাবে, সেইটি চমকপ্রদ। নতুনত্ব রয়েছে। আবার ইতিমধ্যেই বলেছি, রয়েছে জ্ঞানের কথা। কিন্তু এদেশের চোরা সে-সব কথা শুনতে তো আগ্রহী নয়—প্রবাদ অনুসারে সেকথা জেনেছি। ভৌতিক অংশগুলোতে বর্ণনা ও ভাষা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ।

প্লটটি এগিয়েছে তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে, মৃত মানুষ বুড়ো কর্তার দারোগাদের কাছে নালিশ নিয়ে উপস্থিতি, জয়নাল মোড়লের কারসাজি এবং চোরা পাঁচুর হেনস্থা।

কাজেই সামাজিক দিকটি চাপা পড়ে যায় নিভৃতের আড়ালে। খুনে ডাকাত মোড়লের অত্যাচার শোষণের আর পাঁচুদের অসহায়তার সমাজচিত্র হিশেবে সুনিপুণ এই গ্রন্থ।

এই বইটি এবং কাইজার চৌধুরীর আরো কিছু গল্প পড়ে তাঁর ভাষাশৈলী ও তাতে হাস্যরসের মিশ্রণ দেখে মনে হলো কিশোরদের জন্য যেসব গ্রন্থ আজকাল রচিত হয়, সেখানে এই বিষয়টি কেন যেন আজকাল অবহেলিত। তরুণসমাজ যে-সব বই পড়বে তা থেকেই গড়ে উঠবে তাদের বলার এবং লেখার ভাষা। কাজেই সাহিত্যসুলভ ভাষায় রচিত গল্প-উপন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসলে শুধু গল্প বলাটাই যে সাহিত্য নয় সেকথাটি ভুলে যাওয়া ঠিক নয়! ছোটদের সাহিত্যে সুকুমার, প্রেমেন্দ্র, সত্যজিৎ, সুনীলের মার্জিত হাস্যরস, বুদ্ধিদীপ্ত ভাষাই তো তখনকার কিশোরদের আজ সাহিত্যিক, সমাজবিদ, লেখক হিসেবে এগিয়ে নিয়েছে।

কাইজারের ভাষাশৈলীতে নতুন করে আমরা পাচ্ছি মার্জিত হাস্যরস। 'শিব্রামীয় পান' তিনি পাঞ্চ করেছেন সাবলীল দক্ষতায়। সেটা সংলাপে এসেছে, প্রবাহিত হয়েছে দ্রুত লয়ে তাঁর বর্ণনাগুলোতে। এই ভাষা ও ভঙ্গী শুধু যে আনন্দায়ক তা নয়, এ যে রীতিমতো সংক্রামক (আমার এই লেখাটিতেও মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়েছে এই ভঙ্গী)।

অবিমিশ্রভাবে প্রশংসা করে গেলে কারো কারো সন্দেহ হতে পারে যে, এটা পক্ষপাত হচ্ছে। কাজেই প্রশংসাগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য দুএকটি সমালোচনার আঘাত প্রয়োজন।

চোরাগঞ্জের গল্প পড়তে গিয়ে আমি যে সমস্যাটির মুখোমুখি হয়েছি, তা হচ্ছে এই স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীতে এতগুলো চরিত্র দুদ্দাড় করে ঢুকেছে যে, তাল রাখা কঠিন হয়। দু-

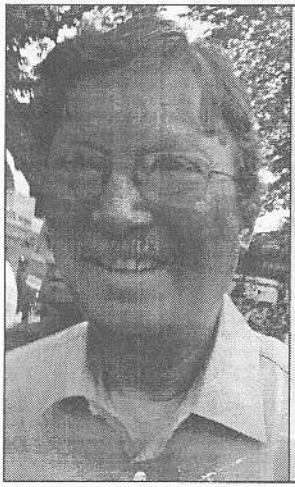

কাইজার চৌধুরী

> এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ, অন্তত আমার কাছে মনে হয়েছে গল্প বা প্লট নয়। গল্পের ভিতটি ভালো কিন্তু সেটা উপস্থাপন করা হয়েছে যেভাবে, সেইটি চমকপ্রদ। নতুনত্ব রয়েছে। আবার ইতিমধ্যেই বলেছি, রয়েছে জ্ঞানের কথা। কিন্তু এদেশের চোরা সে-সব কথা শুনতে তো আগ্রহী নয়—প্রবাদ অনুসারে সেকথা জেনেছি। ভৌতিক অংশগুলোতে বর্ণনা ও ভাষা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ।

একটি অপ্রয়োজনীয় চরিত্র বাদ দিলে ভালো হতো। আবার ভাষার যে শৈলীর প্রশংসা করেছি, সেটাই আবার ক্ষেত্রবিশেষে একটু বেশি প্যাঁচালো হয়ে গিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা তৈরি করে। কাহিনীর খেই ধরে রাখা, প্যাঁচালো ভাষায় চোরা পাঁচুর পাঁচালি বা প্যাঁচাল বুঝে ওঠা, মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে ওঠে। তবুও ধৈর্য্যের সাথে বইটি শেষ করতেই হবে, কারণ এর বিকল্প নেই।

এমন বই আরও আসবে আশা করছি, কারণ এদেশে চোর-ডাকাতদের দ্রুত সমৃদ্ধি ঘটেছে। চুরির ধরন, লক্ষ্যবস্তু বাড়ছে। ছিঁচকে চোর, পুকুর চোর, নদী চোর, সেতু চোর, ভোট চোর সবাইকে নিয়ে আরও সমৃদ্ধ হবে চোর-ডাকাতের গল্প।

রুশিদান ইসলাম রহমান: জন্ম ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫১ অর্থনীতিবিদ-শিশুসাহিত্যিক। পেশা: অর্থনীতি গবেষণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *সানুর আঁকাবাঁকা বুদ্ধি* (২০০৯), *সানু এখন ক্রিকেটের মাঠে* (২০১২), *লাস্ট বেঞ্চের ছেলেটি* (২০১৪) [কিশোর-উপন্যাস]

প্রাপ্তি উৎস: প্রথমা, ফোন: ৮১৮০০৮০০, ০১৭১১৬৪৯৪২২, ০১৫৫২২০৩০৩৬
e-mail:prothoma@prothom.alo.info

শেখ মুজিবের আত্মজীবনী : পাঠ পর্যালোচনা

হাসান শফি

অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান
প্রথম প্রকাশ: ২০১২
ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা
৩৩০ পৃষ্ঠা
৫২৫ টাকা

তাঁকে কেউ জাতির পিতা নাকি স্বাধীনতার স্থপতি বলবেন, তাঁর নামের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে বঙ্গবন্ধু শব্দটি ব্যবহার করবেন কি না, সেটি যাঁর যাঁর রাজনৈতিক বিবেচনা, ইতিহাসবোধ কিংবা হয়তো তার চেয়েও বেশি নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। কিন্তু যে-সত্যটি বোধহয় কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয় তা হলো বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডটির গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে তাঁর চেয়ে অধিক প্রভাব আর কেউ বিস্তার করতে পারেন নি। সেদিক থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থটি যেভাবে বা যতটা পঠিত ও আলোচিত হওয়া দরকার, তা হয়েছে বলে মনে হয় না। পৃথিবীর সবদেশেই বড় ও কীর্তিমান মানুষকে ঘিরে কমবেশি অতিকথার জ্যোতির্বলয় রচিত হয়। মহাপুরুষেরাও যে রক্ত-মাংসের মানুষ, দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নন, একথাটা আমরা কমই মনে রাখতে পারি। অনুরাগীদের তরফে প্রশ্নহীন আনুগত্য ও অন্ধভক্তি, আর বিরোধীদের দিক থেকে আক্রোশী সমালোচনা ও সার্বিক প্রত্যাখ্যান এটাই আমাদের দেশে ব্যক্তিত্ব বিচারের সাধারণ প্রবণতা। এ রকম একটি পরিবেশে শেখ মুজিবের

এই আত্মজীবনীটি তাঁর রাজনৈতিক সমর্থক বা বিরোধী কারো কাছেই খুব স্বস্তিদায়ক বলে বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। গ্রন্থটি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় যে বলবার কথাটি তা হলো এটি একটি ভানহীন রচনা। মুসলিম লীগের একজন তরুণ কর্মী থেকে পাকিস্তানের বিরোধী-রাজনীতির সামনের সারির একজন সংগঠক হয়ে ওঠা পর্যন্ত দিনগুলোর স্মৃতিচারণ তিনি এই বইটিতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে করেছেন। জন্মেই তিনি নেতা হয়ে যান নি, কেউই তা হন না, যদিও আমাদের কোনো কোনো পণ্ডিত ও গবেষকের লেখায় সেভাবেই তাঁকে তুলে ধরা হয়। তিল তিল করে অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি প্রথমে মুসলিম লীগ ও পরে আওয়ামী লীগের কর্মী, সংগঠক ও নেতা থেকে শেষে জাতির ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। স্ত্রী-কন্যা-পুত্র তথা পরিবার-পরিজন থেকে মাসের পর মাস বিচ্ছিন্ন থেকে দলের, দেশের জন্য কাজ করেছেন। জীবনের অনেকগুলো বছর তাঁর কেটেছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। এদেশের বাম রাজনীতিতে অবশ্য এমন ত্যাগী কর্মী ও নেতার অভাব নেই। সে-রাজনীতির এমন অজস্র নেতা-কর্মীর নাম প্রায় এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করা যায় যাঁদের জীবনের প্রায় সবটা সময় জেলে ও আত্মগোপন অবস্থায় কেটেছে। সংসার জীবন যাপন বা পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের সময়-সুযোগ কোনোটাই যাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু এদেশে মূলধারার রাজনীতি বলতে আজ আমরা যাকে বুঝি, এবং শেখ মুজিব যে ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় ব্যক্তি দু-একজনও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। দীর্ঘ বন্দিজীবনের অনুভূতি মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে মাত্র দু'একটি কথায় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

> ...বহুদিন সূর্যাস্তের পরে বাইরে থাকতে পারি নাই। ... সন্ধ্যার পরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেয়। জানালা দিয়ে শুধু কিছু জ্যোৎস্না বা তারাগুলি দেখার চেষ্টা করেছি।
>
> [পৃ. ১৭৭]

মুজিবের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শত্রুমিত্র সবাই যার স্বীকৃতি দেন। তাঁর আত্মজীবনীতেও যার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিশোর বয়স থেকেই তিনি যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন, এবং পরবর্তী জীবনেও যাঁরা তাঁর সাহচর্যে এসেছেন, দলমত নির্বিশেষে, তাঁদের সবার কথাই তিনি মনে রেখেছেন। এমন কি একেবারে ছোটবেলায় যেসব ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের নামও তিনি লিখে যেতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে কিংবা কোনো বিষয়েই যে তিনি নোট রাখতেন, তাজউদ্দিনের মতো নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন, তাও নয়। তারপরও স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই ঘটনার যে বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা রীতিমতো বিস্ময় জাগায়। যেমন দিল্লি ও আগ্রা পরিদর্শনের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। এ-প্রসঙ্গে প্রচলিত কিংবদন্তি ইত্যাদির উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। তাজমহল দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আজও একুশ বৎসর পরে লিখতে বসে তাজের রূপকে আমি ভুলি নাই, ভুলতে পারব না।" [পৃ. ৫৯] সেবার মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশন থেকে ফেরার পথে আগ্রা ভ্রমণে ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন তাঁদের দলনেতা। এমন কি হোটেল ভাড়ার টাকাও তিনিই দিয়েছিলেন [ফজলুল কাদের নিজে হোটেলের একটি কক্ষে ছিলেন, মুজিবসহ

দলের বাকি ডজন খানেক সদস্যের জন্য হোটেলের বাইরে দুটো তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল]। [পৃ. ৫৭] আত্মজীবনী লেখার সময়, এমন কি তার অনেক আগে থেকেই ফজলুল কাদের যদিও তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, তাঁর প্রতি সেদিনের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করতে তিনি ভোলেননি।

২

তাঁর জন্ম হয়েছিল এক গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। নিজেই লিখেছেন তিনি, 'টিনের ঘরে' তাঁর জন্ম। [পৃ. ৩] দেউলিয়া অবস্থায় তাঁর দাদা-চাচাদের দিন কাটতো 'দিনভর দাবা আর পাশা' খেলে। [পৃ. ৬] বাবা ও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট পারিবারিক বিপর্যয় মোকাবেলায় মুজিবের পিতাকে এন্ট্রান্স পাশ করার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়। [পৃ. ৭] মাত্র বার/তের বছর বয়সে তিন বছর বয়সী রেনু ওরফে ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে মুজিবের বিয়ে হয়। কেন বা কোন পরিস্থিতিতে এই বিয়ে হয়, তাও মুজিব খোলাখুলিভাবেই জানিয়েছেন। [পৃ.৭] আজকের দিনে তাঁর বাংলাদেশী জীবনীকারদের কেউ এভাবে বিষয়গুলোকে তুলে ধরতেন কি না সন্দেহ। ভাগ্যিস, মুজিব নিজেই লিখে গেছেন। যেমন ছোটবেলা থেকেই যে তিনি 'খুব দুষ্ট প্রকৃতি'র ছিলেন, [পৃ. ৮] ছিলেন 'ভীষণ একগুঁয়ে', মারপিট করতেন, ওই বয়সেই তাঁর 'একটা দল ছিল — দলের ছেলেদের 'কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না', 'একসাথে ঝাঁপিয়ে' পড়তেন, অসুস্থতার জন্য যে তিনি ছোটবেলায় কয়েক বছর লেখাপড়া করতে পারেননি, সহপাঠীদের মধ্যে বয়সে বড় ছিলেন, এসব কথা তিনি অকপটেই উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। [পৃ. ১০] একেবারে ছোটবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং সুভাষ বসুর ভক্ত হলেও, [পৃ. ৯] এবং সেসময় হিন্দু-মুসলমান ভেদ না বুঝলেও, পরিস্থিতির শিকার হয়ে [স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে তাঁকে এক সপ্তাহ হাজতবাস করতে হয়] কিভাবে তিনি অচিরেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির অনুসারী হয়ে পড়েন, [পৃ.১৩] নিজ এলাকায় মুসলিম ছাত্র লীগ ও মুসলিম লীগ সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন, আত্মজীবনীর গোড়ার দিকেই তিনি তার সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। বস্তুত মুজিব যখন স্কুলের ছাত্র তখন অবিভক্ত বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দির গোপালগঞ্জ সফর (১৯৩৮) উপলক্ষে সেখানে তাঁদের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে গিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়, তা-ই তাঁকে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। লিখেছেন, এর আগে তাঁর কাছে 'হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো জিনিস ছিল না'। [পৃ. ১১] পরাধীনতা মোচনের জন্য স্বদেশী বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ও ত্যাগের উল্লেখ করে লিখেছেন, তাঁরা যদি একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্যও সচেষ্ট হতেন, মুসলমান প্রজাদের ওপর হিন্দু-জমিদার ও বেনিয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 'তিক্ততা এত বাড়ত না'। [পৃ. ২৪] এ ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বসু ও রবীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রমী ভূমিকার উল্লেখ করেছেন মুজিব। [পৃ. ২৫] এও লিখেছেন, "মুসলমান জমিদার ও তালুকদাররা হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে একই রকম খারাপ ব্যবহার করত হিন্দু হিসাবে নয়, প্রজা হিসাবে। এই সময় যখনই কোনো মুসলমান

নেতা মুসলমানদের জন্য ন্যায্য অধিকার দাবি করত তখনই দেখা যেত হিন্দুদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, এমন কি গুণী সম্প্রদায়ও চিৎকার করে বাধা দিতেন। মুসলমান নেতারাও 'পাকিস্তান' সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা শুরু করার পূর্বে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গালি দিয়ে শুরু করতেন।" [পৃ. ২৪] পক্ষান্তরে আবুল হাশিম পাকিস্তান দাবির যে উদার ধরনের ব্যাখ্যা দিতেন ['পাকিস্তান দাবি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু মুসলমানদের মিলানোর জন্য এবং দুই ভাই যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সুখে বাস করতে পারে তারই জন্য' পৃ. ২৪] তা মুজিবকে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তী জীবনে আবুল হাশিমের অনুসৃত রাজনীতি বা তাঁর বিভিন্ন ভূমিকার সমালোচনা বারবার করলেও, লিখেছেন, "তাঁর সাথে ভিন্ন মত হতে পারি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছি সেটা তো ভোলা কষ্টকর।" [পৃ. ৮০] পাকিস্তান না হলে অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না, এমন কথা মুজিব সে-সময় 'মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস' করতেন। [পৃ. ৩৬] যদিও তিনি যে-পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন তার ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। আত্মজীবনীতে তাই মুজিব লাহোর প্রস্তাবের মূল ইংরেজি পাঠটি তুলে দিয়েছেন। [পৃ. ৩৮-৩৯] একইভাবে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশনে আবুল হাশিমসহ 'সামান্য কয়েকজন' সদস্যের আপত্তি সত্ত্বেও লাহোর প্রস্তাবের 'এস' অক্ষরটি ছেঁটে দিয়ে 'আপাতদৃষ্টিতে ছোট কিন্তু মৌলিক' যে পরিবর্তনটি ঘটানো হয়, সেই সংশোধিত প্রস্তাবটিও গ্রন্থের মূল অংশেই সংকলিত হয়েছে। [পৃ. ৫২-৫৪] এ সবই মুজিবের ইতিহাসবোধের পরিচয় দেয়। লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক যেমন ছিলেন ফজলুল হক, তেমনি দিল্লি কনভেনশনের সংশোধিত প্রস্তাবটিও উত্থাপন করেন বাঙলার আরেক নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ-প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে মুজিবের মন্তব্য:

> ১৯৪০ সালে লাহোরে যে প্রস্তাব কাউন্সিল পাস করে সে প্রস্তাব আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে পরিবর্তন করতে পারে কি না এবং সেটা করার অধিকার আছে কি না এটা চিন্তাবিদরা ভেবে দেখবেন। কাউন্সিলই মুসলিম লীগের সুপ্রিম ক্ষমতার মালিক। পরে আমাদের বলা হল, এটা কনভেনশনের প্রস্তাব, লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করা হয় নাই। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ঐ প্রস্তাব পেশ করতে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অনুরোধ করলেন, কারণ তিনিই বাংলার এবং তখন [সমগ্র ভারতে] একমাত্র মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী। [পৃ. ৫২]

মুসলিম লীগের আহূত 'ডাইরেক্ট একশন ডে' বা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস, *স্টেটসম্যান* বর্ণিত 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যখন লিখেছেন, তখন সে-বর্ণনায়ও খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়তো একজন সাবেক মুসলিম লীগ কর্মী, উপরন্তু সোহরাওয়ার্দি-ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষের প্রদত্ত বিবরণ বা এ যাবত প্রচারিত ভাষ্যের সবটাই যে ঠিক এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। তবে ইতিমধ্যে আমরা যাঁরা সে-প্রচারণাকে অভ্রান্ত ধরে নিয়ে ঘটনার একরকম ব্যাখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি তাঁদের কাছে হয়তো মুজিবের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা অস্বস্তিকর ঠেকবে :

> সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনিও বলে দিলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে যেন এই দিনটা পালন করা হয়। কোনো গোলমাল হলে মুসলিম লীগ সরকারের বদনাম হবে।' তিনি ১৬ই আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করলেন। এতে কংগ্রেস ও হিন্দু

মহাসভা আরও ক্ষেপে গেল। ...

... মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একথা আমি বলতে পারি।

... প্রথম দিন ১৬ই আগস্ট মুসলমানরা ভীষণভাবে মার খেয়েছে। পরের দুই দিন মুসলমানরা হিন্দুদের ভীষণভাবে মেরেছে। পরে হাসপাতালের হিসাবে সেটা দেখা গেছে। [পৃ. ৬৩-৬৬]

বাঙলা ভাগের জন্য মুজিব যতটা না কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে তার চেয়ে বেশি দায়ী করেছেন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে। সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর যুক্ত বাঙলা গঠনের প্রস্তাবের প্রতি জিন্নাহ তাঁর অনাপত্তি জানালেও, গান্ধী-নেহেরুসহ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতার কারণে যে তা সফল হতে পারেনি, শরৎ বসু এ বিষয়ে আলোচনার জন্য গান্ধী-নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা যে আলোচনা না করে তাঁকে সরদার প্যাটেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্যাটেল 'কঠিন কথা' বলে শরৎ বসুকে 'বিদায় দিয়েছিলেন', সে-সময় সংবাদপত্রে প্রদত্ত শরৎ বসুর বিবৃতির বরাত দিয়ে মুজিব আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ করেছেন। [পৃ. ৭৪] এ ব্যাপারে তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর প্রতি জিন্নাহর মনোভাব সম্পর্কেও এক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য দিয়েছেন মুজিব। তিনি লিখেছেন,

...যুক্ত বাংলার সমর্থক বলে শহীদ সাহেব ও আমাদের অনেক বদনাম দেবার চেষ্টা করেছেন অনেক নেতা। ... [কিন্তু] জিন্নাহর জীবদ্দশায় তিনি কোনোদিন শহীদ সাহেবকে দোষারোপ করেন নাই। কারণ, তাঁর বিনা সম্মতিতে কোনো কিছুই তখন করা হয় নাই। [পৃ. ৭৪]

খুঁটিনাটি দু-একটি প্রশ্নে সমালোচনার কথা বাদ দিলে, জিন্নাহর প্রতি মুজিবের শ্রদ্ধা-ভক্তি শেষাবধি অটুট ছিল বলে অন্তত তাঁর আত্মজীবনী পাঠে ধারণা পাওয়া যায়। [পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থে যে জিন্নাহর উল্লেখে বা তাঁর নামের সঙ্গে একবারও 'কায়েদে আযম' কথাটি পাওয়া যায় না, তাকে বেশ অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়, এ প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকেরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে কতটা বিশ্বস্ত ছিলেন, এমন কি তা নিয়েও সন্দেহ জাগে।] কংগ্রেসের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ না-করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুজিবের মন্তব্য : "মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারকে ভালভাবে জানতেন ও বুঝতেন, তাই তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সোজা ছিল না।" [পৃ. ৬১] জিন্নাহর বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতায় গভীর আস্থা রেখেও, মুজিব অবশ্য তাঁর গভর্নর জেনারেল হওয়ার সিদ্ধান্ত পছন্দ করতে পারেননি। এ-সম্পর্কে লিখেছেন, "জিন্নাহ অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন আমাদের চেয়ে, কি উদ্দেশ্যে নিজেই গভর্নর [জেনারেল] হয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন।" [পৃ. ৭৫] তবে মুজিবের ধারণা জিন্নাহর ঢাকা সফরকালে তাঁর রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ঘোষণাটি স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা তাঁকে ভুল বুঝিয়ে করিয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

এই সময় সরকারদলীয় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুর জন্য জানমাল কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে একটু ঘাবড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা শেষ 'তাবিজ' নিক্ষেপ করলেন। জিন্নাহকে ভুল বোঝালেন। এরা মনে করলেন, জিন্নাহকে দিয়ে উর্দুর পক্ষে বলাতে পারলেই আর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস

> পাবে না। জিন্নাহকে দলমত নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর যে কোনো ন্যায়সঙ্গত কথা মানতে সকলেই বাধ্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কোন পথে, তাঁকে কেউই তা বলেন নাই বা বলতে সাহস পান নাই।
>
> ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি যখন আবার বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'—তখন ছাত্ররা তাঁর সামনেই বসে চিৎকার করে বলল, 'না, না, না'। জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর বক্তৃতা করেছিলেন। আমার মনে হয়, এই প্রথম তাঁর মুখের উপরে তাঁর কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। [পৃ. ৯৯]

রেসকোর্স ও কার্জন হলে জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ঘোষণার মুখে ছাত্রদের 'না' ধ্বনি কিংবা সে-প্রতিবাদে নেতৃত্ব দানের কৃতিত্ব তাঁর জীবনীকার ও অন্যান্য লেখক-গবেষকদের কেউ কেউ মুজিবকে দিতে চেয়েছেন। যেমন ড. মযহারুল ইসলাম তাঁর *ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব* গ্রন্থে লিখেছেন, "এই সমগ্র ব্যাপারটি সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠন করেছিলেন শেখ মুজিব।" [আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৪, পৃ.৩২] কিন্তু মুজিবের আত্মজীবনীতে বিবৃত ঘটনার উপরোদ্ধৃত বর্ণনা থেকে মযহারুল ইসলাম প্রমুখের সে-দাবি সমর্থিত হয় না। একইভাবে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ধর্মঘটে মুজিবের ভূমিকা নিয়েও অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী পাঠে এখন আমরা জানতে পারছি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি যে শুধু অবহিত ছিলেন না তাই নয়, তিনি একে সময়োচিতও মনে করেননি। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেনদরবারে পর্যায়ে তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। [পৃ. ১১২]

তাঁর সময়ের অন্য প্রায় সবার মতোই মুজিবও মনে করতেন জিন্নাহর মৃত্যুর পরই মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের অধঃপতন বা বিপথগামিতা শুরু হয়। তাঁর মতে, পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ওপর দমনপীড়নের সূচনাও হয় তখন থেকেই। গ্রন্থে কয়েকবারই তিনি এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন এক জায়গায় লিখেছেন,

> ...জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন প্রকাশ্যে কেউ সাহস পায় নাই। যেদিন মারা গেলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি পুরাপুরি প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল। [পৃ. ৭৮]

অন্যত্র লিখেছেন,

> জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর থেকেই কোটারি ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে। লিয়াকত আলী খান এখন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কাউকেও সহ্য করতে চাইছিলেন না। যদিও তিনি গণতন্ত্রের কথা বলতেন, কাজে তার উল্টা করছিলেন। জিন্নাহ্‌কে পূর্ব বাংলার জনগণ ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। ঘরে ঘরে জনসাধারণ তাঁর নাম জানত। লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী এইটুকু শিক্ষিত সমাজ জানত এবং আশা করেছিল জিন্নাহ সাহেবের এক নম্বর শিষ্য নিশ্চয়ই ভাল কাজ করবেন এবং শাসনতন্ত্র তাড়াতাড়ি দিবেন।
>
> [পৃ. ১১৯]

কিংবা আরেক জায়গায়,

> ...মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পরে লিয়াকত আলী খান সমস্ত ক্ষমতার মালিক হয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর হুকুম মত প্রাদেশিক সরকারের নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের উপর। সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার জেল তখন রাজনৈতিক বন্দিতে প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। [পৃ. ১৭২]

আত্মজীবনীতে মুজিব এভাবে বারবারই লিয়াকত আলীর সমালোচনা করেছেন, এবং তা খুব কঠোরভাবে। তাঁর মতে রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান যে পরবর্তীকালে নিবর্তনমূলক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পথ বেছে নেয় তার সূচনা আসলে লিয়াকত আলীর হাতেই। লিয়াকত আলী প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য :

> ...তিনি জনগণের প্রধানমন্ত্রী হতে চান নাই, একটা দলের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল যে এক হতে পারে না, একথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। [পৃ. ১৩৪]

এবং

> ...জিন্নাহর মৃত্যুর পরে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিলেন। [পৃ. ১৩৫]

দল ও দেশকে এই যে পৃথক করতে না পারা, ভাবতে অবাক লাগে, স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশে শেখ মুজিব ও তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধেও ঠিক একই ধরনের ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছিল এবং এখনও তাঁর শাসনামলের সমালোচনায় এই বিষয়টিই প্রাধান্য পায়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি একেই বলে?

নবাব-নাইট ও খান বাহাদুরদের পকেট থেকে বের করে মুসলিম লীগকে জনগণের সংগঠনে পরিণত করার যে একটি প্রচেষ্টা বিভাগপূর্ব আমলে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের নেতৃত্বে শুরু হয় মুজিব ছিলেন সে ধারার একজন উৎসাহী ও নেতৃস্থানীয় কর্মী। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি লক্ষ করলেন, সেই খান বাহাদুর ও ইংরেজদের তাঁবেদার গোষ্ঠীই পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা দখল করে বসেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমলাচক্রের অবাঞ্ছিত প্রভাব। তাঁর মতে পাকিস্তানে আমলাতন্ত্রের 'মাথা চাড়া' দেওয়াও জিন্নাহর মৃত্যুর 'সাথে সাথে' শুরু হয়। [পৃ. ১৭৩] আর গোলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এই দুই পাঞ্জাবি সাবেক আমলার যথাক্রমে গভর্নর জেনারেল ও অর্থমন্ত্রী হওয়ার পর, প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগে, আমলাচক্রের এই প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। [পৃ. ১৯৫] পাকিস্তানের পরবর্তী দুর্দশার কথা বলতে আত্মজীবনীতে মুজিব বারবারই আমলাদের এই ক্ষমতালিপ্সা ও চক্রান্তের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে একটা শক্তিশালী সরকারি কর্মচারী গ্রুপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় জনাব আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। সত্যিকার ক্ষমতা তিনিই ব্যবহার করতেন। জনাব নূরুল আমিন তাঁর কথা ছাড়া এক পা-ও নড়তেন না।" [পৃ. ১৭৪] আমলাতন্ত্রের এই প্রভাব বা প্রতাপের কাছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কতটা অসহায় বা নতজানু ছিলেন তারও একটি উদাহরণ দিয়েছেন মুজিব :

> ...তখন পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারি ছিলেন আজিজ আহমদ [পুরানা আইসিএস]। তিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন, কাজকর্ম খুব ভাল বুঝতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করতেন। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের বিরুদ্ধে পোডা মামলায় সাক্ষী হিসাবে তিনি স্বীকার করেছিলেন, তিনি মন্ত্রীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে ফাইল রাখতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সে ব্যাপারে খবর দিতেন। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁরা সাহস পেলেন না কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আজিজ আহমদের ব্যক্তিত্বের সামনে অনেকে কথা বলতেও সাহস পেতেন না। [পৃ. ১৯৮]

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরোধ ও একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার জন্য মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে যতটা না ব্যক্তি নাজিমুদ্দিন-নূরুল আমিনকে কিংবা দল হিসেবে মুসলিম লীগকে, তার চেয়ে বেশি দায়ী মনে করেছেন পাকিস্তানের শক্তিশালী আমলাতন্ত্রকে যারা নেপথ্যে থেকে সমস্ত ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নেড়েছিল। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ বা উপলব্ধিকে যথার্থই মনে হয় যখন তিনি লেখেন,

> ...জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হল মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। ... বাংলাদেশের মুসলিম লীগ নেতারা বুঝলেন না, কে বা কারা খাজা সাহেবকে উর্দুর কথা বলালেন, আর কেনই বা তিনি তা বললেন! তাঁরা তো জানতেন, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে মিস্টার জিন্নাহ্‌র মত নেতাও বাধা না পেয়ে ফিরে যেতে পারেন নাই। ... একটা বিশেষ গোষ্ঠী—যাঁরা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করতে শুরু করেছেন, তাঁরাই তাঁকে জনগণ থেকে যাতে দূরে সরে পড়েন তার বন্দোবস্ত করলেন। সাথে সাথে তাঁর সমর্থক নূরুল আমিন সাহেবও যাতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান সে ব্যবস্থাও করালেন। কারণ ভবিষ্যতে এই বিশেষ গোষ্ঠী কোনো একটা গভীর ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।
>
> [পৃ. ২০৪]

মুজিবের এই আত্মজীবনী পাঠে স্বভাবতই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে, পাকিস্তানের মতো স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও কি রাজনৈতিক নেতৃত্ব গোড়া থেকেই সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্রের একই ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হননি? তাঁরাও কি সেদিন এ সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতনতার পরিচয় দিতে পেরেছেন? নিজেদের জনবিচ্ছিন্নতা ঠেকাতে, ষড়যন্ত্র রুখতে পেরেছেন? মুজিব লিখেছেন,

> ...পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা যতই জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন ততই পশ্চিম পাকিস্তানের কোটারি ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন ক্ষমতায় থাকার জন্য। ... জনমত যাতে তাদের দিকে না থাকে তার চেষ্টা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ এবং বিরুদ্ধ মতবাদের কর্মী ও নেতাদের উপর। যে কোনো অজুহাতে নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।
>
> [পৃ. ১৯৮]

আমরা যদি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে শুরু থেকে সব আমলের শাসকদের মধ্যেই কমবেশি একই রকম প্রবণতা দেখতে পাই না কি?

৩

আজ আমরা যে যেভাবেই বিষয়টিকে উপস্থাপন বা ব্যাখ্যা করতে চাই না কেন, ১৯৬০ দশকের শেষদিকে লেখা এই আত্মজীবনীতেও মুজিবকে ভারতভাগ বা পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনের দর্শন নিয়ে মোটামুটি নির্দ্বন্দ্বই দেখা যায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের যৌক্তিকতা নিয়েও তিনি কোথাও কোনো প্রশ্ন তোলেননি। বরং লিখেছেন, পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিতই বোধ করেছিলেন যখন জেনেছিলেন সুভাষ বসু তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ভেবেছিলেন, 'সুভাষ বাবু আসলে তো পাকিস্তান হবে না। পাকিস্তান না হলে দশ কোটি মুসলমানের কি হবে?' [পৃ. ৩৫-৩৬] পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সমর্পিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে হবীবুল্লাহ বাহার ও মুজিবুর রহমান খাঁর পাকিস্তান নিয়ে লেখা বই দুটি তাঁর 'প্রায় মুখস্তের মত' ছিল, আর সে-সময় তিনি তাঁর ব্যাগে দৈনিক আজাদ-এর কাটিং নিয়ে ঘুরতেন বলেও জানিয়েছেন। [পৃ. ২২] পাকিস্তানের পেছনে পূর্ব-বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের [ধর্মীয় পরিচয় ও বিশ্বাসে যারা মুসলমান] যে স্বপ্ন কাজ করেছিল তা পূরণ না হওয়ার জন্য তিনি দেশটির শাসনকর্তৃত্ব যাদের অধিগত হয়েছিল, তাদেরকেই দায়ী করেছেন। গোপালগঞ্জের এক মাঝির 'পাকিস্তানের কথা তো আপনার কাছ থেকেই শুনেছিলাম, এই পাকিস্তান আনলেন!' কথাটার জবাবে যেমন একদিন বলেছিলেন 'এটা পাকিস্তানের দোষ না', [পৃ. ১০৬] তেমনি 'মনে মনে প্রতিজ্ঞা' করেছেন 'যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই পাকিস্তানই করতে হবে'। [পৃ. ২০৯] কারণ, 'পাকিস্তান খারাপ না, পাকিস্তান তো আমাদেরই দেশ।' [পৃ. ২০৯] যে-পাকিস্তানের স্বপ্ন মুজিব ও তাঁর সমসাময়িক অনেকে দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন তা হবে 'একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র', যেখানে 'প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান নাগরিক অধিকার থাকবে।' [পৃ. ২৪১] বলা বাহুল্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই সেই স্বপ্নের অপমৃত্যু তাঁরা লক্ষ করেন। এ-প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে নিজের হতাশা বা ক্ষোভ ব্যক্ত করে মুজিব লিখেছেন :

> ...দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেছিল, এখন পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার ধুয়া তুলে রাজনীতিকে তারাই বিষাক্ত করে তুলেছে। মুসলিম লীগ নেতারাও কোনো রকম অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রোগ্রাম না দিয়ে একসঙ্গে যে স্লোগান দিয়ে ব্যস্ত রইল, তা হল 'ইসলাম'। পাকিস্তানের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ যে আশা ও ভরসা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, তথা পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে কোন নজর দেওয়াই তারা দরকার মনে করল না। জমিদার ও জায়গিরদাররা যাতে শোষণ করতে পারে সে ব্যাপারেই সাহায্য দিতে লাগল। কারণ, এই শোষক লোকেরাই এখন মুসলিম লীগের নেতা এবং এরাই দেশ চালায়।
>
> [পৃ. ২৪১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দিনগুলোতে দেশ গড়ার ব্যাপারে জনগণের উদ্দীপনা ও পক্ষান্তরে নেতৃত্বের ব্যর্থতার উল্লেখ করে মুজিব লিখেছেন,

> ...জনগণ ও সরকারি কর্মচারীরা রাতদিন পরিশ্রম করত। অনেক জায়গায় দেখেছি

> একজন কর্মচারী একটা অফিস চালাচ্ছে। একজন জমাদার ও একজন সিপাহি সমস্ত থানার লীগ কর্মীদের সাহায্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে। জনসাধারণ রেলগাড়িতে যাবে, টিকিট নাই, টাকা জমা দিয়ে গাড়িতে উঠেছে। ম্যাজিকের মত দুর্নীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। [কিন্তু] আস্তে আস্তে সকল কিছুতেই ভাটি লাগল, শুধু সরকারের নীতির জন্য। তারা জানত না, কি করে একটা জাগ্রত জাতিকে দেশের কাজে ব্যবহার করতে হয় এবং জাতিকে গঠনমূলক কাজে লাগান যায়। [পৃ. ৯০]

কথাগুলো পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয়তো স্বাভাবিকভাবেই সেদিনকার পরিস্থিতির সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থার সাদৃশ্য — জনগণের স্বপ্ন ও আশা এবং তার বিপরীতে নেতৃত্বের ব্যর্থতার চিত্র উঁকি মারবে। প্রসঙ্গত নাজিমুদ্দীন সরকারের মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে একটা ভুল বা অন্যায় সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করে আত্মজীবনীতে মুজিবের মন্তব্য :

> ...এই সংগঠনের কর্মীরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অনেক নেতার চেয়েও বেশি। ... এদের অনেক দিন পর্যন্ত ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছিল। ... ন্যাশনাল গার্ড ও মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে যে প্রেরণা ছিল পাকিস্তানকে গড়বার জন্য তা ব্যবহার করতে নেতারা পারলেন না। [পৃ. ৯০]

একইভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর তরুণদের দেশ পুনর্গঠনের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতা, বা এ ব্যাপারে নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির অভাবের কথাও আজ অনেকেই বলে থাকেন। তার মানে কি শেষে এই দাঁড়াচ্ছে যে, ইতিহাস থেকে কেউই আসলে শিক্ষা নেন না? পাকিস্তানে বিরোধী নেতা ও কর্মীদের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের দমন-পীড়নের নীতি এবং গুণ্ডা দিয়ে সভা ভাঙার রীতির উল্লেখ করে মুজিব লিখেছেন,

> ... তখনকার দিনে আমরা কোনো সভা বা শোভাযাত্রা করতে গেলে একদল গুণ্ডা ভাড়া করে আমাদের মারপিট করা হত এবং সভা ভাঙার চেষ্টা করা হত। ... সরকারি দল প্রকাশ্যে গুণ্ডাদের সাহায্য করত ও প্রশ্রয় দিত। ... মুসলিম লীগ নেতারা বুঝতে পারছিলেন না, যে পন্থা তারা অবলম্বন করেছিলেন সেই পন্থাই তাদের উপর একদিন ফিরে আসতে বাধ্য। ওনারা ভেবেছিলেন গুণ্ডা দিয়ে মারপিট করেই জনমত দাবাতে পারবেন। এ পন্থা যে কোনোদিন সফল হয় নাই, আর হতে পারে না — এ শিক্ষা তারা ইতিহাস পড়ে শিখতে চেষ্টা করেন নাই। [পৃ. ১১০]

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার সেই কাজটি কি অন্য কেউও করেছেন, পরবর্তীকালেও, আজ পর্যন্ত? মুসলিম লীগের রেখে যাওয়া সেই ট্রাডিশনই কি স্বাধীন বাংলাদেশেও গোড়া থেকেই প্রতিটি শাসক-দলের উদ্যোগে অনুসৃত হচ্ছে না?

৪

শেখ মুজিব তাঁর এই আত্মজীবনীটি লেখেন ১৯৬৬-৬৯ সালে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায়। গ্রন্থের শেখ হাসিনা লিখিত ভূমিকা থেকে আমরা একথা জানতে পারি। আর এখানে জীবনের যে-অংশটার [১৯৫৫ সাল পর্যন্ত] অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন, তার

এক উল্লেখযোগ্য অংশ কেটেছে কারাবন্দি হিসেবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেই কারাজীবনের স্মৃতি ও অনুভূতি তাঁর রচনার এক বড় অংশ জুড়ে আছে। বলা যায় বিশ্বের অন্য অনেক দেশব্রতী ও বিপ্লবীর মতো মুজিবের বেলায়ও জেলখানাই হয়ে উঠেছিল তাঁর আসল বিদ্যাপীঠ। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণাও তিনি কারাগারেই পেয়েছিলেন। ফরিদপুর জেলে বন্দি থাকাকালীন চন্দ্রঘোষ নামক একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবীর সংস্পর্শে আসেন মুজিব। কারাগারের একই কক্ষে তাঁকে ফণিভূষণ মজুমদার ও চন্দ্রবাবুর সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়। চন্দ্রবাবু কিন্তু জীবনে একদিনের জন্যও রাজনীতি করেন নি। অত্যন্ত শাদামাটা জীবনযাপন করতেন। শীত-গ্রীষ্ম সকল সময় একখানা কাপড় পরতেন, আর একখানা গায়ে দিতেন। জুতার বদলে খড়ম পায়ে দিতেন। তাঁর নিজ এলাকা গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি থানায় তিনি একটি মেয়েদের হাইস্কুলসহ কয়েকটি বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, খাল কাটেন ও রাস্তা নির্মাণ করেন। এলাকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁর ভক্ত ছিল। মুজিব লিখেছেন,

> তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই তাঁর বেশি ভক্ত ছিল। গোপালগঞ্জের কিছু সংখ্যক তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দু পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিল, এমন কি কিছু সংখ্যক নমশূদ্র হিন্দু কর্মী আমাদের সাথে সিলেটে গণভোটে কাজ করেছিল।
>
> [পৃ. ১৮৮]

অথচ পাকিস্তান হওয়ার পর সেই চন্দ্রঘোষ সম্পর্কেই পাকিস্তান-বিরোধী তৎপরতায় নেতৃত্ব দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে জেলে পোরা হয়। মুজিব কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে একটানা তিনদিন তিনরাত জেগে থেকে চন্দ্রবাবু তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন। [পৃ. ১৮৯] চন্দ্রবাবু নিজে যখন গুরুতর অসুস্থ, বাঁচবার আশা প্রায় নেই, শেষ চেষ্টা হিসেবে অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে বাইরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি সিভিল সার্জনকে বলেন, তাঁর তো আর কেউ নেই, মুজিব তাঁর ভাইয়ের মতো, তাঁকে যেন একবার মুজিবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়। [পৃ. ১৯১] সিভিল সার্জন ও জেল সুপারিনটেন্ডের নির্দেশে মুজিবকে তখন জেলগেটে নিয়ে আসা হয়। এর পরের বর্ণনাটা মুজিবের নিজের জবানিতেই শোনা যাক, কারণ এই গ্রন্থের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী অংশ বোধহয় এটাই :

> চন্দ্র ঘোষ স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হল, আর বাঁচবেন না, আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'ভাই, এরা আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বদনাম দিল; শুধু এই আমার দুঃখ মরার সময়! কোনোদিন হিন্দু মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই। সকলকে আমায় ক্ষমা করে দিতে বোলো। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখ। মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য ভগবান করেন নাই। আমার তো কেউ নাই, আপন ভেবে তোমাকেই শেষ দেখা দেখে নিলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।' এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে সুপারিনটেনডেন্ট, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার, ডাক্তার ও গেয়েন্দা কর্মচারী সকলের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। আর আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। বললাম, 'চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।' আর কথা বলার শক্তি আমার ছিল না। শেষ বারের মত বললাম,

> 'আল্লাহ করলে আপনি ভাল হয়ে যেতে পারেন।' তাঁকে নিয়ে গেল। সিভিল সার্জন সাহেব বললেন, আশা খুব কম, তবে শেষ চেষ্টা করছি, অপারেশন করে।' [পৃ. ১৯১]

পাকিস্তানি আমলে বিশেষ করে তার গোড়ার দিকে রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি সরকারের নিপীড়নমূলক আচরণের সমালোচনা করতে গিয়ে শেখ মুজিব লিখেছেন, ইংরেজ আমলেও রাজনৈতিক বন্দিদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত, স্বাধীন দেশে তা কেড়ে নেওয়া হয়। [পৃ. ১৭১] এ অবস্থায় বন্দিদের তাদের দাবিদাওয়া আদায়ে অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে হয়। মুজিবের আত্মজীবনী থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৪৯ সালে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিনই রাজনৈতিক বন্দিরা অনশন করেন। এই অনশনকালেই ঢাকা জেলে শিবেন রায়ের মৃত্যু হয়। দীর্ঘ অনশনের ফলে বন্দিদের অনেকের স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, অনেকে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন, অনেকে উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মুজিব লিখেছেন,

> ...খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে তাঁদের কি অবস্থা হয়েছিল তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবেন না। ... রাজনৈতিক বন্দিদের অনেক পরিবারের ভিক্ষা করেও সংসার চালাতে হয়েছে। ... যাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করেছেন তাঁদের অনেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বাধীন দেশের জেলে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। [পৃ. ১৭২]

প্রসঙ্গত কমিউনিস্ট বন্দিদের ব্যাপারে সরকারের বিশেষ সতর্কতামূলক দৃষ্টি, তাঁদেরকে অন্য বন্দিদের থেকে আলাদা রাখার ব্যবস্থার [অন্য বন্দিরা যাতে তাঁদের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট হয়ে না পড়ে] কথাও মুজিব উল্লেখ করেছেন। [পৃ. ১৭০] তারপরও কারাজীবনে হাজী দানেশ, ডা. মারুফ হোসেন, নেপাল নাহা ও বিষ্ণু চ্যাটার্জীর মতো কয়েকজন কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনীতিককে তিনি কিছু সময়ের জন্য সহবন্দি হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু চ্যাটার্জীকে যে ডাকাতি মামলার আসামী হিসেবে সাধারণ কয়েদির মতো ডান্ডাবেড়ি পায়ে জেলে আনা হয় সেকথা জানিয়ে লিখেছেন,

> ... সদা হাসিখুশি মুখ, কোনো দুঃখ নাই বলে মনে হল। একদিন বললেন, 'দুঃখ তো আর কিছু নয়, এরা আমাকে ডাকাতি মামলার আসামি করল!' বিষ্ণু বাবুকে ডিভিশন দেয় নাই। তাই কয়েদির কাপড় তাঁকে পরে থাকতে ও কয়েদির খানা খেতে হয়। [পৃ. ১৮৬]

রাজশাহী খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের গুলিতে আহত নূরুন্নবীর সঙ্গে পরিচয়ের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন,

> ...রাজশাহীতে যখন রাজবন্দিদের উপর গুলি করে তখন সে ওখানেই ছিল। গুলির আঘাতে তার একটা পা ভীষণভাবে জখম হয় এবং ডাক্তার সাহেবরা পা'টা কেটে ফেলে দেয়। তাকে এখন এক পায়ে হাঁটতে হয়। অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা, জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু মুক্তি দেয় নাই। তার বাড়ি বর্ধমান। [পৃ. ১৮৬]

খাপড়া ওয়ার্ডের গুলিবর্ষণে নিহত ও আহত বন্দিদের সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট। নূরুন্নবীর কাছে জেলখানার ভেতর ঘটা সে-নৃশংসতার বিবরণ শোনার পর এ-প্রসঙ্গে মুজিবের মন্তব্য :

> ...দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও একজন ইংরেজ কর্মচারী কি নির্দয়ভাবে গুলি চালাতে হুকুম দিয়েছিল এবং তাতে সাতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক বন্দি সকলে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যাঁরা বেঁচে আছে তাদের অবস্থাও শোচনীয়। কারণ, এমনভাবে তাদের মারপিট করেছে যে জীবনে কিছুই করবার উপায় নাই। [পৃ. ১৮৬]

দলমত নির্বিশেষে সকল সহবন্দির প্রতি মুজিবের সহমর্মিতার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এ আত্মজীবনীতে। সে-যেমন বয়সে অতি নবীন ও বাম-মনোভাপন্ন বাহউদ্দিন চৌধুরীর বেলায়, তেমনি জেলখানায় অনশন ধর্মঘটকালে তাঁর সঙ্গে যোগদানকারী মুসলিম লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদের বেলায়ও। এখানে বলা দরকার, পরবর্তীকালে 'ন্যাপের মহিউদ্দিন' নামে সমধিক পরিচিত মহিউদ্দিন আহমদ জেলে আসার আগেও মুসলিম লীগ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন তিনি। ১৯৫১-এর দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর সম্ভবত গণতন্ত্রী দল হয়ে তিনি ন্যাপে যোগ দেন এবং ন্যাপের প্রথম সারির নেতা হিসেবে এদেশের বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং শেখ মুজিব তাঁকে সরাসরি দলের সিনিয়র সহসভাপতি মনোনীত করেন। মুজিবের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্বের সূচনা কিন্তু সেই কারাজীবনে, একসঙ্গে অনশন ধর্মঘট করার মধ্য দিয়ে। জেলে তাঁদের সেই অনশন ধর্মঘটের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মুজিব লিখেছেন :

> কয়েকদিন পরে খবর পেলাম, বরিশালের মহিউদ্দিন সাহেবকে ঢাকা জেলে নিয়ে আসা হয়েছে, নিরাপত্তা আইনে বন্দি করে। সে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িত থাকার জন্য তাকে নাকি গ্রেফতার করেছে। ... মহিউদ্দিন পাকিস্তান আন্দোলনের ভালো কর্মী ছিল। ছাত্র আন্দোলনে সে আমার বিরুদ্ধ দলে ছিল। আমরা মুসলিম লীগ ত্যাগ করলেও সে ত্যাগ করে নাই। ... আমি ও আমার সহকর্মীরা মহিউদ্দিনকে ভালো চোখে দেখতাম না। কারণ, তখন পর্যন্ত সে সরকারের অন্ধ সমর্থক ছিল। মহিউদ্দিনের সাথে আলাপ করে দেখলাম, তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বের হতে পারলে সে আর মুসলিম লীগ করবে না, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর একথাও সে স্বীকার করল।
>
> ... আমার ও মহিউদ্দিনের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছিল পূর্বে, এখন দুইজনই বন্দি। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। [পৃ. ১৯৩]

মুজিবের আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, অনশন ধর্মঘটকালে মুজিব ও মহিউদ্দিন পাশাপাশি দুটো খাট পেতে 'একজন আরেকজনের হাত ধরে' শুয়ে থাকতেন। [পৃ. ২০৫] সে-সময় জেলের বাইরে থেকে মুজিব ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করে সোহরাওয়ার্দীসহ গণমান্য ব্যক্তিরা যে বিবৃতিটি দেন, তাতেও মুজিব, অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও, মহিউদ্দিনের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন। [পৃ. ১৯৪-৯৫] এমনকি কারামুক্তির আদেশ পাওয়ার পরও জেলখানায় মহিউদ্দিনকে ছেড়ে যেতে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। [পৃ. ২০৫-৬]

তবে রাজনৈতিক বন্দিদের ব্যাপারে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক, রাজনৈতিক বন্দি বা দেশব্রতীদের প্রতি বেশিরভাগ পুলিশ বা জেল কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি সাধারণ কয়েদিদেরও ব্যবহার ছিল সম্ভ্রম ও মর্যাদাপূর্ণ। তাঁরা যে দেশপ্রেমিক, দেশ ও দেশের মানুষের জন্যই যে তাঁদের এই নির্যাতন ভোগ এ ব্যাপারটি তাঁরা বুঝত। রাজবন্দিরাও অনেকেই তাঁদের দিক থেকে পুলিশ এবং কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সীমাবদ্ধতা বুঝতেন। জানতেন তাঁরা সরকারি হুকুম তামিল করেন মাত্র। এর মধ্যেও আমির হোসেন, মোখলেসুর রহমান প্রমুখের মতো কিছু ভদ্র, বিনয়ী, শিক্ষিত ও হৃদয়বান মানুষের কথা মুজিব লিখেছেন, সরকারি চাকরির সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যাঁরা চেষ্টা করতেন রাজবন্দিদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে। এ-প্রসঙ্গে মুজিব আর্মড পুলিশের একজন বেলুচি সুবেদারের কথাও লিখেছেন, পাকিস্তান হওয়ার সময় যিনি গোপালগঞ্জে ছিলেন এবং মুজিবকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। মুজিবকে তিনি তখন পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করতে দেখেছিলেন। পাকিস্তানের কারাগারে সেই মুজিবকে দেখে তিনি বলেন, 'ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে।' [পৃ. ১৯৯] পাকিস্তানি সেই স্বৈরশাসন-আমলেও অনেক সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর দেখা মুজিব পেয়েছেন। এঁদের একজন, গোপালগঞ্জের সাবেক এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথা তিনি বলেছেন, যিনি ঘুষ খেতেন না, সাক্ষী দিতে উঠে একটাও মিথ্যা কথা বলতে চাইতেন না, এবং এলাকায় সাধু কর্মচারী হিসেবে যাঁর নাম ছিল। [পৃ. ১৯০] প্রসঙ্গত মুজিবের এই আত্মজীবনীতে এমন বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য আছে যা আজকের বাংলাদেশের জন্যও সত্য। যেমন আইন বা বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> ... আমাদের দেশে যে আইন সেখানে সত্য মামলায়ও মিথ্যা সাক্ষী না দিলে শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়। যে দেশের বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল সেদেশের মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ পেতে পারে কি না সন্দেহ। [পৃ. ১৯০]

একটা বিষয় পুরনো প্রজন্মের অনেকেরই হয়তো জানা, যদিও তথ্যটা কোথাও উল্লিখিত হতে দেখা যায় না : আমাদের দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যাঁরা ছাত্র বা তরুণ অবস্থায় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে আমলা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক বা শিক্ষাবিদ হিসেবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যশ ও কীর্তির অধিকারী হয়েছেন, ভাষা-আন্দোলনকালে ও অন্যান্য সময় কর্তৃপক্ষের কাছে বণ্ড বা মুচলেকা দিয়েই কারামুক্তি বা ছাত্রত্ব ফিরে পেয়েছিলেন। বন্দি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলে তাঁকে দেশত্যাগের এবং অন্যদের বেলায় ভবিষ্যতে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব না রাখা ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার শর্তেই সাধারণত এই অনুকম্পা দেখানো হত। শাসকদের এই কৌশল, এর উপস্থিত ফলাফল যতটা না, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তার চেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল ব্যাপারটি আমাদের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার ক্ষেত্রে। যার রেশ আমরা আজও টেনে চলেছি। ১৯৪৮এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ধর্মঘট পরবর্তী পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে মুজিব কর্তৃপক্ষীয় চাপের কাছে আন্দোলনকারীদের নতি স্বীকারের বিষয়টি উল্লেখ

করেছেন এভাবে :

> ১৬ এপ্রিল খবর পেলাম, ছাত্রলীগের কনভেনর নইমউদ্দিন আহমেদ, ছাত্রলীগের আরেক নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী ..., দেওয়ান মাহবুব আলী ... আরও অনেকে গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে বন্ড দিয়েছেন। যারা ছাত্রলীগের সভ্যও না, আবার নিজেদের প্রগতিবাদী বলে ঘোষণা করতেন, তাঁরাও অনেকে বন্ড দিয়েছেন। সাতাশজনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই বন্ড দিয়ে দিয়েছে। কারণ ১৭ তারিখের মধ্যে বন্ড না দিলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকবে না। [পৃ. ১১৫-৬]

৫

> ধর্ম, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় যার নামেই ঘটানো হোক, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে যে আসলে কায়েমি স্বার্থের প্ররোচনাই কাজ করে, এ ব্যাপারে মুজিবের স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, আদমজির দাঙ্গা [১৯৫৪] প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তাঁর এ মন্তব্যে : "যুগ যুগ ধরে পুঁজিপতিরা তাদের শ্রেণী স্বার্থে এবং রাজনৈতিক কারণে গরিব শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি সৃষ্টি করে চলেছে।"
> [পৃ. ২৬৬]

শেখ মুজিবুর রহমান

পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যটি সেই ১৯৫০-এর দশকেই মুজিবের চোখে ধরা পড়ে। এ সম্পর্কে আত্মজীবনীতে মুজিব যা লিখেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সে-কারণে এখানে একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃতিযোগ্য:

> সেখানে [পশ্চিম-পাকিস্তানে — মোশহা] রাজনীতি করে সময় নষ্ট করার জন্য জমিদার, জায়গিরদার ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা। আর পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পশ্চিম পাকিস্তানে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত না থাকার জন্য জনগণ রাজনীতি সম্বন্ধে বা দেশ সম্বন্ধে কোনো চিন্তাও করে না। জমিদার বা জায়গিরদার অথবা তাদের পীর সাহেবরা যা বলেন, সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করে। বহুকাল থেকে বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন হওয়াতে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের চেয়ে অনেকটা বেশি। এছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনেও বাঙালিরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা, তারপর ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থাকাতে জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক শিক্ষা

> অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি না থাকলেও বাঙালিরা অজ্ঞ বা অসচেতন ছিল না। ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তাদের ছিল এবং এর প্রমাণও করেছিল ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান দাবির উপরে সাধারণ নির্বাচনের সময়।
>
> [পৃ. ২৩৯-৪০]

উল্লেখ্য, অবিভক্ত ভারতে একমাত্র বাঙলার মুসলমানরাই ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে তাঁদের রায় ঘোষণা করেছিল। আর এখানে দেখা যাচ্ছে, সেটিকেই মুজিব বাঙালির রাজনৈতিক সচেতনতার এক বড় প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে পাকিস্তানি আমলের গোড়া থেকে সেই বাঙালিদের প্রতিই যে চরম বৈষম্য-বঞ্চনার নীতি গ্রহণ করা হয়, আর করাচিকে দেশের রাজধানী করা ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতির মতো ব্যাপারগুলোর মধ্য দিয়ে যে আসলে পাকিস্তানি শাসকদের সেই উপনিবেশবাদী মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে, মুজিব সেটা বুঝেছিলেন। [পৃ. ১৯৭-৯৮] অবশ্য দেশভাগের আগেই কলকাতার দাবি ছেড়ে দিয়ে করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী এবং সোহরাওয়ার্দীকে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করার উদ্যোগের মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সূত্রপাত, আর জিন্নাহর জীবদ্দশায়ই নাজিমুদ্দীনের প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক তাঁর পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের [১৯৪৮ সালের ৩ জুন] মতো ঘটনা ঘটে বলে আমরা জানি। দ্বিতীয় ব্যাপারটি সম্পর্কে মুজিবের মন্তব্য :

> পাঞ্জাব ভাগ হল, সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন আসল না। নবাব মামদোত পূর্ব পাঞ্জাবের লোক হয়েও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হলেন। লিয়াকত আলী খান ভারতবর্ষের লোক হয়েও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। আর সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে আবার তাঁকে নির্বাচন করতে হবে বলা হল।
>
> [পৃ.৭৫]

উত্তরকালে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও অন্যান্য নানা জনের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, বাঙালিরা এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার বহু আগেই পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক শাসক ও আমলাগোষ্ঠী এবং পুঁজিপতিদের একাংশ বুঝে গিয়েছিল যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির বিচ্ছিন্নতা সময়ের ব্যাপার মাত্র। [দেখা যেতে পারে : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ, *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২] আর এই অনিবার্যতাকে মাথায় রেখেই তারা গোড়া থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানকে তাদের শোষণের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করে। এ-সম্পর্কে মুজিবের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন তিনি লেখেন :

> ... পূর্ব বাংলার সম্পদকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায়, একদল পশ্চিমা তথাকথিত কেন্দ্রীয় নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী গোপনে সে কাজ করে চলেছিল। তাদের একটা ধারণা ছিল, পূর্ব বাংলা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে।
>
> [পৃ. ২৪০]

৬

মুজিব-চরিত্রের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ। যদিও, আমরা

জানি, এই সদগুণটিই, বিশেষ করে তিনি যখন রাষ্ট্রক্ষমতায়, শাসক হিসেবে ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর দৌর্বল্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে তাঁর বিপক্ষে কাজ করেছে। ছাত্র অবস্থা থেকে রাজনৈতিক জীবনের নানা পর্যায়ে তিনি যাঁদের কাছ থেকে যতটুকু উপকার পেয়েছেন, কখনো না কখনো যাঁরাই তাঁর সঙ্গে কমবেশি ভালো ব্যবহার করেছেন, তাঁদের সবার কথাই তিনি মনে রেখেছেন। আত্মজীবনীতে তাঁদের অনেকের কথা সবিস্তারে লিখেছেনও। তা সে পুলিশের একজন সিপাহি, জেলের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীই হোন, কিংবা তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী। এমন এক ব্যক্তি শেখ শাহাদত হোসেন, যিনি কলকাতার ছাত্রজীবনে দু-মাসের ছুটি নিয়ে মুজিবকে তাঁর পরীক্ষার পড়ালেখায় সাহায্য করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে মুজিবের মন্তব্য : "পরে জীবনে অনেক ক্ষতি সে আমার করেছে। এর জন্য তাকে কোনোদিনই কিছু বলি নাই।" [পৃ. ৭২] স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলে, প্রথমে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে ও কয়েক মাস পর মোহাম্মদুল্লাহকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। ১৯৭৫-এ দেশে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও মুজিবের নিজে রাষ্ট্রপতি হওয়া পর্যন্ত মোহাম্মদুল্লাহ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ওই বছরের ১৫ আগস্ট মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন সরকারে তিনি উপরাষ্ট্রপতি হন। পরে বিএনপিতে যোগ দিয়ে বিচারপতি সাত্তারের সরকারেও তিনি উপরাষ্ট্রপতি এবং আরও পরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আবু সাইদ চৌধুরীর পদত্যাগের পর মুজিবের মোহাম্মদুল্লাহকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেছে নেওয়া, এ নিয়ে জনমনে কৌতূহল ও কৌতুক দুইই কমবেশি ছিল। মুজিবের আত্মজীবনীতে আমরা এক আত্মপ্রচারবিমুখ, নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী মোহাম্মদুল্লাহর পরিচয় পাই যিনি এক নাগাড়ে প্রায় দেড় যুগ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, যাঁর সম্পর্কে মুজিব লিখেছেন,

> কোনোদিন কোনো পদের জন্য কাউকেও তিনি বলেন নাই। আমার সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছে। তিনি কোনোদিন সভায় বক্তৃতা করেন না। তাঁকে অফিসের কাজ ছাড়া কোনো কাজেও কেউ বলেন নাই। তিনিও চান না অন্য কাজ করতে। অফিসের খরচও তাঁর হাতে আমি দিয়েছিলাম। হিসাব-নিকাশ তিনিই রাখতেন। ... কোনোদিন কোনো সরকার তাঁকে খারাপ চোখে দেখেন নাই। ... পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাঁর মতো অফিস সেক্রেটারি পেয়েছিল বলে অনেক কাজ হয়েছে।
>
> [পৃ. ২১১]

১৯৭১ সালে যাঁরা সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর সরকারের প্রধান হিসেবে মুজিব তাঁদের অনেকের প্রতি অনুকম্পাই শুধু নয়, রীতিমতো সহানুভূতি দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক অবস্থান থেকে পরবর্তীকালে বিষয়টিকে যে-যেভাবেই মূল্যায়ন করুন না কেন, এর মধ্য দিয়ে মুজিবের ব্যক্তিচরিত্রের একটি মহৎ দিক প্রকাশ পায়। আর যে পরিবেশ-পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন তা থেকেই তিনি তা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরিরা যা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন নিদারুণভাবেই। আমাদের আজকের অনেক সমস্যা-সংকটের মূলে কাজ করছে এই পারস্পরিক সহনশীলতা ও সৌজন্যের অভাব। রাজনীতিতে খাজা নাজিমুদ্দিনের

বিরুদ্ধবাদী হয়েও, আত্মজীবনীতে মুজিব একাধিকবার নাজিমুদ্দিনের ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের উল্লেখ করতে ভোলেননি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে রাজবন্দি মুক্তি ও একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের তদন্ত দাবি নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিতে গিয়েও মুজিব লিখেছেন, আমাকে খাজা সাহেব তাঁর কামরায় নিজে এগিয়ে এসে নিয়ে বসালেন। যথেষ্ট ভদ্রতা করলেন, আমার শরীর কেমন? আমি কেমন আছি, কতদিন থাকব — এইসব জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি যে একজন ভাল কর্মী সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করতেন এবং আমাকে স্নেহও করতেন। ... তিনি বিশ মিনিটের জায়গায় আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলেন। ... আমি তাঁকে বললাম, 'আওয়ামী লীগ বিরোধী দল আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন, একথা আমি খবরের কাগজে দিতে পারি কি না?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় দিতে পার।" ... তিনি যে আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন এ জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।" [পৃ. ২১৩-১৪]

বইয়ের অন্যত্র নাজিমুদ্দিনের সমালোচনা করতে গিয়েও তাঁর 'দুর্বল প্রকৃতি' এবং 'কর্মদক্ষতা এবং উদ্যোগের অভাবে'র উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি যে 'অমায়িক' ও 'অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন', সে-কথা বলেছেন। [পৃ. ১১৯ ও ১৯৫]

মুজিব যখন তাঁর এ আত্মজীবনী লেখেন তখন রাজনীতিতে ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান এঁরা দুজনই তাঁর প্রতিপক্ষ। তাই বলে সেই ১৯৪০ দশকের গোড়ায় মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মী হিসেবে ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কিংবা, ১৯৪৮ সালে দৌলতপুরে বাংলা ভাষার পক্ষে সভা করতে গিয়ে মুসলিম লীগ সমর্থকদের হামলার মুখে সবুর খানকে নিজেদের পক্ষে পাবার কথা উল্লেখ করতে মুজিব দ্বিধা করেন নি। [পৃ. ১৬ ও ৯২] যেমন আবদুস সালাম খানের সঙ্গে নানা সময়ে তাঁর মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও, এক সময় গোপালগঞ্জে যে তিনি 'খুবই জনপ্রিয় ছিলেন' [পৃ. ৪৭] যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছেন। মুজিব নিজে কখনো ভালো বা মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না, বিশেষ করে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র থাকাকালীন দিনগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, "পাকিস্তান না আনতে পারলে লেখাপড়া শিখে কি করব? আমাদের অনেকের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল।" [পৃ. ৩২] কিন্তু সে-সময়ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করতেন না, ভালো ছাত্র ছিলেন, তাঁদের কারো কারো নামোল্লেখ করে তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন। ছাত্র লীগ ও মুসলিম লীগ রাজনীতিতে তিনি একটি বিশেষ গ্রুপের নেতৃত্ব করতেন। কিন্তু অন্য গ্রুপেও যাঁর মধ্যে তিনি যে গুণ দেখেছেন [যেমন শাহ আজিজের 'চমৎকার' বক্তৃতা করার ক্ষমতা] তার সপ্রশংস উল্লেখ করতে ভোলেননি। [পৃ. ২৮] কোনো গ্রুপ করতেন না এমন একজন আবু সাইদ চৌধুরীরও প্রশংসা করেছেন তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার জন্য। [পৃ. ৩২]

একজন সত্যিকার শিক্ষকের যে সম্প্রদায় ও দলমত নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমদর্শী হওয়া উচিত তার উদাহরণ হিসেবে মুজিব তাঁর ছাত্রজীবনে দেখা ইসলামিয়া কলেজের একজন শিক্ষক নারায়ণ বাবুর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> ... ইসলামিয়া কলেজে গরিব ছেলেদের সাহায্য করবার জন্য একটা ফান্ড ছিল। সেই ফান্ড দেখাশোনা করার ভার ছিল বিজ্ঞানের শিক্ষক নারায়ণ বাবুর। আমি আর্টসের ছাত্র ছিলাম, তবু নারায়ণ বাবু আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি যদিও জানতেন, আমি প্রায় সকল সময়ই 'পাকিস্তান, পাকিস্তান' করে বেড়াই। ইসলামিয়া কলেজের সকল ছাত্রই মুসলমান। একজন হিন্দু শিক্ষককে সকলে এই কাজের ভার দিত কেন? কারণ, তিনি সত্যিকারের একজন শিক্ষক ছিলেন। হিন্দুও না, মুসলমানও না।
>
> [পৃ. ৩৭-৩৮]

সেকালেও এ রকম শিক্ষক 'খুব কমই' তাঁর চোখে পড়েছে বলে মুজিব মন্তব্য করেছেন। [আত্মজীবনীতেই ড. জুবেরি ও অধ্যাপক সাইদুর রহমানের মতো শিক্ষকদের কথাও মুজিব লিখেছেন, পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হওয়ায় নিয়ম ভঙ্গ করেও তাঁকে যাঁরা সুবিধা দিয়েছেন। পৃ. ১৮, ৩৭ ও ৭১]

দলমতের উর্ধ্বে মানুষের যোগ্যতা ও অবদানের স্বীকৃতি এবং শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা মুজিব তরুণ বয়সেই তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর বাবা তাঁকে বলেছিলেন 'হক সাহেবে'র বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ না করতে। [পৃ. ২২] তাঁর মাও একদিন তাঁকে বলেন, 'বাবা যাহাই কর, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলিও না।' [পৃ. ২২] এ-প্রসঙ্গে মুজিবের মন্তব্য : "শেরে বাংলা মিছামিছিই 'শেরে বাংলা' হন নাই। বাংলার মাটিও তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাধা পেয়েছি।" [পৃ. ২২] বাবা-মার উপদেশ ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে মুজিব, ফজলুল হক যখন মুসলিম লীগ ছেড়ে যান ও হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তখনও, পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালাতে গিয়েও, সরাসরি ফজলুল হকের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের আজকের নেতৃবৃন্দের হয়তো কিছু শেখার আছে। ওই বয়সে বাবা তাঁকে আরেকটি কথাও মনে রাখতে বলেছিলেন : 'sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবে না।' মুজিব লিখেছেন, "একথা কোনোদিন আমি ভুলি নাই।" [পৃ. ২১] বস্তুত উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা ও সে-উদ্দেশ্য অর্জনে একলব্য নিষ্ঠাই রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মুজিবের সাফল্য ও তাঁর তুঙ্গ জনপ্রিয়তার পেছনে কাজ করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাল্য বয়স থেকেই মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্ক। তরুণ বয়সেই নিজ এলাকা গোপালগঞ্জের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, "এমন একটা বাড়ি হিন্দু-মুসলমানের নাই যা আমি জানতাম না। ... প্রত্যেকটা দোকানদারের আমি নাম জানতাম।" [পৃ. ১৭৭]

৭

দোষে-গুণে মানুষ। আপন চরিত্রের সদর্থক ও নেতিবাচক উভয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে বেশ খোলাখুলিভাবেই করেছেন। দু-একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

> ক. আমাকে সকল নেতাই জানতেন ভাল কর্মী হিসাবে, আমাকে সকলে স্নেহও করতেন। ... আমাকে অপমান করলে, আবার একবার মত দিয়ে [কনফারেন্সে] না

গেলে কলকাতায় ছাত্রদের নিয়ে যে গোলমাল করব সে ভয়ও অনেকের ছিল। [পৃ. ২০]

খ. পূর্বে আমার দোষ ছিল, সোজাসুজি আক্রমণ করে বক্তৃতা করতাম। তার ফল বেশি ভালো হত না। উপকার করার চেয়ে অপকারই বেশি হত। [পৃ. ২২]

গ. আমি খুব রাগী ও একগুঁয়ে ছিলাম, কিছু বললে কড়া কথা বলে দিতাম। কারও বেশি ধার ধারতাম না। আমাকে যে কাজ দেওয়া হত আমি নিষ্ঠার সাথে সে কাজ করতাম। কোনোদিন ফাঁকি দিতাম না। ভীষণভাবে পরিশ্রম করতে পারতাম। সেইজন্য আমি কড়া কথা বললেও কেউ আমাকে কিছুই বলত না। [পৃ. ৩৭]

ঘ. আমার নিজেরও একটা দোষ ছিল, আমি হঠাৎ রাগ করে ফেলতাম। তবে রাগ আমার বেশি সময় থাকত না। [পৃ. ৮০]

ঙ. হক সাহেব [শামসুল হক — হা.শ.] ও আমি দুইজনই একগুঁয়ে ছিলাম। দরকার হলে সমানে হাতও চালাতে পারতাম, আর এটা আমার ছোট্টকাল থেকে বদ অভ্যাসও ছিল। [পৃ. ৯৫-৯৬]

প্রসঙ্গত আত্মসমীক্ষা ও আত্মসমালোচনা, দোষ স্বীকার ও তা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন, "ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষের হয়েই থাকে।" [পৃ. ৮০] রাজনীতিতে নিজের ভুল পদক্ষেপের উল্লেখ করে তার জন্য আত্মসমালোচনা করেছেন। যেমন খালেক নওয়াজ খানকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক করা নিয়ে লিখেছেন, "আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মনোনীত প্রার্থী খালেক নেওয়াজ প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি করেছিল।" [পৃ. ১২৭]

অবিভক্ত বাঙলায় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবুল হাশিম দলের যুব নেতা-কর্মীদের জন্য পার্টি হাউসে রাতের বেলা রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। আত্মজীবনীতে বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে আবুল হাশিম লিখেছেন :

> শেখ মুজিবুর রহমান আমার রাতের ক্লাসে থাকতেন কিন্তু এই তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর উৎসাহ ছিল খুবই কম। তিনি প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন এবং সকালে উঠে জিজ্ঞেস করতেন কি করতে হবে। তিনি কাজের লোক ছিলেন কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করার লোক ছিলেন না। তিনি ঠিক মতো তাঁর কর্তব্য-কর্ম করতেন।
>
> [আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ. ৯২]

আজকের দিনের কোনো মুজিবভক্ত জীবনীকার আবুল হাশিমের এই তথ্য বা বয়ানকে কিভাবে মোকাবেলা করতেন, জানি না। মুজিব কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই লিখে গেছেন :

> মওলানা আজাদ সোবহানী সাহেবকে হাশিম সাহেব আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন কলকাতায়। আমাদের নিয়ে তিনি ক্লাস করেছিলেন। আমার সহকর্মীরা অধিক রাত পর্যন্ত তাঁর আলোচনা শুনতেন। আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে বসে থাকা কষ্টকর। কিছু সময় যোগদান করেই ভাগতাম। আমার বন্ধুদের বলতাম, 'তোমরা পণ্ডিত হও, আমার অনেক কাজ। আগে পাকিস্তান আনতে দাও, তারপর বসে বসে আলোচনা করা যাবে।' হাশিম

> সাহেব তখন চোখে খুব কম দেখতেন বলে রক্ষা। আমি পিছন থেকে ভাগতাম, তিনি কিন্তু বুঝতে পারতেন! পরের দিন দেখা করতে গেলেই জিজ্ঞাসা করতেন, "কি হে তুমি তো গতরাতে চলে গিয়েছিলে।" আমি উত্তর দিতাম, "কি করব, অনেক কাজ ছিল।' কাজ তো থাকতই ছাত্রদের সাথে, দল তো ঠিক রাখতে হবে। [পৃ. ৪১]

আত্মজীবনীর অন্যত্রও মুজিব লিখেছেন,

> আমি অনেকের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, কোনো কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না। অনেক সময় করব কি করব না, এইভাবে সময় নষ্ট করে এবং জীবনে কোনো কাজই করতে পারে না। আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয়, সংশোধন করে নেই। কারণ, যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে, যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না। [পৃ. ৮০]

শেখ মুজিবের মানসগঠন ও প্রবণতা বুঝতে খুবই সহায়ক তাঁর এ কথাগুলো।

দেশ ও দশের সেবার জন্য মুজিব একমাত্র রাজনীতিকেই তাঁর পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এই উপমহাদেশেই গান্ধী বা ভাসানীর মতো অনেকে যা করেছিলেন, রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সামাজিক সেবামূলক কাজ ইত্যাদিতে [স্কুলজীবনে গোপালগঞ্জে 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠনের উদাহরণটি বাদ দিলে] নিজেকে তেমনভাবে জড়ান নি। আর রাজনীতিতে ক্ষমতা বা প্রভাবের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন। বুঝেছিলেন, এ ক্ষেত্রে সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই আর তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষাই আসল। ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে যথাক্রমে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েও তাই তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিত্বের আকর্ষণ ছেড়ে আবার দলের দায়িত্বে ফিরে যান। দলীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাপারটি ঘটলেও, এক্ষেত্রে তাঁর নিজের ইচ্ছাও নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অনেক আগে তিনি যখন কলকাতায় আইএ ক্লাসের ছাত্র তখনই তিনি ছিলেন মুসলিম ছাত্রলীগের একজন প্রভাবশালী নেতা। [পৃ. ২৬] তাঁর নিজের ভাষায়,

> ...বিশেষ করে ইসলামিয়া কলেজে কেউ আমার বিরুদ্ধে কিছুই করতে সাহস পেত না। আমি সমানভাবে মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগে কাজ করতাম। [পৃ. ২৮]

১৯৪৬ সালে তাঁরা যখন ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লিতে মুসলিম লীগের কনভেনশনে যোগ দিতে যাচ্ছেন তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

> ...দুইটা ইন্টারক্লাস বগি আমাদের জন্য ঠিক করে ফেললাম। ছাত্ররা দুষ্টামি করে বগির সামনে লিখে দিল, 'শেখ মুজিবর ও পার্টির জন্য রিজার্ভড'; এ লেখার উদ্দেশ্য হল, আর কেউ এই ট্রেনে যেন না ওঠে। আর আমার কথা শুনলে শহীদ সাহেব কিছুই বলবেন না, এই ছিল ছাত্রদের ধারণা। যদিও ছাত্রদের নেতা ছিল নূরুদ্দিন। তাকেই আমরা মানতাম। [পৃ. ৫০]

রাজনীতি ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে মুজিবের স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় সেই ১৯৫০ এর দশকের শুরুতেই, গোপালগঞ্জ জেল পরিদর্শনে আসা খুলনার সিভিল সার্জেনের

'আপনি কেন জেল খাটছেন' প্রশ্নের জবাবে তাঁর সোজাসাপ্টা জবাবের মধ্যে: 'ক্ষমতা দখল করার জন্য।' পরবর্তী বর্ণনা মুজিবের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক :

> তিনি [সিভিল সার্জন — মোশহা] আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'ক্ষমতা দখল করে কি করবেন?' বললাম, যদি পারি দেশের জনগণের জন্য কিছু করব। ক্ষমতায় না যেয়ে কি তা করা যায়?' তিনি আমাকে বললেন, 'বহুদিন জেলের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। অনেক রাজবন্দির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। অনেকের সাথে আলাপ হয়েছে, এভাবে কেউ আমাকে উত্তর দেয় নাই, যেভাবে আপনি উত্তর দিলেন। সকলের ঐ একই কথা, জনগণের উপকারের জন্য জেল খাটছি। দেশের খেদমত করছি, অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না বলে প্রতিবাদ করেছি, তাই জেলে এসেছি। কিন্তু আপনি সোজা কথা বললেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম।'
>
> [পৃ. ১৮৫]

সমসাময়িক রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাদীক্ষায় তাঁর থেকে অগ্রসর হলেও, তিনি ছিলেন তাঁর ধারার রাজনীতিতে একমাত্র সর্বসময়ের রাজনীতিক। সামরিক শাসন জারির পর কিছু সময়ের জন্য আলফা ইন্সুরেন্সের চাকরি এবং বিভিন্ন সময় উপার্জনের উপায় হিসেবে নানাজনের সঙ্গে ছোটখাট ব্যবসায় জড়িত থাকলেও, রাজনীতি ছাড়া তিনি আসলে কিছুই করতে চান নি। তাঁর বাবা জমি বিক্রি করে হলেও তাঁকে বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হন নি। [ভাগ্যিস, তিনি রাজি হন নি!] এ-সম্পর্কে লিখেছেন, [বাবাকে]

> ... আমি বললাম, 'এখন বিলাতে গিয়ে কি হবে, অর্থ উপার্জন করতে আমি পারব না।' আমার ভীষণ জেদ হয়েছে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি তার উল্টা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন করা দরকার।
>
> [পৃ. ১২৫-২৬]

হ্যাঁ, পরিবর্তনটা শেষাবধি তাঁর নেতৃত্বেই হয়েছে। জন্ম নিয়েছে একটি নতুন রাষ্ট্র, যার নাম বাংলাদেশ। কিন্তু জনগণের স্বপ্নসাধ কি তারপরও পূরণ হয়েছে?

রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। আজীবন তাঁকেই মুজিব নেতা মেনেছেন। আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় সোহরাওয়ার্দীর প্রতি মুজিবের এই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে নেতার সব মতামত বা সিদ্ধান্তকে তিনি অন্ধভাবে সমর্থন করেননি। অনেক সময় মুখের ওপর প্রতিবাদ করেছেন, রাগ করে সভা ছেড়ে বেরিয়েও এসেছেন। এ রকম অন্তত দুটি ঘটনার উল্লেখ আছে বইটিতে, যেখানে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর আপস উদ্যোগের প্রতিবাদ করে মুজিব তাঁকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করেছেন। [পৃ. ২৯ ও ৪২] প্রসঙ্গত সোহরাওয়ার্দীর উদারতা, ভিন্নমতের প্রতি তাঁর সহনশীলতার নীতির প্রশংসা করেও মুজিব লিখেছেন, "উদারতা দরকার, কিন্তু নীচ অন্তঃকরণের ব্যক্তিদের সাথে উদারতা দেখালে ভবিষ্যতে ভালোর থেকে মন্দই বেশি হয়, দেশ ও জনগণের ক্ষতি হয়।" [পৃ. ৪৭] সোহরাওয়ার্দী-শিষ্য মুজিব সম্পর্কেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী শক্তির প্রতি উদারতা বা নমনীয়তার নীতি অনুসরণের সমালোচনা অনেকে করে থাকেন। বলা হয় এভাবে মুজিব গোড়াতেই মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী শক্তির পুনরুত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গেছেন।

৮

খুব আচারনিষ্ঠ অর্থে না হলেও, মুজিব ছিলেন একজন বিশ্বাসী মুসলমান। তাঁর বাঙালি ও মুসলমান পরিচয়ের মধ্যে তিনি যেমন কখনো কোনো বিরোধ কল্পনা করেন নি, তেমনি এই দুই পরিচয়ের কোনো একটিকে তুলে ধরতে গিয়ে অন্যটিকে গৌণ করে দেখানোরও প্রয়োজন বোধ করেন নি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ফিরে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রেসকোর্সের সেই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়েও তিনি বলেন, 'আমি বাঙালি, আমি মুসলমান'। তাঁর আত্মজীবনী পাঠে জানা যায়, ১৯৫০-এর দশকে কারাবন্দি জীবনে তিনি নামাজ পড়তেন, রোজ কোরআন তেলওয়াত করতেন। সে-সময় তাঁর কাছে কোরআন শরিফের কয়েক খণ্ড বাংলা অনুবাদ ছিল। এছাড়া ঢাকা জেলে থাকাকালীন সহবন্দি শামসুল হকের কাছ থেকে মওলানা মোহাম্মদ আলীর অনূদিত কোরআন নিয়েও তিনি পড়েছেন। [পৃ. ১৮০] রোজই মাগরিবের পর মওলানা ভাসানী তাঁকে ও শামসুল হককে কোরআনের 'অর্থ করে বোঝাতেন', লিখেছেন, এটা তাঁদের জন্য 'বাঁধা নিয়ম ছিল'। [পৃ. ১৬৯] তবে ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মের নামে কুসংস্কারের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ বিষয়ে আত্মজীবনীর নানা অংশে তাঁর মনোভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ কর্মী হিসেবে দলের দিল্লি কনভেনশনে যোগদান শেষে কলকাতা ফেরার পথে আজমির শরিফ ও ফতেপুর সিক্রি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে মুজিব লিখেছেন, "আজমীরের খাজাবাবার দরগায় দেখলাম গান বাজনা চলছে সমানে, এখানেও [ফতেপুর সিক্রিতে—হা.শ.] দেখলাম সেই একই অবস্থা। আমাদের বাংলাদেশের মাজারে গান বাজনা করলে আর উপায় থাকত না। খাজাবাবা মঈনুদ্দিন চিশতি ও সেলিম চিশতি দুইজনই নাকি গান ভালোবাসতেন।" [পৃ. ৬০] 'অন্ধ কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাস'কে তিনি বাঙালির দুঃখের অন্যতম কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। [পৃ. ৪৮] আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর *চারিত্রপূজা* গ্রন্থে [১৩১৪] কঠিনভাবেই বাঙালি চরিত্রের নানা ত্রুটি ও খর্বতার উল্লেখ করেছেন, মুজিবও তেমনি তাঁর আত্মজীবনীতে বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান চরিত্রের সমালোচনা করে লিখেছেন :

> ...আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল 'আমরা মুসলমান, আর একটা হল, আমরা বাঙালি।' পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। ... ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালির মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ... এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ... যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।
>
> [পৃ. ৪৭-৪৮]

অত্যন্ত প্রখর পর্যবেক্ষণ। বাঙালি কি নিজের দোষত্রুটি শনাক্ত করার অর্থে আজও নিজেকে চিনেছে? তাই কি আজও সত্যিকার অর্থে বাঙালির মুক্তি এল না?

ধর্ম, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় যার নামেই ঘটানো হোক, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে

যে আসলে কায়েমি স্বার্থের প্ররোচনাই কাজ করে, এ ব্যাপারে মুজিবের স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, আদমজির দাঙ্গা [১৯৫৪] প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তাঁর এ মন্তব্যে : "যুগ যুগ ধরে পুঁজিপতিরা তাদের শ্রেণী স্বার্থে এবং রাজনৈতিক কারণে গরিব শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি সৃষ্টি করে চলেছে।" [পৃ. ২৬৬] ইতিপূর্বে লাহোরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি জায়গায় কাদিয়ানি বিরোধী দাঙ্গার প্রসঙ্গেও লিখেছেন :

> খাজা সাহেবের আমলে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তাতে হাজার হাজার লোক মারা যায়। লাহোরে মার্শাল ল' জারি করা হয়। আহমদিয়া বা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন থেকে এই দাঙ্গা শুরু হয়। কয়েকজন বিখ্যাত আলেম এতে উস্কানি দিয়েছিলেন। 'কাদিয়ানিরা মুসলমান না'—এটাই হল এই সকল আলেমদের প্রচার। আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নাই। তবে একমত না হওয়ার জন্য যে অন্যকে হত্যা করা হবে, এটা যে ইসলাম পছন্দ করে না এবং একে অন্যায় মনে করা হয়—এটুকু ধারণা আমার আছে। ... লাহোরে ও অন্যান্য জায়গায় জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে একসাথে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। যারা এই সমস্ত জঘন্য দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছিল তারা আজও পাকিস্তানের রাজনীতিতে সশরীরে অধিষ্ঠিত আছে। [পৃ. ২৪০-৪১]

উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ওই কাদিয়ানি-বিরোধী দাঙ্গার পেছনে মূল উস্কানিদাতার ভূমিকা ছিল মওলানা মওদুদি ও তাঁর দল জামাতে ইসলামির। এজন্য সামরিক আদালতের বিচারে মওদুদির ফাঁসির আদেশও হয়েছিল। ধর্মের নামে এই সাম্প্রদায়িকতা, কায়েমি স্বার্থে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সেই গোড়ার দিকেই দেখা যায় এর স্বরূপ বুঝতে মুজিবের ভুল হয় নি। এ-প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে তিনি আরও লিখেছেন :

> ...পাকিস্তান হবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান নাগরিক অধিকার থাকবে। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান আন্দোলনের যারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এখন পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার ধুয়া তুলে রাজনীতিকে তারাই বিষাক্ত করে তুলেছে। মুসলিম লীগ নেতারাও কোনো রকম অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রোগ্রাম না দিয়ে একসঙ্গে যে শ্লোগান নিয়ে ব্যস্ত রইল, তা হল 'ইসলাম'। পাকিস্তানের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ যে আশা ও ভরসা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, তথা পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে কোনো নজর দেওয়াই তারা দরকার মনে করল না। জমিদার ও জায়গিরদাররা যাতে শোষণ করতে পারে সে ব্যাপারেই সাহায্য দিতে লাগল। কারণ, এই শোষক লোকেরাই এখন মুসলিম লীগের নেতা এবং এরাই সরকার চালায়। [পৃ. ২৪১]

মুজিব যখন কারাগারে বসে এই আত্মজীবনীটি লেখেন, সেই ১৯৬০ দশকের শেষাবধি, তিনি আর যা-ই হোক, তাঁর সমাজতন্ত্র অনুরাগের জন্য পরিচিত ছিলেন না। আওয়ামী লীগের দলীয় কাগজপত্রে তখন কৃচিৎ, তাও খুব হালকাভাবে, 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' কথাটির উল্লেখ দেখা যেত। কিন্তু সে-সময়ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধ হিসেবে তিনি সমাজতন্ত্রকে দেখেছেন। অন্তত তাঁর আত্মজীবনীতে তেমন ভাবনাই বেশ স্পষ্টতার

সাথে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> ... আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্মী আছে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে; এবং তাঁরা জানে সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র জনগণের মুক্তির পথ। ধনতন্ত্রবাদের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করা চলে। যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কোনোদিন কোনো রকমের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান। শোষক শ্রেণীকে তারা পছন্দ করে না।
>
> [পৃ. ২৫৮-৫৯]

তবে লক্ষণীয়, মুজিব এখানে তাঁর দলে 'যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে' তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন, তিনিও তাঁদের একজন কি না সেটা স্পষ্ট করেন নি। বলেন নি তিনি নিজে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন কি না, কিংবা করলেও কেমন ধরনের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন।

আমরা জানি ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ সৃষ্টির পেছনে স্বাধীন বা জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে বিরোধ অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু মুজিবের এই আত্মজীবনী পাঠে জানা যায়, ১৯৫৪-এর নির্বাচনের আগেও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। সে-সময় দলীয় কাউন্সিলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্বয়ং শেখ মুজিব, আর তাঁর সে-প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে আবদুস সালাম খান মুজিবকে 'অতি প্রগতিবাদী বলে আক্রমণ' করেছিলেন। [পৃ. ২৪৮] মুজিব জানাচ্ছেন, জবাব দিতে গিয়ে পাল্টা তিনিও সালাম খানকে বলেছিলেন 'অতি প্রতিক্রিয়াশীল'। [পৃ. ২৪৮] লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে গোড়া থেকেই পাকিস্তানের আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়া, মোহাম্মদ আলীর [বগুড়া] আমলে মার্কিনি ব্লকে শামিল হওয়া, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ও সিয়াটো-সেন্টো জোটে যোগ দেওয়ার সমালোচনা মুজিব করেছেন। তাঁর মতে এভাবে পাকিস্তান 'পুরোপুরি আমেরিকার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যায়'। [পৃ. ২৭৯] এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন,

> ... চুক্তির মধ্যে যা আছে তা পরিষ্কারভাবে কমিউনিস্টবিরোধী চুক্তি বলা যেতে পারে। নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের উচিত ছিল নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। ... কোনো যুদ্ধ জোটে যোগদান করার কথা আমাদের চিন্তা করাও পাপ। ...
>
> [পৃ. ২৭৯]

তবে মুজিবের এই বক্তব্য থেকে তাঁকে বাম-মনোভাবাপন্ন বা কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনে করাটাও হবে বিষয়ের অতিসরলীকরণ। কারাজীবনে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের অনেকের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও, এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতায় কমিউনিস্টদের একাংশের সঙ্গে মিত্রতার নীতি অনুসরণ করলেও, যাকে বলে কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল তা তিনি কখনোই ছিলেন না। আবার উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতার অর্থে দক্ষিণপন্থীও তাঁকে বলা যাবে না। যদিও মুসলিম লীগ আমল থেকেই দলের ভেতরে কমিউনিস্টদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। যদিও পাকিস্তান দাবির প্রতি এক পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সমর্থন, আবুল হাশিম যখন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক তখন তাঁর উদ্যোগে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে লীগের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, এমনকি লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র

তৈরিতেও কমিউনিস্টদের সহযোগিতার মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে মুজিব কতটা অবহিত ছিলেন, তাঁর আত্মজীবনী পাঠে তা জানা যায় না। অথবা হতে পারে বিষয়গুলোকে তিনি উল্লেখ করার মতো তত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি। আর কৌশলগত কারণে অর্থাৎ দলের ভেতরের অতি দক্ষিণপন্থীদের মোকাবেলায় কখনো কখনো তাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজও করেছেন। আবার উল্টো উদাহরণও আছে। আর কেবল ১৯৫৭ সালে পররাষ্ট্রনীতি, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ গঠনের সময়ই তা ঘটেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব-বাঙলায় প্রথম অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের সময় সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রশ্নে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মতভিন্নতা, মুসলিম লীগ কর্মী হিসেবে 'কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ও তাদের সমর্থকদের' বিরোধিতা এবং শেষপর্যন্ত যুবলীগের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগের কথা মুজিব নিজেই তাঁর এ আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। [পৃ. ৮৫ ও ৮৭-৮৮] এ-পর্যায়ে কমিউনিস্টদের প্রতি তাঁর বিরূপতা এবং সে-বিরূপতার কারণ স্পষ্ট হবে তাঁর আত্মজীবনীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে :

> দুই চারজন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছাত্র ছিল যারা সরকারকে পছন্দ করত না। কিন্তু তারা এমন সমস্ত আদর্শ প্রচার করতে চেষ্টা করত যা তখনকার সাধারণ ছাত্র ও জনসাধারণ শুনলে ক্ষেপে যেত। এদের আমি বলতাম, 'জনসাধারণ চলছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।' তারা তলে তলে আমার বিরুদ্ধাচরণ করত, কিন্তু ছাত্রসমাজকে দলে ভেড়াতে পারত না। [পৃ. ১০৯]

কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীদের অনুসৃত গোপন রাজনীতির প্রতিও মুজিবের বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আত্মজীবনীতে, যেখানে সেই ১৯৪৯ সালে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তাঁর প্রতি মওলানা ভাসানীর পরামর্শের প্রসঙ্গ টেনে তিনি লিখেছেন, "আমি গোপন রাজনীতি পছন্দ করি না, আর বিশ্বাসও করি না।" [পৃ. ১৩৪] তাঁর কাছে গোপন রাজনীতির মানে হল, 'পালিয়ে বেড়াবা'র রাজনীতি। [পৃ. ১৩৪] এ থেকে যাঁরা কেন মুজিব একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা দিলেন, কেন বাড়ি থেকে সরে গেলেন না, আত্মগোপন করে স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন না, এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে গলদঘর্ম হন, তাঁরা হয়তো একটা উত্তর পেয়ে যাবেন। এর আগেও দেখা গেছে আইয়ুব বা ইয়াহিয়ার মার্শাল ল জারির সময়, কিংবা যখনই পাকিস্তানে সরকারি দমননীতির মুখে প্রকাশ্য রাজনীতির পথ বন্ধ হয়েছে, তিনি আগেভাগেই বাক্স গুছিয়ে জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি থেকেছেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টও বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঘাতকদের উদ্দেশে নাকি তাঁর প্রশ্ন ছিল : 'আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যেতে চাস?' প্রধান সেনাপতি সফিউল্লাহর টেলিফোনে তাঁকে 'কোনোমতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা'র অবাস্তব পরামর্শ শুনে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা জানার কোনো সুযোগ অবশ্য আজ আর আমাদের নেই।

১৯৫২ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদ আয়োজিত সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মুজিব বেইজিং [তখনকার পিকিং] গিয়েছিলেন। সেটিই ছিল তাঁর প্রথম কোনো

কমিউনিস্ট দেশ সফর। এ উপলক্ষে তাঁর চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় এই আত্মজীবনীতে। বিপ্লবোত্তর চীনের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

> ... বিপ্লবী সরকার সমস্ত জাতটার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে নতুন চিন্তাধারা দিয়ে। [পৃ. ২২৭]

এ সময় চীনের সাধারণ মানুষেরও সততা ও বিশ্বস্ততার যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন তা তাঁকে যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি পিকিং যাওয়া-আসার পথে চীনেরই তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকা হংকংয়ের মানুষের নৈতিকতার নিম্নমান তাঁকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করে। হংকংকে তাঁর মনে হয়েছে 'চোরাকারবারিদের আড্ডা', সেখানকার সবকিছুকেই মনে হয়েছে কৃত্রিম। [পৃ. ২৩৪] এ-প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে মুজিবের আরও মন্তব্য :

> ...হংকংয়ের আরেকটা নাম হওয়া উচিত ছিল 'ঠগিবাজি শহর'। রাস্তায় হাঁটবেন পকেটে হাত দিয়ে, নাহলে পকেট খালি। এত সুন্দর শহর তার ভিতরের রূপটা চিন্তা করলে শিউরে উঠতে হয়। ... হংকং এত পাপ সহ্য করে কেমন করে, শুধু তাই ভাবি। [পৃ. ২২৫]

তবে তৎকালীন পাকিস্তান থেকে নানা উপলক্ষে চীন সফরে যাওয়া অন্য অনেকের মতো মুজিবও চীনের অগ্রগতি, সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও মানুষের নৈতিকতার সপ্রশংস উল্লেখ করলেও, এটা যে কমিউনিস্ট শাসনের ফল সরাসরি এমন মন্তব্য তিনি কোথাও করেন নি। তিনি যা লক্ষ করেছেন তা হল, সে-দেশের জনগণ তাদের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। আর চীনের 'নতুন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার'-এ অন্য মতের লোক থাকলেও, কমিউনিস্টরাই যে 'সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে', সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। [পৃ. ২৩৪] প্রসঙ্গত বিপ্লবোত্তর চীনের [মুজিব অবশ্য বিপ্লবের পরিবর্তে ঘটনাটিকে চীনের স্বাধীনতা লাভ বলে উল্লেখ করেছেন] সঙ্গে নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের তুলনা করে মুজিব লিখেছেন,

> ...আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালে আর চীন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯ সালে। যে মনোভাব পাকিস্তানের জনগণের ছিল, স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথে আজ যেন তা ঝিমিয়ে গেছে। সরকার তা ব্যবহার না করে তাকে চেপে মারার চেষ্টা করেছে। আর চীনের সরকার জনগণকে ব্যবহার করছে তাদের দেশের উন্নয়নমূলক কাজে। তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হল, তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ এবং এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন। [পৃ. ২৩৪]

কথাগুলো পড়তে পড়তে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, দু-দুবারের পরাধীনতামুক্তির পর আজও আমরা কিংবা পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের জনগণ কি তাদের জাতীয় সম্পদকে নিজেদের বলে ভাবতে পারছি? না পারার একটা বড় কারণ কি সমাজের অসমবিকাশ বা ধনবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত নয়? 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই', 'তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না' বলে উল্লেখ করে মুজিব লিখেছেন,

> ...একে [পুঁজিবাদী অর্থনীতি — মোশহা] আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই

> পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। [পৃ. ২৩৪]

চীনের উন্নয়ন নীতির বৈশিষ্ট্য, তার স্বনির্ভরতার আদর্শের উল্লেখ করতে গিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা টেনেছেন :

> ... ব্লেড কিনতে গেলে শুনলাম, ব্লেড পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে ব্লেড আনার অনুমতি নাই। ... চীন দেশে যে জিনিস তৈরি হয় না, তা লোকে ব্যবহার করবে না। পুরানা আমলের ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কাটা হয়। ... এরা শিল্প কারখানা বানানোর জন্যই শুধু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে। আমাদের দেশে সেই সময়ে কোরিয়ার যুদ্ধের ফলস্বরূপ যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছিল তার অধিকাংশ ব্যয় হল জাপানি পুতুল আর শৌখিন দ্রব্য কিনতে। দৃষ্টিভঙ্গির কত তফাৎ আমাদের সরকার আর চীন সরকারের মধ্যে! এদেশে একটা বিদেশী সিগারেট পাওয়া যায় না। সিগারেট তারা তৈরি করছে নিকৃষ্ট ধরনের, তাই বড় ছোট সকলে খায়। [পৃ. ২৩১]

চীনের আজকের অভাবনীয় অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনেও কি সেদিনের সেই কৃচ্ছ্রতার মনোভাব ও স্বনির্ভর নীতির কি একটা বড় ভূমিকা নেই? ভিতটা তো সেদিন সেভাবেই রচিত হয়েছিল।

তবে চীন সফর ও শান্তি সম্মেলনের কার্যক্রম নিয়ে মুজিবের যে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিচয় আমরা অন্তত তাঁর আত্মজীবনী থেকে পাই [সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে কবি নাজিম হিকমত, আসিমভ ও মাদাম সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপের কথা তিনি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন], তার সঙ্গে তুলনায়, দেখা যায়, প্রতিনিধি দলের পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম সদস্য তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার প্রতিক্রিয়া প্রথম থেকেই অনেকটাই যেন নিরুত্তাপ ধরনের। সম্মেলন চলাকালে গঠিত কমিশনগুলোর একটিতে মুজিব সদস্য ছিলেন। তিনি কমিশনের আলোচনায় যোগদান করলেও, লিখেছেন, "মানিক ভাই কমিশনে বসতেন না বললেই চলে। তিনি বলতেন, প্রস্তাব ঠিক হয়েই আছে।" [পৃ. ২২৯] বলা বাহুল্য, মানিক মিয়া তাঁর কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু কথাটা সেদিন তিনি হয়তো খুব ভুল বলেননি।

বেইজিং শান্তি সম্মেলনে মুজিব বাংলায় তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, এতে খুশি হয়ে সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য, বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক মনোজ বসু ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, এবং বলেছিলেন, 'ভাই মুজিব, আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারে নাই। আর পারবেও না।' ইত্যাদি। [পৃ. ২২৮] কিন্তু ওই বেইজিং সম্মেলনে যোগদানকালীনই কোনো এক সময় মুজিব নাকি মনোজ বসুর কাছে পূর্ব-বাঙলার স্বাধীনতার ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরবর্তীকালে কারো কারো লেখায় যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু মুজিবের আত্মজীবনীতে তেমন কোনো ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সম্মেলনে নিজের বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করা প্রসঙ্গে মুজিব লিখেছেন,

> ... কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন।

> পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। ... আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য। [পৃ. ২২৮]

তবে এই সম্মেলনে যোগদানকাল পর্যন্ত তিনি যে একজন দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি ছিলেন [আর সেটাই তখন স্বাভাবিক ছিল] তারও প্রমাণ রয়েছে বইটিতে। বেইজিং সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের পক্ষে একমাত্র মহিলা বক্তা তাহেরা মাজহারের 'খুবই ভালো বক্তৃতা'য় পাকিস্তানের 'ইজ্জত বাড়া'য় যেমন মুজিব আনন্দিত হয়েছেন, [পৃ. ২২৯] তেমনি সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিরা পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেওয়া যুক্ত বিবৃতিতে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করায় একজন পাকিস্তানি হিসেবে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে লিখেছেন, "এতে কাশ্মীর সমস্যা সমস্ত প্রতিনিধিদের সামনে আমরা তুলে ধরতে পেরেছিলাম।" [পৃ. ২২৯] এরই পাশাপাশি শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সরকারি দল অর্থাৎ মুসলিম লীগের, তাঁদের সঙ্গে নিজেদের মনোভঙ্গিগত পার্থক্যের কথাও মুজিব বলেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের দাওয়াত-পাল্টা দাওয়াতের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যা প্রকাশিত হয়। [পৃ. ২২৯]

ভারত-চীন যুদ্ধ আরও কয়েক বছর পরের ঘটনা। মুজিব যখন চীনদেশে যান সেটা ছিল 'হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই'এর যুগ। সে-সময় চীনাদের মধ্যে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের ব্যাপারেই তিনি বেশি আগ্রহ লক্ষ করেছেন। মুজিবের ভাষায়; "চীনের সরকার ও জনগণ ভারতবর্ষ বলতে পাগল। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তারা আগ্রহশীল, তবে ভারতবর্ষ তাদের বন্ধু, তাদের সবকিছুই ভালো।" [পৃ. ২৩০]

আর কিছু না হোক, অন্তত তাঁর নেতা ও রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে শেখ মুজিব পাশ্চাত্যপন্থী বা আসলে কিছুটা মার্কিন-অনুরাগী ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এমন একটি ধারণা ১৯৬০ দশকের শেষাবধি চালু ছিল। আর সে-ধারণাটিকে একেবারে ভ্রান্ত বা অমূলকও বলা যাবে না। তবে জনমানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো নেতার পক্ষেই বোধহয় আমেরিকা কেন, কোনো বিদেশী শক্তিরই অন্ধ অনুরাগী হওয়া সম্ভব নয়। এখানেই বিশ্বের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে মুজিবের মিল এবং মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মতো জনভিত্তিহীন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর তফাত। শেষোক্তজনের প্রধানমন্ত্রিত্ব প্রসঙ্গে মুজিবের নিম্নোক্ত মন্তব্যেই যা স্পষ্ট হয় :

> মোহাম্মদ আলীর [বগুড়া] মধ্যে কোনো রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। তাঁর মধ্যে কোনো গভীরতাও ছিল না। শুধু আমেরিকা থেকে তিনি আমেরিকানদের মত কিছু হাবভাব ও হাঁটাচলা আর কাপড় পরা শিখে এসেছিলেন। গোলাম মোহাম্মদ যা বলেন, তাতেই তিনি রাজি। আর আমেরিকানরা যে বুদ্ধি দেয় সেইটাই তিনি গ্রহণ করে চলতে লাগলেন। আমেরিকান শাসকগোষ্ঠীরা যেমন সকল কিছুর মধ্যে কমিউনিস্ট দেখতেন, তিনিও দেখতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি শহীদ সাহেবকে তাঁর 'রাজনৈতিক পিতা' বলে সম্বোধন করলেন, পরে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করলেন। [পৃ. ২৪৩]

৯

১৯৫৪ সালে পূর্ব-বাঙলার প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন এবং তাতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের কথা আমরা জানি। কিন্তু মুজিবের এই আত্মজীবনী পাঠেই অনেকে হয়তো প্রথমবারের মতো জানতে পারবেন, ভাসানী ও মুজিব দুজনেই যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিরোধী ছিলেন আতাউর রহমান খানও। এমন কি সোহরাওয়ার্দিও এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন না। আওয়ামী লীগের ভেতরে আবদুস সালাম খান, খোন্দকার মোশতাক, হাশিমউদ্দিন এঁরা ছিলেন যুক্তফ্রন্ট গঠনের পক্ষে। [পৃ. ২৪৪-৪৮] যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরুদ্ধে মুজিবের যুক্তি ছিল, হামিদুল হক চৌধুরী ও মোহন মিয়ার মতো 'আদর্শহীন লোক'দের নিয়ে 'জগাখিচুড়ি' করে ক্ষমতায় হয়তো যাওয়া যাবে, কিন্তু 'দেশের কাজ হবে না'। [পৃ. ২৪৯] আর যেখানে আদর্শের মিল নেই, সেখানে 'ঐক্যও বেশিদিন থাকে না'। [পৃ. ২৫০] বলা বাহুল্য, যুক্তফ্রন্টের বিরাট বিজয়ের দিন কয়েকের মধ্যেই মুজিবের এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হতে শুরু করে। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের জন্য দায়ী ছিল না, ফ্রন্টের শরিকি কোন্দলও এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানি শাসকেরা যার সুযোগ নিয়েছিল, কিংবা অন্যকথায় বলা যায়, তাকে কাজে লাগিয়েছিল। পরবর্তী সময়েও [যেমন ১৯৭০-এর নির্বাচনকালে] অন্য দলের সঙ্গে জোট গঠনের প্রশ্নে মুজিবের স্পষ্ট অনীহা ও বিরূপ মন্তব্য ['সাইনবোর্ড পাল্টে চলে আসুন'] তাঁর সে-পুরনো রাজনৈতিক অবস্থানের ধারাবাহিকতা বললে সুতরাং মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির ব্যাপারটিকেও মুজিব স্রেফ ভাবাবেগের প্রকাশ হিসেবে দেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য :

> ...জনসাধারণ মুসলিম লীগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের নাম জনসাধারণ জানত না।
>
> [পৃ. ২৫০]

তবে ১৯৫৪-এর নির্বাচনের কয়েকটি ইতিবাচক দিকের কথাও তিনি বলেছেন। যেমন এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে তাঁর উপলব্ধি হয় :

> জনগণকে ইসলাম ও মুসলমানের নামে স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দেবে না। [পৃ .২৫৮]

উল্লেখ্য যে, ওই নির্বাচনে তাঁর নির্বাচনী এলাকার 'প্রায় সকল' মওলানা-মৌলভি ও দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট পীর তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে ও নানা ফতোয়া দিয়েও, তাঁর জয় ঠেকাতে পারেননি। দেশের লোক যে তাঁকে কত ভালোবাসে, সেটাও তিনি ওই নির্বাচনী প্রচারে নেমেই প্রথম বুঝতে পারেন। এ-প্রসঙ্গে মুজিবের মন্তব্য : "আমার মনের একটা বিরাট পরিবর্তন এই সময় হয়েছিল।" [পৃ. ২৫৬] এ সময়ই তাঁর ধারণা হয়েছিল.

> ... মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে। [পৃ. ২৫৭]

মুজিবের এই স্মৃতিচারণা সূত্রে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যও আমরা জানতে পারি।

আলতাফ গওহর, পরবর্তীকালে যিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পরম আস্থাভাজন তথ্যসচিব ও তাঁর প্রশাসনের অত্যন্ত প্রভাবশালী আমলা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, চুয়ান্নর নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তো সরকারের চাপ সত্ত্বেও তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে সেখান থেকে বদলি করে দেওয়া হয়। [পৃ. ২৫৬]

১০

আমরা জানি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মুজিবের ছিল আগাগোড়া যাকে বলে এক অম্ল-মধুর সম্পর্ক। উত্তর-জীবনে রাজনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব কখনোই পরস্পরের প্রতি ভক্তি-স্নেহ ও নির্ভরতা পরিহার করেন নি। তা তাঁদের অনুসারী ও অন্যদের কাছে বিষয়টি যতই দুর্বোধ্য বা রহস্যময় ঠেকুক না কেন। ভাসানীর সঙ্গে জেলে একসঙ্গে কাটাবার পর ১৯৫০-এর শেষদিকে যখন তাঁকে গোপালগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ হয় তখন ভাসানীকে ছেড়ে যেতে তাঁর 'খুব কষ্ট' হওয়ার কথা মুজিব লিখেছেন। [পৃ. ১৭৫] আত্মজীবনীতে মুজিব বার কয়েক ভাসানীর ভূমিকার ব্যাপারে আপন বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, তাঁর 'দরকারের সময় আত্মগোপনের মনোভাব' বা 'বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সরে থাকার চেষ্টা'র সমালোচনা করেছেন। [পৃ. ২৫৫ ও ২৪৬] ভাসানীর মধ্যে তাঁর ভাষায় 'উদারতার অভাব'ও লক্ষ করেছেন মুজিব। [পৃ. ১২৮] এমনও মন্তব্য করেছেন, "মওলানা ভাসানীর খেলা বোঝা কষ্টকর।" [পৃ. ২৪৬] তারপরও জানিয়েছেন তিনি ভাসানীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। কারণ, ভাসানী 'জনগণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত'। [পৃ. ১২৮] রাজনীতিতে এই ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মনোভাবকে মুজিব সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করলে পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য ও তাদের জন্য মায়া ত্যাগ করতেই হয়, মুজিব সেটা জানতেন। তাই দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> ... ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে। [পৃ. ১৬৪]

দিনের বেলায় বিদায় নিতে গেলে মেয়ে 'হাচিনা' কান্নাকাটি করবে ভেবে, তিনি রাতের বেলা তাদের ছেড়ে আসেন। [পৃ. ১৬৫] আমাদের আজকের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভাসানী-মুজিবের এই ত্যাগের মনোভাব এবং স্বজন-পরিজনের টান উপেক্ষা করার ক্ষমতা বা প্রস্তুতির ছিটেফোঁটাও কি আমরা দেখতে পাই?

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের মানসিক অসুস্থতা ও পরবর্তী নিখোঁজ রহস্যের মীমাংসা আজও হয়নি। শামসুল হকের অসুস্থতার পর দলের যুগ্মসম্পাদকদের [খন্দকার মোশতাকও যাঁদের অন্যতম ছিলেন] মধ্যে শেখ মুজিবই সাধারণ

সম্পাদক হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ফলে শামসুল হকের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে যে গুজব বা গালগল্প এক সময় এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ডালপালা মেলেছিল, তাতে শেখ মুজিবের নামটি ঠারেঠুরে হলেও উচ্চারিত হত। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে শুধু যে শামসুল হকের মানসিক ভারসাম্যহীনতার সূচনা-পর্ব সম্পর্কে কাছ থেকে দেখা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বর্ণনা আছে তা-ই নয়, বইটির নানা স্থানে শামসুল হকের প্রতি মুজিবের গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ১৯৪৮ সালে ঢাকায় জিন্নাহর সঙ্গে ছাত্র ও যুবনেতাদের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "শামসুল হক সাহেবের সৎ সাহস ছিল, সত্য কথা বলতে কাউকেও ভয় পেতেন না।" [পৃ. ৯৯] উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে নিরাপত্তা-বন্দী হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের সঙ্গে একই কক্ষে ছিলেন শেখ মুজিব। শামসুল হকের অসুস্থতার শুরু এ-সময়ই। দেশের জন্য শামসুল হকের অবদানের কথা বলতে গিয়ে মুজিব লিখেছেন:

> ... একজন নিঃস্বার্থ দেশকর্মী, ত্যাগী নেতা আজ দেশের কাজ করতে যেয়ে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে থেকে পাগল হয়ে বের হলেন। এ দুঃখের কথা কোথায় বলা যাবে? পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর অবদান যাঁরা এখন ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বাংলাদেশে যে কয়েকজন কর্মী সর্বস্ব দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করেছে তাদের মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। ১৯৪৩ সাল থেকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে জমিদার, নবাবদের দালানের কোঠা থেকে বের করে জনগণের পর্ণকুটিরে যাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক সাহেব ছিলেন অন্যতম। ... সেই পাকিস্তানের জেলেই শামসুল হক সাহেবকে পাগল হতে হল। [পৃ. ২৩৬-৩৭]

ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে যাঁরা যতটুকুই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন, আত্মজীবনীতে মুজিব তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক অবস্থানগত পার্থক্য বা তাঁদের অন্য সময়ের ভূমিকা বিবেচনা করে তিনি তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়ও যে বাঙালি ও পাঞ্জাবি গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, ফজলুর রহমানের [বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার করার প্রশ্নে যাঁর ভূমিকা ছিল স্পষ্ট নেতিবাচক] মতো বাঙালি মন্ত্রীরা যে সেখানে পাঞ্জাবি গোষ্ঠীর বিরোধিতার মুখে পূর্ব-বাঙলার স্বার্থরক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, আর পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের নেতারা যে 'তলে তলে' সে-সময় বাঙালি গ্রুপকে সাহায্য করতেন, [পৃ. ১৯৬] সে-তথ্য আমরা মুজিবের এই আত্মজীবনী পাঠেই ভালোভাবে জানতে পারি। আইয়ুব-মোনায়েমি আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে ড. ওসমান গনি তাঁর ভূমিকার জন্য ছিলেন একজন নিন্দিত-ধিকৃত ব্যক্তি। আর প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ তাঁর লেখক ও শিক্ষাব্রতী পরিচয়ের বাইরে ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুসলিম লীগার। তিনি যে শুধু ১৯৫৪ সালেই যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন তাই নয়, ১৯৭০-এর নির্বাচনেও তিনি কাইয়ুম মুসলিম লীগের হয়ে লড়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে মুজিবসহ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে বহিষ্কারের ঘটনার পর ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় সলিমুল্লাহ হলের তৎকালীন

প্রভোস্ট হিসেবে সেই ওসমান গনিই যে ছাত্রনেতাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং ইব্রাহীম খাঁ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন [যদিও বাকি সদস্যদের বিরোধিতার কারণে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নি] সেটা মুজিবের লেখা পড়েই হয়তো অনেকে প্রথমবারের মতো জানতে পারবেন। [পৃ. ১১৬] ভালোমন্দ এমন অনেক তথ্যই আছে যা মুজিবের এ-বইটি না পড়লে হয়তো আজকের দিনের পাঠকের জানা হতো না। যেমন, *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন [মানিক মিয়া] তাঁর পত্রিকায় মুসাফির নামে জনপ্রিয় 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলাম লিখতে শুরু করার আগে যে 'ইংরেজি লিখতে ভালোবাসতেন, বাংলা লিখতে চাইতেন না' [পৃ. ১৭৫] এ তথ্যটা আমরা কজন জানতাম?

যে-সময়ের কথা মুজিব লিখেছেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সত্ত্বেও, তখন নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সৌজন্য ও সৌহার্দ্যের। যেমন টি [তফাজ্জল] আলী আগাগোড়াই মুসলিম লীগ রাজনীতির অনুসারী ছিলেন, মুজিব যখন তাঁর আত্মজীবনীটি লেখেন তখন তিনি কাউন্সিল মুসলিম লীগ করেন। তারপরও পুরনো একটি ঘটনা প্রসঙ্গে টি আলীর সৌজন্যবোধের উল্লেখ করতে গিয়ে মুজিবের মন্তব্য : "এই ভদ্রতাবোধের জন্য তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করেছি এবং তাঁর সাথে আমার সম্বন্ধ কোনোদিন নষ্ট হয় নাই।" [পৃ. ১০১] ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের ভাঙন ও ন্যাপের জন্মের পেছনে রাজনৈতিক মতপার্থক্যগত বিরোধ ছাড়াও মুজিব-অলি আহাদের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বও একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল [যদিও অলি আহাদ ন্যাপের রাজনীতির সঙ্গে পরে আর যুক্ত থাকেন নি]। এ-ঘটনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অলি আহাদ তাঁর *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫* গ্রন্থে [১৯৮২] শেখ মুজিবের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মুজিব দেখা যায় ঘটনার প্রায় এক দশক পর লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে অলি আহাদ তাঁকে 'খুবই শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত' বলে জানিয়েছেন। [পৃ. ১৯৬-৯৭] ১৯৫০-এর দশকে পূর্ব-বাঙলায় মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে অলি আহাদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক যুবলীগের অবদানের কথাও বলেছেন তিনি। [পৃ. ২৩৬] আবার দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের সময় অলি আহাদ যে সংগঠনের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত থাকায় তাতে যোগ দিতে রাজি হন নি, সে-কথার উল্লেখ করে মুজিব লিখেছেন,

> ... অলি আহাদ এর সভ্য হতে আপত্তি করল। কারণ সে আর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান করবে না। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নাম দিলে সে থাকতে রাজি আছে। আমরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এবং বললাম, 'এখনও সময় আসে নাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের আবহাওয়া চিন্তা করতে হবে। নামে কিছুই আসে যায় না। আদর্শ যদি ঠিক থাকে, তবে নাম পরিবর্তন করতে বেশি সময় লাগবে না। কয়েক মাস হল পাকিস্তান পেয়েছি। যে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান পেয়েছি, সেই মানসিক অবস্থা থেকে জনগণ ও শিক্ষিত সমাজের মত পরিবর্তন করতে সময় লাগবে। [পৃ. ৮৮-৮৯]

মজার ব্যাপার হল, তেইশ বছর পর, অসাম্প্রদায়িকতার নীতির ভিত্তিতে ও মুজিবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশে সেই একই অলি আহাদকে 'আজাদ বাংলা' কায়েমের স্লোগান নিয়ে রাজনীতি করতে দেখা গেছে। যে-স্লোগানের মধ্যে অনেকে সে-সময়

সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। মুজিব-হত্যা পরবর্তী তাঁর রাজনীতিও কি ১৯৪০-৫০ দশকের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল? এই যে উল্টোযাত্রা এ কি শুধু ব্যক্তির, না কি সমাজের, বা একার্থে ইতিহাসেরও?

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর মূলত মুজিবেরই উদ্যোগে এনডিএফ থেকে বেরিয়ে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত হলেও, আতাউর রহমান খান কিন্তু আর কখনোই আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন নি। তিনি আওয়ামী লীগে থাকাকালেও মুজিবের সঙ্গে তাঁর মত ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের বিষয়টি মোটামুটি সুপরিজ্ঞাত ছিল। তারপরও আত্মজীবনীতে এই জ্যেষ্ঠ সহকর্মীর উল্লেখ করে মুজিব লিখেছেন,

> ... আতাউর রহমান সাহেবকে যে কোনো সময় ডাকলে পাওয়া যেত। ... তিনি কোনো সময় কোনো কাজে আপত্তি করতেন না। তাঁর নিজের উদ্যোগ খুব কম ছিল, তবুও ডাকলে পাওয়া যেত। [পৃ. ২২০]

একইভাবে দলে তথা এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ইয়ার মোহাম্মদ খানের [দল বিভক্তির পর যিনি ন্যাপে যোগ দেন] মতো অনেকেরই অবদানের উল্লেখ মুজিব আত্মজীবনীর একাধিক স্থানে করেছেন। এমন কি রাজনীতিতে যাঁরা ছিলেন তাঁর বরাবরের বিরোধী তাঁদেরও যাঁর মধ্যে যতটা গুণ দেখেছেন, তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন সৈয়দ আজিজুল হক [নান্না মিয়া] সম্পর্কে লিখেছেন,

> "তাঁর একমাত্র পরিচয় লোকে জানত, 'হক সাহেবের ভাগিনেয়'। লোক হিসাবে সৈয়দ আজিজুল হক অমায়িক ও ভদ্র। আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ খুবই মধুর ছিল। কলকাতা থেকে তাঁকে আমি জানতাম। কোনোদিন তাঁকে আমি রাগ হতে দেখি নাই।" [পৃ. ২৬১] কিংবা রাজনীতিতে

তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইউসুফ আলী চৌধুরী [মোহন মিয়া] সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

> ...তিনি জীবনভর মন্ত্রিত্ব ভাঙছেন আর গড়েছেন। তাঁর একটা অসুবিধা হল তিনি লেখাপড়া ভালো জানতেন না, তাই কেউই তাঁর নাম বলেন না। কর্মী হিসাবে তাঁর মত কর্মী এদেশে খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। রাতদিন সমানভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন। তাঁকে অনেকে Evil Genius বলে থাকেন। যদি ভাল কাজে তাঁর বুদ্ধি ও কর্মশক্তি ব্যবহার করতেন তাহলে সত্যিকারের দেশের কাজ করতে পারতেন। [পৃ. ২৬১]

১১

বর্তমানে রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রশ্নটি যখন প্রায় অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন শেখ মুজিবের আত্মজীবনীতে উল্লেখিত কিছু তথ্য হয়তো রাজনীতি ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট মানুষ, এমন কি সাধারণ পাঠকেরও বিস্ময় জাগাবে। যেমন তিনি লিখেছেন, "তখন কর্মীরাই আওয়ামী লীগে টাকা দিয়ে কাজ চালাত।" [পৃ. ২১৯] কথাটাকে ঠিক আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে, আমরা যদি তার আংশিক সত্যতায় বিশ্বাস করি, তাহলেও একটি সাধারণ প্রবণতা হিসেবে রাজনীতির গুণগত ভিন্নতার তা পরিচয় দেয়। যেমনিভাবে দেশ-বিভাগোত্তর কালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের প্রথম সম্মেলনেই ছাত্ররাজনীতি থেকে তাঁর বিদায় নেওয়ার ঘোষণাটি দিতে গিয়ে মুজিবের বক্তব্যটি খুবই প্রণিধানযোগ্য:

> ... আজ থেকে আমি আর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভ্য থাকব না। ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সভ্য থাকার আর আমার কোনো অধিকার নাই। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কারণ আমি আর ছাত্র নই। [পৃ. ১২৬]

ওই সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর লিখিত ভাষণে মুজিব খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কথাও বলেছিলেন বলে আমরা তাঁর আত্মজীবনী পাঠে জানতে পারি, তা হল, 'শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।' [পৃ. ১২৬]

হায়, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যখন মুজিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, তাঁর অবস্থান জনগণমন অধিনায়কের, তখন যদি তিনি কথাটা মনে রাখতে পারতেন, অন্ত ত ১৯৭৩ ও ৭৫ সালে গণতন্ত্রের এই আবশ্যকীয় শর্তের প্রতি সামান্য গুরুত্ব দিতেন, খুব সম্ভব জাতি পরবর্তী অনেক অঘটন থেকে রক্ষা পেত।

আজকের দিনে যদিও ব্যাপারটা কাউকে আশ্চর্য করে না, সেই বিভাগপূর্ব আমলেই রাজনীতি ও রাজনীতিকদের এক অন্য রূপ দেখার অভিজ্ঞতা মুজিবের হয়েছিল। টাকার বিনিময়ে পরিষদ-সদস্যদের আত্মবিক্রয়ের ঘটনা দেখে তিনি বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তাঁর মন্তব্য :

> ... এর পূর্বে আমার ধারণা ছিল না যে এমএলএরা এইভাবে টাকা নিতে পারে। এরাই দেশের ও জনগণের প্রতিনিধি! ... আমরা ছাত্র ছিলাম, দেশকে ভালোবাসতাম, দেশের জন্য কাজ করতাম, এই সকল জঘন্য নীচতা এই প্রথম দেখলাম, পরে যদিও অনেক দেখেছি, কিন্তু এই প্রথমবার। [পৃ. ৩৩-৩৫]

রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে আরও দু'একটি তথ্য বা ঘটনার উল্লেখ আছে বইটিতে যা আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। আমরা দেখেছি, লিয়াকত আলী খানের সমালোচনায় মুজিব প্রথম থেকেই ছিলেন যাকে বলে ক্ষমাহীন। পাকিস্তানের পরবর্তী সকল দুর্যোগ-দুর্দশার জন্য তিনি দায়ী করেছেন লিয়াকত আলীকে, তাঁর স্বৈরাচারী মনোভাব ও অগণতান্ত্রিক আচরণকে। জেলে বসে লিয়াকত আলীর নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া : "লিয়াকত আলী খান যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছিলেন সেই ষড়যন্ত্রেই তাঁকে মরতে হল।" [পৃ. ১৯৫] কিন্তু এর পরপরই তিনি আবার লিখছেন,

> ... যদিও তাঁরই হুকুমে এবং নূরুল আমিন সাহেবের মেহেরবানিতে আমরা জেলে আছি, তবুও তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছিলাম। কারণ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। ... রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুলি করে হত্যা করা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর। [পৃ. ১৯৫]

খাজা নাজিমুদ্দিনের দুর্বল ব্যক্তিত্ব, তাঁর সরকারের পাঞ্জাবি আমলাচক্রের কাছে আত্মসমর্পণ ও গণবিরোধী ভূমিকার সমালোচনাও মুজিব বেশ কঠোরভাবেই করেছেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যখন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করে আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে তাঁর জায়গায় বসান, আর নাজিমুদ্দিনের নিজ মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা গভর্নর জেনারেলের সেই স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপের প্রতিবাদ করার পরিবর্তে নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিড়ে যান, তখন, মুজিব লিখেছেন,

> ... এমন অগণতান্ত্রিকভাবে নাজিমুদ্দিন সাহেবকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদ একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগই করেছিল। [পৃ. ২৪২]

এ সবই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা দলীয় স্বার্থ বিবেচনার উর্ধ্বে রাজনীতিতে নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ। আমাদের আজকের রাজনীতিকদের এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

১২

স্থানীয় রাজনীতির দ্বন্দ্ব-বিরোধই অনেক সময় জাতীয় রাজনীতিতে সম্প্রসারিত হয়। আমাদের দেশের বেলায় এটি একটি অতি পুরাতন কিন্তু চলমান বাস্তবতা। মুজিবের আত্মজীবনী পাঠে বোঝা যায়, ওয়াহিদুজ্জামান বা আবদুস সালাম খানের সঙ্গে মুজিবের যে বিরোধ পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে ওঠে, তার সূত্রপাত আসলে বিভাগপূর্ব আমলেই, গোপালগঞ্জ বা ফরিদপুরের মুসলিম লীগ রাজনীতিতে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব থেকে। অনুরূপ আরেকটি বিষয়, রাজনীতিতে পারিবারিক প্রাধান্য বা প্রভাব বজায় রাখার কৌশল প্রসঙ্গে ফরিদপুরের লাল মিয়া-মোহন মিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের উদাহরণ দিয়ে মুজিব লিখেছেন:

> ... লাল মিয়া ও মোহন মিয়া সকল সময়ই ভিন্ন দলে থাকতেন। প্রথমে লাল মিয়া সাহেব কংগ্রেস করতেন, মোহন মিয়া সাহেব মুসলিম লীগ করতেন। আবার মুসলিম লীগে যখন যোগদান করলেন, এক ভাই রইলেন শহীদ সাহেবের দলে, আরেক ভাই খাজা নাজিমুদ্দীনের দলে। আবার পাকিস্তান আমলে আইয়ুবের মার্শাল 'ল আসলে, এক ভাই আইয়ুব খান সাহেবের দলে, আর এক ভাই বিরোধী দলে। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তাদের ক্ষমতা ঠিকই থাকে। এই অপূর্ব খেলা আমরা দেখেছি জীবনভর। রাতেরবেলা দুই ভাই এক, নিজেদের স্বার্থের বেলায় মুহূর্তের মধ্যেই এক হয়ে যান। [পৃ. ৪৫]

আজ স্বাধীন বাংলাদেশেও পারিবারিক প্রাধান্য রক্ষার সেই একই 'ট্রাডিশন' কি আমরা লক্ষ করি না?

১৩

শেখ মুজিবের রবীন্দ্রানুরাগের পরিচয় ও কবিতা মনে রাখার ব্যাপারেও তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পরবর্তীকালে আমরা নানা সময়ে নানা উপলক্ষে পেয়েছি। এই আত্মজীবনীতেও তাঁর সে-প্রতিভার অল্পাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫০-এর দশকের সেই শুরুতেই পশ্চিম-পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদ থেকে সড়ক পথে করাচি যাওয়ার সময় [সোহরাওয়ার্দি গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন] সহযাত্রী কয়েকজন এডভোকেটের অনুরোধে তিনি তাঁদেরকে প্রথমে নজরুলের কয়েকটি কবিতার অংশ বিশেষ এবং তারপর নিজে থেকেই রবীন্দ্রনাথেরও দু-একটা কবিতার কয়েক লাইন আবৃত্তি করে শোনান। [পৃ. ২১৭] একই সফরে লাহোরে কবি ইকবালের বাড়ি জাভেদ মঞ্জিলে থাকার ও কবির মাজার জেয়ারতের সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

> ...কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লামা শুধু কবি ছিলেন না,

> একজন দার্শনিকও ছিলেন। আমি প্রথমে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে গেলাম এবং নিজকে ধন্য মনে করলাম। আল্লামা যেখানে বসে সাধনা করেছেন সেখানে থাকার সুযোগ পেয়েছি! [পৃ. ২১৭]

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, ইকবালের কবি-পরিচয়ের চেয়ে তাঁর 'পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা' পরিচয় অন্তত তখন পর্যন্ত মুজিবের কাছে মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এটাই হল বাস্তবতা, তা আজ সে-বাস্তবতাকে আমরা যেভাবেই ব্যাখ্যা বা উল্টে দেখাতে চাই না কেন!

রাজনীতিচর্চার ব্যস্ততার ফাঁকেও তরুণ বয়স থেকেই মুজিবের সঙ্গীত ও শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন আগ্রায় গিয়ে যখন 'এক একজন এক একটা জায়গা দেখতে চায়', তখন তিনি ছুটেছেন তানসেনের বাড়ি দেখতে। [পৃ. ৬০] সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল তার নিরাভরণ সৌন্দর্যের জন্য। আব্বাসউদ্দিনের গান শোনার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে মুজিব লিখেছেন,

> ... নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গান গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। ... আমি আব্বাসউদ্দিনের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। [পৃ.১১১]

প্রসঙ্গত আব্বাসউদ্দিনের মতো একজন গুণী লোককেও পাকিস্তানে সরকারি প্রচার দপ্তরে চাকরি করে জীবিকা নির্ভর করতে হয়, এটাকে তাঁর 'দুঃখের বিষয়' বলে মনে হয়েছে। [পৃ. ১১১] আব্বাসউদ্দিন যে তাঁকে বাংলাভাষা-বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সেকথা জানিয়ে লিখেছেন, "তিনি [আব্বাসউদ্দিন — মোশহা] আমাকে বলেছিলেন, 'মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালোবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।" [পৃ. ১১১] মুজিবের মন্তব্য : "আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।" [পৃ. ১১১]

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সে-প্রচেষ্টায় মুজিব কোন পর্যায়ে কী ভূমিকা রেখেছিলেন, তা কি প্রত্যক্ষ না কি পরোক্ষ ছিল, অন্যান্য ভাষা-সংগ্রামীদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর সে-অবদানের গুরুত্ব কতটুকু, কিংবা ওই সময়ে তাঁর কতটা কী করার সুযোগ ছিল, এ ব্যাপারে তাঁর কোন্ জীবনীকার বা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস-রচয়িতা কী লিখেছেন, সে-সব বিতর্ককে কার্যত অবান্তরই মনে হয়, যদি তরুণ বয়স থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মুজিবের ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার কথাটা আমরা মনে রাখি। আজীবন তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও সে-রকম কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আইনসভায় বা বেইজিং শান্তি সম্মেলনে তাঁর বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার উদাহরণ বাদ দিলেও, জানা যায় বিভাগপূর্ব আমলেই তিনি যখন মুসলিম ছাত্রলীগের একজন প্রথম সারির কর্মী, তাঁর নেতৃত্বে বাঙলার ছাত্রকর্মীরা দিল্লি স্টেশনে নেমে বাংলায় স্লোগান দিতে দিতে লীগের কনভেনশনে উপস্থিত হন। শুধু তাই নয়, সভা চলাকালীন জিন্নাহর উপস্থিতিতে যখন উর্দু স্লোগান উঠত, তখন তাঁরা বাংলা স্লোগান শুরু করতেন। [পৃ. ৫১-৫২]

শেখ মুজিবের এই আত্মজীবনীটি 'অসমাপ্ত' এই অর্থে যে এতে লেখক তাঁর ৫৫ বছরের জীবনকালের প্রথম ৩৫ বছরের [১৯৫৫ সাল পর্যন্ত] অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হিসাবে যা অর্ধেক মাত্র। বইটি রচনার সময় পর্যন্ত তিনি 'জাতির পিতা' বা 'বঙ্গবন্ধু' কোনোটাই হননি। 'শেখ সাহেব' এই নামেই তিনি তখন দেশের ব্যাপক মানুষের ভালোবাসার পাত্র। আর জীবনের যে-পর্বের কথা তিনি এখানে লিখেছেন সে-পর্বে শত্রুমিত্র সকলের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'মুজিবর' নামে। একইভাবে উত্তরজীবনের বা তার কোনো অংশের ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ তিনি কোথাও কোনোভাবে [লিখিত বা মৌখিক] করে যেতে পেরেছেন কি না, এবং করলেও তা উদ্ধারের দূরতম কোনো সম্ভাবনা আজ আর আছে কি না, আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে নানা সূত্রে কিছু তথ্য বা দাবির কথা বিভিন্ন সময় শোনা গেলেও, সে-সবের সত্যতা যাচাইয়ের কোনো সুযোগ আমাদের নেই। এই বইয়ের ভূমিকা থেকেও আমরা সে-সম্পর্কে কোনো সুলুক-সন্ধান পাই না। তবে ভূমিকায় উল্লিখিত মুজিবের 'স্মৃতিকথা, ডায়েরি ও [চীন] ভ্রমণকাহিনী' শিগগিরই আলাদাভাবে প্রকাশিত হবে এমন আশা আমরা করতে পারি। বর্তমান বইটির মতো সেগুলোও মুজিবের স্তাবক ও নিন্দুক উভয় পক্ষের জন্য কমবেশি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে তার গুরুত্বের কথা বাদ দিলেও, সে-ইতিহাসের অন্তত একটি বিশেষ পর্ব সম্পর্কে কিছু সন্দেহ-সংশয়, বিতর্ক-বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে তা যে সহায়ক হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাসান শফি : জন্ম ২১ মার্চ ১৯৫৩। পেশা : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *ইসলাম ও মৌলবাদ* (১৯৮৯), *পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে* (১৯৯০); *সময়ের মুখোমুখি* (১৯৯০), *রাজনীতিহীনতার রাজনীতি* (২০১১), *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (২০০৮), *স্রোতের বাইরে* (২০১১), *মাঝরাতের টকশো বিশ্বব্যাংক ড. ইউনূস* প্রভৃতি (২০১৩) [প্রবন্ধ] *আমাজন অরণ্যের বীর : চিকো মেন্দেস* (২০০৮) [জীবনী]

বইটির প্রাপ্তি উৎস : ইউপিএল, ৯৫৬৫৪৪১, ৯৫৬৫৪৪৪ ই-মেইল: upl@banglanet upl@btcl.net.bd

লুৎফর রহমান রিটনের স্মৃতিগদ্য

ইফতেখারুল ইসলাম

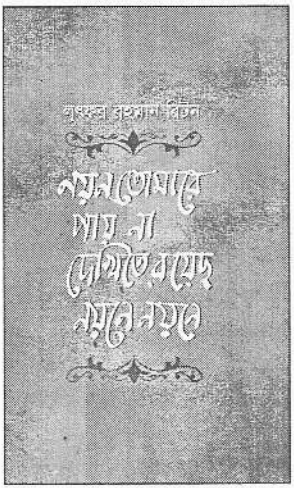

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে
লুৎফর রহমান রিটন
চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৩
১৬৮ পৃষ্ঠা
৬০০ টাকা

সার্থক কবির হাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গদ্যও সজীব হয়ে ওঠে। আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি, শিশু-সাহিত্যিক, ও ছড়াকারদের লেখা গদ্য, বিশেষত কল্পনা-গৌণ গদ্য, পরিমাণে অল্প। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

লুৎফর রহমান রিটন আমাদের অন্যতম প্রধান ছড়াকার। কিন্তু তিনি তাঁর সাহিত্য-কর্মের সূচনা থেকেই ছড়ার পাশাপাশি গদ্য লিখেছেন বিস্তর। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা গল্প ও অন্যান্য রচনার ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর গদ্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছেন। তা সত্ত্বেও ছড়াকার হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা, গদ্যলেখক হিসেবে তা নয়। তাঁর সাম্প্রতিককালের গদ্য-রচনা অনেক বেশি পরিণত এবং সংহত। শব্দ-নির্বাচনে যেমন তিনি সতর্ক ও শাণিত, তেমনি বাক্যগঠন এবং ভাষার ক্ষেত্রে কুশলী। যখন তিনি কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা লেখেন, বর্ণনা করেন নানা ঘটনার স্মৃতি, অল্প কথায় তুলে ধরেন সেই ব্যক্তির সামগ্রিক অবদান ও গুরুত্ব তখন প্রতিটি রচনায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ওঠা-নামা করে তাঁর কণ্ঠস্বর। কখনো তিনি পরিহাসপ্রিয় ও লঘু; কখনো

বিনম্র ও বিনীত; কখনো কঠিন, কার্য-কারণ-যৌক্তিকতা সন্ধানী ও সিদ্ধান্ত-মুখী।

রিটনের সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টজনদের দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পর্ক আছে। লেখার সূত্র ধরে এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের শুরু এবং বিকাশ। পরবর্তীকালে বহুমাত্রিক পেশা এবং সম্পাদক ও উপস্থাপক হিসেবে গণমাধ্যমের সঙ্গে দীর্ঘ সংশ্লিষ্টতার কারণে এই সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। সেই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা নিয়ে রিটন লিখে চলেছেন নানা ধরনের স্মৃতিকথা। আর এসব রচনায় একজন লেখক, শিল্পী, সাহিত্য-কর্মী অথবা রাজনীতিকের পেশাজীবন; সেই সময়ের অন্য বিশিষ্ট মানুষের আংশিক পরিচয়; এবং সমসাময়িককালের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা চিত্র উঠে আসে। এগুলো শুধু উৎসুক পাঠকের উন্নত বিনোদনের উপকরণ নয়। এগুলো আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। এমন কিছু রচনা নিয়ে রিটনের স্মৃতিগদ্য সংকলন *নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে*।

স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার বা এ ধরনের রচনার সংকলন নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রিটনের গ্রন্থের রচনাগুলো স্মৃতিকথা বা সাক্ষাৎকার থেকে আলাদা। ঊনত্রিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা এই স্মৃতিগদ্য সংকলনের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এখানে লেখক যাঁদের কথা বলেছেন তাঁরা সকলেই প্রয়াত। আর লেখকের অন্তরে, গভীর কোনো স্থানে এঁদের প্রত্যেকের জন্য একটা জায়গা রয়েছে। 'নিবেদন' শিরোনামে বইটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন:

> ...আমার শৈশব কৈশোরকে রাঙিয়ে দেওয়া মানুষেরা একে একে চলে গেছেন। যাবার আগে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন তাঁদের অনুপম সান্নিধ্যের সুবাসমাখা গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতির পালক। স্মৃতি হাতড়ে আমি সেইসব মানুষের প্রসন্ন ছবি স্মরণে আনতে সচেষ্ট হই। আর তখনই রচিত হয় একেকটি স্মৃতিগদ্য। সেইসব দীপান্বিত মানুষ আমাকে ঋণী করে গেছেন তাঁদের মেধার বর্ণিল বৈভব আর সাহচর্যের আশ্চর্যসুন্দর মাধুরী দিয়ে। গ্রন্থভুক্ত স্মৃতিগদ্যসমূহ তাঁদের ঋণ স্বীকারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।
>
> [পৃ. ৮]

তাঁরা কেমন ব্যক্তি, যাঁদের নিয়ে একজন সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব বলতে পারেন, 'রয়েছ নয়নে নয়নে'? এই তালিকায় যেমন রয়েছেন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় জননেতা, জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বদানকারী মানুষ; সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত ও অন্যান্য ক্ষেত্রের দিশারী; তেমনি আছেন সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খ্যাতিমান ব্যক্তি। যেমন রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তেমনি আছেন শহীদ-জননী জাহানারা ইমাম, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, হুমায়ুন আহমেদ, হুমায়ুন আজাদ, চার্লি চ্যাপলিন, সুভাষ দত্ত, এম আর আখতার মুকুল, শাহাদাত চৌধুরী, নিলুফার ইয়াসমীন এবং আরো অনেকে।

একটি বইতে এতজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে লেখকের স্মৃতি গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। রিটনের ভাষায় তাঁরা তাঁর জীবনকে 'দীপান্বিত' করেছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বেছে নেওয়া এই মানুষদের অবদানসমূহ ঠিকভাবে চিহ্নিত করা, সমাজে তাঁদের প্রত্যেকের মূল ভূমিকাটি অল্প কথায় তুলে ধরা সহজ কাজ নয়। আমাদের দেশে গণমাধ্যমে এবং অন্যান্য

রচনায় নানারকম বিশেষণ ও চারুবাক্য প্রয়োগে অনেক সময় চেনা মানুষকেও অচেনা করে তোলা হয়। এঁদের প্রকৃত অবদান ও তার মূল্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কিছু বিশেষণ। লেখক এ ব্যাপারে সতর্ক থেকেছেন। বেশিরভাগ রচনায় আমরা রিটনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বিবরণ পাই। এর বাইরে স্মরণীয় মানুষটির সবচেয়ে বড় এবং সর্বজনীন অবদানটুকুর আলোচনা তিনি সেরে দিয়েছেন অল্প কথায়। খুঁজে নিয়েছেন সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ, যা একজন ব্যক্তির গুরুত্ব বুঝতে সহায়তা করবে। জাহানারা ইমামকে তিনি 'প্রিয় খালাম্মা' বলে সম্বোধন করেছেন, তারপরেই তাঁকে বলেছেন 'সর্বজননী'। রোকনুজ্জামান খান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'মাথার ওপরে ছায়া'। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন, 'শিশুর মতো সরল, আপাদমস্তক কবি'। আফলাতুন সম্পর্কে লিখেছেন, শিশুসাহিত্যের পাঠক-লেখকদের মনন ও রুচির বিকাশে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার কথা। সুফিয়া কামাল সম্পর্কে লিখেছেন, জাতির বিবেকের যথার্থ প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি দীপ্যমান ছিলেন।

এই গ্রন্থের বেশিরভাগ রচনা ইতিপূর্বে দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকার সুনির্দিষ্ট পরিসর অনেক সময় লেখকের স্মৃতি-বিবরণ ও অন্যান্য বক্তব্যের বিস্তারকে সীমিত করে দেয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সেগুলোর পরিবর্ধন ও পরিমার্জন প্রয়োজন হলেও অনেক সময় সেটা করা হয় না। সাম্প্রতিককালের বহু প্রবন্ধ ও রচনা-সংকলনে এই সীমাবদ্ধতা পাঠকের অতৃপ্তির কারণ হয়। এদিক থেকে এই সংকলন অনেকটা আলাদা। রচনাগুলোর দৈর্ঘ্যে বিভিন্নতা আছে। নির্দিষ্টভাবে বললে অধিকাংশ রচনা চার থেকে সাত পৃষ্ঠা। বেশিরভাগ রচনায় লেখক যাঁদের নিয়ে যেটুকু বলতে চেয়েছেন, সান্নিধ্যের স্মৃতি অথবা আলোচিত মানুষটির মেধার দীপ্তি যতখানি তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা পরিপূর্ণরূপেই পৌঁছেছে পাঠকের কাছে। একটি মাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে মিনার মাহমুদ সম্পর্কিত রচনাটিতে। আশির দশকের অস্থির সময়ের স্মৃতিচারণ থেকে শুরু করে মিনারের জীবনের নানা বৈপরীত্য, উত্থান-অবরোহন, প্রবাস-জীবন এবং সবশেষে ঢাকায় তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব। এর সঙ্গে তাঁর সাফল্য ও অসাফল্যের খতিয়ান—সব মিলিয়ে এগারো পৃষ্ঠার বেশি। আমাদের দেশে আশির দশকের শেষ অংশের রাজনৈতিক উত্থান, আর খর্বিত স্বাধীনতার ভেতর থেকেও নবীন প্রজন্মের নেতৃত্বে গণমাধ্যম কীভাবে সেই উত্থানকে ধারণ করেছিল এসবের সঙ্গে যাঁদের কিছুটা সম্পৃক্ততা আছে তাঁদের জন্য রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ।

মিনার মাহমুদ সম্পর্কে রিটনের মূল্যায়ন সর্বজনগ্রাহ্য কিনা সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু বইয়ের অন্যান্য রচনার তুলনায় এই লেখাটির দৈর্ঘ্য কোনো কোনো পাঠকের কাছে একটু বেশি মনে হতে পারে। একজন মানুষের বন্ধুত্ব অথবা সাহচর্যের স্মৃতি লেখকের আবেগানুভূতির ওপর তৈরি করে তীব্র অভিঘাত। কিন্তু সেই স্মৃতিকথা একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলে অন্যান্য রচনার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান করাটা জরুরি। আরো দু-একজন সম্পর্কে রিটনের নাতিদীর্ঘ স্মৃতিগদ্য এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা যথাযথ হয়েছে কি না সেটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তালিকায় এমনকিছু মানুষ আছেন, ব্যাপক পরিচিতি না থাকলেও যাঁদের সামগ্রিক অবদান অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের নিয়ে লেখা আরো দীর্ঘ হতে পারতো। এ ছাড়া রোকনুজ্জামান খান, সুফিয়া কামাল অথবা আফলাতুন সম্পর্কে তিনি

নিশ্চয়ই লিখতে পারতেন পূর্ণাঙ্গ, মূল্যায়নধর্মী ও দীর্ঘ রচনা।

সংকলনে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে লেখকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে বই প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনার কাজটি যথাযথভাবে করা হলে এ বিষয়ে অন্যদের মতামত বিবেচনা ও গ্রহণের সুযোগ থাকে। অবশ্য লেখক তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, এই রচনাগুলো বিশিষ্টজনদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকারের অংশ। কারো জীবন ও কর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ন এখানে প্রত্যাশা করা অনুচিত হবে। অর্থাৎ এটা এক ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এই বইতে যাঁদের রিটন শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতি-সম্পৃক্ত ঘটনায় লেখক নিজে ছাড়াও অনেক সময় উপস্থিত ছিলেন কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক অথবা গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব।

লুৎফর রহমান রিটন

> ছড়াকার হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা, গদ্যলেখক হিসেবে তা নয়। তাঁর ...গদ্য-রচনা অনেক বেশি পরিণত এবং সংহত। শব্দ-নির্বাচনে ...সতর্ক ও শাণিত, তেমনি বাক্যগঠন এবং ভাষার ক্ষেত্রে কুশলী। ... কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা লেখেন, বর্ণনা করেন নানা ঘটনার স্মৃতি, ...তুলে ধরেন সেই ব্যক্তির সামগ্রিক অবদান ও গুরুত্ব তখন প্রতিটি রচনায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ওঠা-নামা করে তাঁর কণ্ঠস্বর।

তাঁরাও আমাদের অনেকেরই অতি পরিচিত। লেখকের বর্ণনায় তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি, তাঁদের নিয়ে ছোট ছোট কাহিনী ও মন্তব্য, ইত্যাদি মূল ঘটনার প্রেক্ষাপটটি বুঝতে সাহায্য করে। আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে লেখকের স্মৃতিকথন।

রিটন যথাযথ শব্দ-নির্বাচন, অপ্রচলিত সন্ধির ব্যবহার এবং সাবলীল বাক্যগঠন এত স্বতস্ফূর্তভাবে করেন যে তা অধিকাংশ পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, বড় লেখকের একটি বৈশিষ্ট্য ভাষা বিষয়ে তাঁর সতর্কতা ও পরিশ্রম পাঠকের চোখে পড়ে না। পাঠক দেখেন শুধু অনায়াসে তৈরি সহজ গদ্যের প্রবহমানতা।

চন্দ্রাবতী একাডেমি রিটনের এই স্মৃতিগদ্য সংকলনগ্রন্থটি যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। প্রচ্ছদ, অঙ্গ-সৌষ্ঠব, মুদ্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নের চিহ্ন সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এত যত্নে প্রকাশিত কোনো বইয়ের সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধনের কাজটি আরো মনোযোগের সঙ্গে ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ছাপার ভুলকে আমরা মুদ্রণ-প্রমাদ বলি, কখনো কখনো তা অগ্রহণযোগ্য। দাদাভাইয়ের স্থলে 'দাদাভাইরে' অথবা কবি সুফিয়া কামালের স্থলে 'কমালের' ছাপা হলে ওগুলোকে পাঠক

শুধু ভুল হিসেবেই উপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে রিটনের 'ছোটদের কাগজ' পত্রিকার সম্পাদক হওয়া '১৯৬৯' ছাপা হলে ভয় হয়। নবীন পাঠক অসতর্ক হয়ে সেটাকেই সঠিক বলে ধরে নিতে পারে। ওই একই রচনায় বছরের হিসেবে একটা গোলযোগ আছে যেটা সতর্ক পাঠককে দেখিয়ে দেয় পাণ্ডুলিপি বা বইয়ের পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা কতটা জরুরি।

> ... ১৯৯৮ সালের ২৫ অক্টোবর সকালে ঢাকার শান্তিনগরে হোয়াইট হাউসে আপনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম যখন, খ্যাতিমান আলোকচিত্রী বন্ধু নাসির আলী মামুন আমাদের কয়েকটা ছবি তুলেছিলেন। বারো বছর পর, আজ ২০১২ সালের আরেক অক্টোবরে, অক্টোবরের ২৩ তারিখে, আপনার চলে যাবার সংবাদে প্রিয়জন হারানোর বেদনায় বিষণ্ন বিপন্ন আমি স্মৃতির আলবাম খুলে সেই ছবিটাই দেখছি বারবার। সুনীলদা, আপনিও কিনা ছবির মানুষ হয়ে গেলেন!
>
> [পৃ. ১৪৯]

এই গদ্যে মোহাবিষ্ট হয়ে থাকি। কিন্তু অতি সামান্য অসঙ্গতি আমাদের মনোযোগ সরিয়ে দেয় অন্য দিকে। সহজ হিসেবে যা চৌদ্দ বছর তাকে বারো বলাটা হয়তো তুচ্ছ একটা ভুল। কিন্তু সেটা কাঁটার মতো লেগে থাকে।

বিশিষ্ট মানুষের মৃত্যুর পর সমাজে বেঁচে থাকে তাঁদের রেখে যাওয়া কাজ, ছবি, লেখা, চলচ্চিত্র। কিন্তু সেই মানুষটির স্মৃতি ক্রমশ ধূসর হয়ে আসে। রিটনের এই স্মৃতিগদ্য সংকলনের প্রধান সার্থকতা এইখানে যে আমরা এতে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সচল ও প্রাণবন্ত ছবি দেখতে পাই। *নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে* বইটির অনেকগুলো লেখা এক নাগাড়ে পড়ে শেষ করার পর এক ধরনের বিষাদ অনুভব করি। মনে হয় অল্প কয়েক বছরে অনেক প্রিয় মানুষ হারিয়েছি আমরা। এরকম রচনা যেন রিটনকে কম লিখতে হয়। এরকম আরেকটা সংকলন প্রকাশ করতে যেন আমাদের অপেক্ষা করতে হয় বহু বছর।

ইফতেখারুল ইসলাম : জন্ম ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫–। প্রবন্ধিক-সমালোচক, পেশা: শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তা, প্রকাশিত গ্রন্থ : *এই আকাশে আমার মুক্তি* (২০১৪) [স্মৃতিকথা]

বইটির প্রাপ্তি উৎস: চন্দ্রাবতী একাডেমী, ২/২ সি (চতুর্থ তলা)
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন : ৯৫১৫৬৮৮

নার্গিস : একটি পুষ্পের বিস্তার

মহীবুল আজিজ

নার্গিস
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১৪
১১২ পৃষ্ঠা
২০০ টাকা

সফল প্রেম বড়, না ব্যর্থ প্রেম বড়— তা নিয়ে বিতর্ক চালানো যায়, কিন্তু প্রেম বিষয়টা নিয়ে নিশ্চয়ই তর্ক চলে না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তো বলাই হয়েছে, মিলন নয় বিরহেই প্রেমের উপলব্ধি। সে-অর্থে বিরহও প্রেম-ই। আর মিলনকে তখন বলা যাবে প্রেমেরই একটা পরিণতি। আপাতদৃষ্টে আমরা যাকে ব্যর্থ প্রেম বলে চিহ্নিত করি বা সমঝদার লোকেরা করেন তারাও অভাবিত বিস্ময়ে লক্ষ করেন, ব্যর্থতা বলে প্রতীয়মান মরা মাটি সদৃশ সমাহিতির গর্ভ থেকে উদ্গত হয়েছে অগ্নি। সেই উদগীরণকে কারও পক্ষেই ব্যর্থ প্রেমের আগুন বলা সম্ভব হয় না। কারণ আগুন সর্বদাই উদ্ভাসনের, জ্বলে ওঠার কাহিনী। উল্টো পক্ষে ব্যর্থতা বা প্রেম-ব্যর্থতা নিভন্ত অবস্থানের স্মারক।

এসব কথা কবি নজরুলকে সামনে রেখে বা নার্গিসকে সামনে রেখে বা নজরুলের নার্গিসকে সামনে রেখে এবং সর্বোপরি বিশ্বজিৎ চৌধুরীর *নার্গিস*-কে সামনে রেখে ভাবলে সে-ভাবনাকে অবান্তর বলা যাবে না। বরং না ভাবাটাই হবে অস্বাভাবিক। প্রসঙ্গত এটা একটু আগে থেকেই যদি মনে রাখা যায়, কবিকে বা রচয়িতাকে তার সৃষ্টির অতিরেক জীবনচরিতে অন্বেষণের ব্যাপারটা।

অনেকেই কবিকে তাঁর জীবনচরিতে না-খোঁজার পক্ষে অবস্থান নেন। যদি তাকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীর অনেক সাহিত্যই উদ্ভট ও অর্থহীন বলে ঠেকতে পারে। জীবনচরিতে না খুঁজলে অস্কার ওয়াইল্ড, সুইনবার্ন, এ. ই. হাইজম্যান, মোজেস জ্যাকসন, ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড, ঈভলিন ওঅ এরকম অনেকের রচনাই পারম্পর্যহীনতার দৃষ্টান্ত বলে মনে হবে। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও তাঁর জীবনচরিতের অনিবার্য সংযুক্ততাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কেন উত্তর-ভারতের কোনো এক বিগতা রমণীর বোনের ছেলের নাম রবীন্দ্রনাথ হবে তা আমরা গায়ে না-ও মাখতে পারি কিন্তু সেই রমণীর নাম যদি হয় আন্না তড়খড় তাহলে মুহূর্তের জন্যে নিশ্চয়ই আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠ স্থগিত রেখে শেল্‌ফ্‌ থেকে নামিয়ে আনতে পারি প্রভাতকুমার বা প্রশান্তকুমারের রবীন্দ্রজীবনী। দেখবো বিলেত যাবার আগে আন্নার আতিথ্য নেওয়া রবীন্দ্রনাথের জন্যে আন্না হয়ে উঠেছেন তাঁর গৃহে চিরকালের অতিথি বা রবীন্দ্রনাথ আন্না'র গৃহে একইভাবে। নজরুলের রচনা পড়তে গিয়েও একইভাবে আমরা তাঁর প্রেমিক সত্তার অভূতপূর্ব স্ফূর্তিতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যদি ক্ষণকালের জন্যে ভাবি যে, এমন প্রাণোন্মাদনা কি বাস্তবের শেকড়বিহীনতায় সম্ভব! সেই ভাবনা আমাদের কোনো না কোনোভাবে কবির জীবনচরিতের আয়তনে নিয়ে গেলে আমরা দেখবো স্বয়ং কবি বলছেন, "তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি *অগ্নিবীণা* বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতু'র বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না; শুধু কি তাই—"আমার *চক্রবাক* নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে।"—একথা স্বয়ং রচয়িতার। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, উক্ত কাব্যগ্রন্থগ্রলো সম্পর্কে কবির বক্তব্য (যে-বক্তব্যে কবির নিজেরই ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।) তাঁর কবিতার শিল্পমূল্য-বিচারে কী ভূমিকা রাখতে পারে? হয়তো সেটা তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু যা তর্কাতীত, কবির জীবনীকে সরাসরি পাশ-কাটানো মুশকিল।

বিশ্বজিৎ চৌধুরীর *নার্গিস* উপন্যাসটি পাঠ করবার কালে কয়েকটি বিবেচনা আমাদের চেতনাগ্রাহ্য হয়ে পড়ে। উপন্যাসটি সেই পাঠকেরা পাঠ করতে পারেন যাঁরা নজরুলের কবিতা এবং জীবনী উভয় বিষয়েই ওয়াকিবহাল। এর পাঠক হতে পারেন তাঁরাও যাঁরা নজরুলের কবিতা পড়েছেন কিন্তু তাঁর জীবনী সম্পর্কে ততটা অবগত নন। শেষ বিবেচনাটি খানিকটা কৌতূহলপ্রসূতই—ধরা যাক এমন পাঠকের হাতে বিশ্বজিতের উপন্যাসটি গেল যাঁরা নজরুলের কবিতাও পড়েন নি এবং তাঁর জীবনী সম্পর্কেও কিছুই জানেন না। আমি আসলে বিশ্বজিৎ চৌধুরীর উপন্যাসটির আবশ্যকতার দিকটি সম্পর্কেই বলতে চাইছি। যে কোনো বিচারেই বলা যাক না কেন, প্রথমত *নার্গিস* বাংলা সাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক শূন্যতা পূরণ করেছে, এবং দ্বিতীয়ত নজরুলের জীবনকাহিনীতে যে-নার্গিস ছিল কেবলমাত্র তথ্য ও সূত্রাদির উপাদানে বন্দী বিশ্বজিৎ চৌধুরীর উপন্যাসে সে-নার্গিস হয়ে উঠেছে রক্ত-মাংস ও লাবণ্যে পরিপূর্ণ একটি সত্তা, একটি চরিত্র; এবং আমরা সকলেই জানি সত্তা মানেই স্বাধীন অস্তিত্ব, যদিও সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভূ তাকে সর্বদা বলা যায় না। চরিত্র যেহেতু, তার প্রসঙ্গে পরিবার, সমাজ, ধর্ম, লোকাচার এবং সর্বোপরি সমকাল একটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে। এসব কিছুর সম্মিলনেই আমরা উপন্যাসটি পাঠ করতে চাই।

২

জানা তথ্য অনুযায়ী নজরুলের জীবনে প্রথম প্রেম কুমিল্লা জেলার (তৎকালীন ত্রিপুরা) দৌলতপুরের সৈয়দা আসার খানম নার্গিস। এটিকে ব্যর্থ প্রেম, না ব্যর্থ সম্পর্ক বলা হবে সেটা বিচারসাপেক্ষ। ব্যর্থ প্রেম বললে নজরুলের *অগ্নিবীণা*, *ধূমকেতু*, *চক্রবাক*, *ছায়ানট* প্রভৃতি কাব্যের অপরূপ নান্দনিকতাকে অবহেলা করা হয়। কারণ প্রেম বা প্রেমবোধই সেসব কাব্যের নির্যাস। নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিবাহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, হয়ে তা কবির জীবনে একটি চিরস্থায়ী ক্ষতের মত থেকে যায়। পরে, সেই ক্ষত থেকে উৎসারিত হয় অপার ও বর্ণিল সৌন্দর্যময়তা। নজরুল-জীবনীকার নানা মুনি নানা ভাবে নজরুল-নার্গিস অধ্যায়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাও হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছেন নার্গিসের মামা আলী আকবর খানের ওপর, কেউ স্বয়ং নজরুলের ওপরেও। কারণ নজরুল দৌলতপুরেরই আরেক নারী আশালতা বা দুলি ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, এবং পরে তাঁকেই গ্রহণ করেন জীবনসঙ্গিনীরূপে। কেউ আবার আশালতার পরিবারের লোকজনদেরও নজরুল-নার্গিস অধ্যায়ে বৈরীভাবাপন্ন প্রতিপক্ষ বলে মনে করেন। পরিণতি না পেলেও নজরুলের জীবনে এবং তাঁর কাব্যে নার্গিসের বিপুল প্রভাবের ফলে নার্গিস-পর্ব কবি কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে অনিবার্য বলে পরিগণিত হয়।

প্রথমেই *নার্গিস*-রচয়িতা বিশ্বজিৎ চৌধুরীর সীমাবদ্ধতার দিকটি উত্থাপন করা যাক। বাস্তব ঘটনার প্রায় শতাব্দীকাল (৯০ বছরের কিছু অধিক) পরে, অর্থাৎ কালগত একটা বিপুল দূরত্বে এসে তাঁর উপন্যাসের সূত্রপাত। দ্বিতীয়ত, নজরুল-জীবনীর কিছু ঐতিহাসিক উপাদান ছাড়া তাঁর অবলম্বন বলতে গেলে আর কিছুই না। অথচ দীর্ঘকাল ঐতিহাসিক-বিস্মৃতির আড়ালে প্রায় অপস্রিয়মাণ নার্গিসকে তিনি গড়ে তুলতে চান একটি পূর্ণাবয়ব সত্তারূপে। জীবনীকারেরা নার্গিসকে দেখেছেন নজরুলের পরিপূরক হিসেবে। কিন্তু নার্গিস-ও যে একটি স্বতন্ত্র ও প্রাণস্পন্দিত সত্তা সে-বিষয়টি কারও চোখে পড়ে নি, এতটা কাল। নার্গিস যে নজরুল নয়, তাঁর নিজের নার্গিসত্ব দিয়েই নিজেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশের স্তরপরম্পরায় একটি পৃথক অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তা সকলের অগোচরে থেকে যায়। নার্গিসের সে-অবস্থানটি নজরুল-স্পৃষ্ট হয়েও নজরুল-মুক্ত। নার্গিসকে নজরুলের জীবনীর প্রচলিত আঙ্গিকে দেখবার ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বজিৎ চৌধুরী একটি নতুন পথ রচনার চেষ্টা করলেন। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে নার্গিস-প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ বা ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ ঔপন্যাসিকের অবলম্বন হতে পারে নি। সেরকম প্রামাণ্য গ্রন্থ বাস্তবে হয়ও নি। নার্গিস-বিষয়ে ঔপন্যাসিকের আশ্রয় শেষ পর্যন্ত নজরুল-ই। সেই সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ঐতিহাসিক নার্গিসকে কেন্দ্র করে বিশ্বজিৎ একদিকে এমন উপন্যাস লিখেছেন যাকে কোনোভাবেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাবে না, আবার অন্য দিকে ঐতিহাসিক নার্গিসের দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক অভাবটাকেও পূরণ করতে হয় তাঁকে-ই, উপন্যাসটির মাধ্যমে।

উপন্যাসটির নামকরণ একমাত্র 'নার্গিস' হওয়াই প্রত্যাশিত, হয়েছেও তাই। যে-নার্গিস

নজরুলের মত এমন জগদ্বিখ্যাত মানুষকে তার মানবত্ব দিয়ে নাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তাকে অবমূল্যায়ন করা অসঙ্গত। বিশ্বজিৎ সেই নার্গিস-সত্তার স্বরূপটিকে আবিষ্কার করেছেন তাঁর কাব্যিকতার বোধ এবং তাঁর কল্পনার আশ্রয়ে। জীবনীকারেরা নজরুলের নার্গিসকে একটি গ্রাম্য, খানিকটা লেখাপড়া জানা সাধারণ নারীরূপে এঁকে গেছেন। নজরুলের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের সঙ্গে-সঙ্গেই নার্গিসেরও সমাপ্তি ঘটে। তাই বলা চলে জীবনীকারদের নার্গিসের যেখানে শেষ বিশ্বজিৎ চৌধুরীর নার্গিসের সেখানে শুরু। সেই শুরুটাকে যথার্থ পরিসমাপ্তি দেবার জন্যে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ দৌলতপুরকে করে তোলেন স্পন্দমান। আমরা দেখতে পাই পরাধীন ভারতবর্ষের একটি অজপাড়াগাঁ

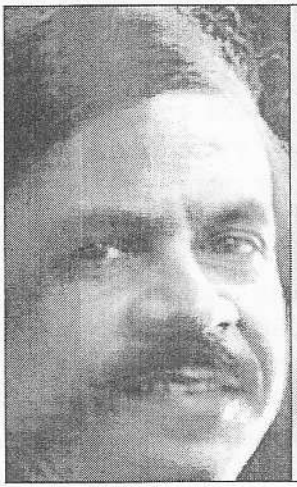

... নার্গিস ঐতিহাসিক এবং নার্গিস সামাজিক। ইতিহাসের দায় মিটিয়ে তার সামাজিক সত্তার আঙ্গিক ঠিক রেখে তাকে পূর্ণ বিকশিত রূপ দিয়ে সমাপ্তিতে আনা – এসব কাজ শিল্পের নন্দনতত্ত্বের বিচারে দুরূহ। সেই দুরূহ পথ পাড়ি দিতে হয় নার্গিস এবং বিশ্বজিৎ চৌধুরী উভয়কেই। নার্গিস যে পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে, উঠে আজিজুল হাকিমকে তার জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় করে তোলে, তার সেই প্রয়োজনীয়তার কার্যকারণ ইতিহাসে অনুপস্থিত, উপন্যাসে সেটি বর্তমান।

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

কেমন জীবনচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে। চঞ্চল হয়ে তা মানুষ, পরিবার, সমাজ এবং সমকালকেও আন্দোলিত করে। এসবের ভেতর দিয়ে আমরা নার্গিসের প্রকৃত নার্গিস হয়ে ওঠা প্রত্যক্ষ করি। কী করে পিতৃহারা-অসহায়-পরাশ্রিত একটি নারী ঘটনাচক্রে হয়ে ওঠে নজরুলের নার্গিস, নজরুল-বিহীন নার্গিস এবং শেষতক নার্গিসময় নার্গিস। এতকাল নার্গিসের মনোজাগতিক উন্মোচন ছিল উপেক্ষিত। এটা সত্য, সেই উন্মোচনের কাজটা ঐতিহাসিকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। একমাত্র কল্পনাশ্রয়ী সৃজনশীলতা দিয়েই সম্ভব সেই নির্মাণ। ভাবতে অবাক লাগে এত দীর্ঘকাল সেটি কোনো সৃজনশীল রচয়িতার নজরে পড়ে নি। হয়তো নজরুলের দিগন্তবিস্তারী প্রভাবের বলয়ে নার্গিসের সত্তা চাপা পড়ে যায় চিরকালের জন্যে। বিশ্বজিৎ চৌধুরীর কৃতিত্ব, ইতিহাসকে বিকৃত না করে অপিচ কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি এমন একটি নার্গিস-পর্ব রচনা করলেন যেটিকে নজরুলের কবিতার জন্যে নয়, নজরুলের জীবনীর জন্যেও নয়, 'নজরুল'-বিষয়টিকে (ফেনোমেনন) বুঝবার জন্যেই প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করতে হবে।

৩

নজরুল-জীবনীকার এবং ঔপন্যাসিক বিশ্বজিৎ চৌধুরী উভয়ের সমন্বিত পরিপ্রেক্ষিতে যেসব চরিত্র ও সীমানা প্রাসঙ্গিকতা প্রাধান্য পায় তা হলো, সৈয়দা আসার খানম নার্গিস ও তাঁর পরিবার, নার্গিসের মামা আলী আকবর খান ও তাঁর পরিবার, আশালতা দুলি ও তাঁর পরিবার, মুজফফর আহমদ এবং দৌলতপুর, কুমিল্লা, ঢাকা ও কলকাতা। এই স্থানগত এবং এই চরিত্রগত প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে লেখা। জীবনীকারের নার্গিসের শুরু ও শেষ একই বিন্দুতে — উপন্যাসের নার্গিসের আছে সূচনা, প্রবাহ ও পরিণতি। শুরুর বাক্য যা একটি প্রশ্ন, নার্গিসের সমগ্র জীবনের দ্বান্দ্বিকতার প্রেক্ষাপটে নজরুল-নার্গিসের সফল ও ব্যর্থ সম্পর্কের জটিলতার ইতিহাস-খাতে অব্যর্থ নিশানার মত নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা সরাসরি ইতিহাসের অবহেলিত নার্গিসকে নিয়ে আসে পাদপ্রদীপের আলোয়। জীবনীতে নজরুলের জীবন-নাটকে ঝড়ের মত প্রবেশ ঘটে নার্গিসের এবং স্বল্পস্থায়ী ঝড়ের মতই প্রস্থানও তার। উপন্যাসে উল্টো ঘটনাও ঘটে — নার্গিসের জীবনেই ঝড়ের মত প্রবেশ ও প্রস্থান নজরুলের। উপন্যাস শুরুর নার্গিসকেন্দ্রিক বাক্যটি পুরো বৃত্তান্তের উন্মোচনে তীব্রতম প্রেক্ষণবিন্দুর কাজ করে। আমরা, বহুকাল পরে, ফ্ল্যাশব্যাকেই পেয়ে যাই সেই নার্গিসকে যাকে ধূমকেতু বলা হলেও গতি সামলে নিলে তার একটি পূর্ণায়ত অবয়বও অবলোকন সম্ভব। বিশ্বজিৎ চৌধুরী সেই কাজটিই করেছেন।

ফলে, উপন্যাসে এমন সব মুহূর্ত আমরা পাই যেগুলোকে বলতে হয় নার্গিস-মুহূর্ত– নার্গিসের একাকিত্ব, অসহায়তা, পরিবার-সমাজ-সমকালের বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়া তার বিকাশ না-হতে পারা অস্তিত্বের শূন্যতা— এসব মুহূর্ত একমাত্র নার্গিসকে ভালভাবে অনুভব করবার জন্যে আত্যন্তিকভাবে প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হয় যে নার্গিস ঐতিহাসিক এবং নার্গিস সামাজিক। ইতিহাসের দায় মিটিয়ে তার সামাজিক সত্তার আঙ্গিক ঠিক রেখে তাকে পূর্ণ বিকশিত রূপ দিয়ে সমাপ্তিতে আনা — এসব কাজ শিল্পের নন্দনতত্ত্বের বিচারে দুরূহ। সেই দুরূহ পথ পাড়ি দিতে হয় নার্গিস এবং বিশ্বজিৎ চৌধুরী উভয়কেই। নার্গিস যে পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে, উঠে আজিজুল হাকিমকে তার জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় করে তোলে, তার সেই প্রয়োজনীয়তার কার্যকারণ ইতিহাসে অনুপস্থিত, উপন্যাসে সেটি বর্তমান। আজিজুল হাকিমের সমান্তরাল সংলগ্নতা নার্গিসকে যেমন আরও বিস্তৃতি দেয় তেমনি তার চরিত্রের ঐতিহাসিক বিমূর্ত শূন্যতা ও অসহায়তাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে আনে অর্থপূর্ণতা। কাজেই প্রয়োজনে নজরুলকে হাতে না রেখেও তৎকালীন একজন নারীর হয়ে ওঠাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, যে কোনো-না-কোনোভাবে তার পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতার ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে নিজেকে একটি সার্থক অবস্থানে নিয়ে আসতে তৎপর। সেক্ষেত্রে আমরা তার বিপরীতে ঐতিহাসিক-নজরুলের কথা ভুলে গিয়ে একজন সাধারণ সামাজিক মানুষকেও ভেবে নিতে পারি, যে হয়তো নজরুল ইসলাম-ই, কবি নজরুল নন।

নজরুলের নার্গিস-অধ্যায় নিয়ে কেন এতকাল উপন্যাসের মত এমন সৃজনশীল রচনা লেখা হয় নি সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু এতটা কাল পরে এসে *নার্গিস*-এর মুখোমুখি হয়ে আমরা দেখলাম একজন কবির হাতেই খুলে গেল বহুকালের সেই রুদ্ধ থাকা ঘরের

দরজাটি। কবির জীবনীর জটিলতার মীমাংসায় কবির হস্তক্ষেপই হয়তো তখন প্রত্যাশিত বলে মনে হয়। বিশ্বজিৎ চৌধুরীও আমাদের প্রত্যাশার সেই বিন্দুতেই দণ্ডায়মান। নার্গিস একটি চমৎকার ফুলের নাম—ইতিহাসে এটি ছিল কুঁড়ি হয়ে, বিশ্বজিৎ চৌধুরীর পরিচর্যায় তা বিকশিত হয়েছে প্রকৃত পুষ্পের মর্যাদায়।

মহীবুল আজিজ : জন্ম ১ মার্চ ১৯৬১। পেশা: বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *সাত্তিয়াগো'র মাছ* (১৯৯৪), *রৌদ্রছায়ার প্রবাস* (১৯৯৭), *হরপ্পার চাকা* (১৯৯৯), *পৃথিবীর সমস্ত সকাল* (২০০১), *নিরানন্দপুর* (২০০২), [কবিতা]; *গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের চাঁদ* (১৯৮৮); *দুষ্কগঞ্জ* (১৯৯৭), *মৎস্যপুরণ* (২০০০) [গল্প]; *বাড়ব* (২০১৪) [উপন্যাস]; হাসান আজিজুল হক: *রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার* (১৯৮৮), *কথাসাহিত্য ও অন্যান্য* (১৯৯৯), *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ* (২০০২), [প্রবন্ধ] *শোশা* (২০০২) [অনুবাদ]।

প্রাপ্তি উৎস: প্রথমা, ফোন: ৮১৮০০৮০০, ০১৭১১৬৪৯৪২২, ০১৫৫২২০৩০৩৬
e-mail:prothoma@prothom.alo.info

পুনশ্চ জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ

জাকির তালুকদার

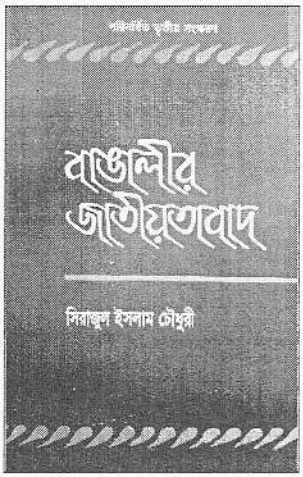

বাঙালির জাতীয়তাবাদ
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: ২০১১
৪৭৮ পৃষ্ঠা
৫০০ টাকা

'বিশ্বায়ন' নামক শব্দমোহের আড়ালে সারাবিশ্বে পুঁজি তার আগ্রাসন চালাচ্ছে। তাই এই নতুন ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রতিপক্ষকেও আন্তর্জাতিক চরিত্রই অর্জন করতে হয়। নব্বই-পূর্ববর্তী সময়কালে এই প্রতিরোধকারী শক্তি ও মতাদর্শের নাম ছিল সমাজতন্ত্র। এখন কিন্তু বিশ্বজুড়ে সংগঠিত সেই প্রতিরোধশক্তি নেই। কোনো শক্তিই নেই। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত দানব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বজুড়ে। কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা দেশের জাতীয়তাবাদ নামক শব্দটি প্রায় অসারতায় আক্রান্ত। আমরা জেনেছি, তত্ত্বগতভাবে এবং প্রায়োগিক উদাহরণ দেখেও, জাতীয়তাবাদের দুইটি রূপ। একটি রূপ হচ্ছে অপর জাতি ও রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণকারী ও নিপীড়নকারী আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ। যেমনটি ছিল হিটলারের জার্মানি বা মুসোলিনির ইতালি; যেমনটি ছিল তাদেরও পূর্বের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড; যেমনটি এখন একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাতীয়তাবাদের অপর ইতিবাচক প্রকাশ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিকামী জনতার ঐক্য সৃষ্টিকারী সংগ্রামী মনোভাব।

শেষোক্ত ধরনের জাতীয়তাবাদ টিকে থাকুক, বিকাশিত হোক—এমনটি কামনা করেন প্রগতিশীল ও শুভবোধসম্পন্ন সকল মানুষ। এছাড়া বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে বস্তুগত-প্রকৃতিগত-ইতিহাসগত কারণেই এর অন্যথা হবার অবকাশ ছিল অসম্ভব। একমাত্র এই প্রতিরোধী-প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদই হতে পারত বাঙালির প্রকৃত রক্ষাকবচ। জাতি-বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করতে পারত এই জাতীয়তাবাদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক সত্য হচ্ছে, বাঙালির জাতীয়-জীবনে এই উপাদান দানা বাঁধতে পারেনি। হাজার বছরের বাঙালি (কারো কারো মতে দুই হাজার বছর) এখনো নিঃসংশয় হতে পারেনি নিজ জাতিসত্তার ব্যাপারে। কেন পারেনি, কোন কোন অন্ধ-চোরাবালিতে পথ হারিয়েছে এই জাতীয়তাবাদ, তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। এই সম্পর্কিত একটি মূল্যবান সংযোজন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*।

প্রাক-তরুণ বয়স থেকেই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রচনা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি একধরনের শ্রদ্ধাবোধ লালন করে এসেছি আমি। তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও আত্মস্বীকৃত ছাত্রের আনুগত্য নিয়ে আমি তাঁর রচনা পাঠ করি, তাঁর মতামতগুলোকে নিজের মস্তিষ্কে রোমন্থন করি, তাঁর আলোচনা শুনি, তিনি অনুমতি দিলে সাবধানী বাক্যে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনেও যোজিত হই। কিন্তু তাঁর রচনাপাঠের অনুভূতিকে অন্য কোনোকিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। তাঁর লেখা পাঠককে ভাবতে উদ্বুদ্ধই শুধু নয়, রীতিমতো বাধ্য করে। কেননা তিনি শিরোনাম যাই-ই ব্যবহার করুন না কেন, রচনাটি গভীরভাবে স্পর্শ করে থাকে বাঙালির জীবনের গভীরতম অনুষঙ্গকে। সে-কারণেই তাঁর বিপুল পরিমাণ রচনার একটি বাক্যও বাঙালির জন্য অপ্রয়োজনীয় নয়। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত যে কেউই জানেন যে তাঁর রচনাভঙ্গি সক্রেটিসীয়। সক্রেটিস যেভাবে আলাপচারিতায় মগ্ন হতেন গ্রীসের তরুণদের সঙ্গে, সেই রকমই মনে হয় রচনার মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে কথোপকথনরত সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি পাঠককে প্রশ্ন করছেন, কখনো উস্কানি দিচ্ছেন, উদ্দীপিত করছেন ক্রোধে, মোহ্যমান করছেন বেদনায় কখনো, কখনো-বা লিপ্ত হচ্ছেন সরাসরি বিতর্কে। আর আমরা জানি, বিতর্কের উদ্দেশ্য কোনো এক পক্ষের জয়লাভ নয়, বরং বিতর্কের বিষয়বস্তুর ওপর বিভিন্ন দিক থেকে যুক্তির আলো ফেলে সে-বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সৎ চেষ্টা করা। এইসব বৈশিষ্ট্য তাঁর *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ* গ্রন্থে স্বমহিমায় বিরাজমান।

আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া অসমীচীন হবে না যে, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই গ্রন্থে যে জাতীয়তাবাদকে উদ্দীষ্ট করেছেন, তা হচ্ছে প্রগতিশীল বা গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ, যা জনগণকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করে। তিনি শুরুতেই জানিয়ে দেন যে, বিশ্বে যদি অসাম্য না থাকত, তাহলে প্রথম ধরনের, অর্থাৎ আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বই থাকত না। ফলে দখল বা উৎপাতের প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়াত না। কিন্তু সাম্য যেহেতু নেই, আর সেই অসাম্যের ভয়াবহ শিকার যখন শতকরা পঁচানব্বই জন বাঙালি, তখন সেই গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ বাঙালির প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে

বঞ্চিত বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠকে আধিপত্যের হাত থেকে মুক্ত করা, জাতির অন্তর্গত সব মানুষের মধ্যে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো। বাঙালির ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছিল একাধিকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই তা তলিয়ে গেছে ষড়যন্ত্রের চোরাবালিতে। ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাক্রম ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ব্রিটিশ আমল থেকে কেননা তার পূর্বে বাঙালি থাকলেও জাতীয়তাবাদ ছিল না; জাতীয়তাবাদ নামক ভাবাদর্শটির কথাও বাঙালির জানা ছিল না। লেখকের ভাষায়:

> ... জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা বুঝি সেটা বৃটিশ যুগের ব্যাপার, তার আগে বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় ইত্যাদি ছিল, জাতি ছিল না। ওইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টিকেই জাতি বলা হতো। ইংরেজ আগমনের পরেই জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব এবং তা ঘটে মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণেই। [পৃ. ৩৪৬]

ইংরেজদের অনুসরণেই ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটি সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ জাতীয়তাবাদ চিনতে শিখেছে এবং তাদের মধ্যকার বিক্ষুব্ধ অংশটি গোড়াপত্তন করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের।

২. ভাষাই আপন করে আর সেই ভাষা করে পর

জাতীয়তাবাদের জন্য ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভৌগোলিক ঐক্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ, ধর্ম, স্বাধীনতার কামনা—এগুলো সবই শক্তিশালী উপাদান। কিন্তু লেখকের মতে সবচেয়ে উপকারী উপাদান হচ্ছে ভাষা। তবে ভাষা এক হলেই যে জাতীয়তাবাদ সবসময় এক হবে, এমনটি নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। যেমন ইংরেজিতে কথা বললেও ব্রিটিশ ও মার্কিনীদের জাতীয়তা এক নয়। তবুও আধুনিক বিশ্বে, যে বিশ্বেরই সৃষ্টি জাতীয়তাবাদ, তার সবচেয়ে স্বীকৃত একক গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান হচ্ছে ভাষা। আর তাই ভাষা বিষয়ক আলোচনাই এই গ্রন্থে এসেছে সর্বাগ্রে।

ভাষা নিয়ে শ্লাঘা যেমন বাঙালির প্রবল, হীনম্মন্যতাও তেমনি সুপ্রাচীন। কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে ভিনদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী যারাই বাংলাকে দখল করেছে, তারাই প্রচার চালিয়েছে যে বাংলাভাষা নিকৃষ্ট, এই ভাষার কথা বলে অপকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষেরা। বাঙালির মুরুব্বিরা এই ধরনের কথার প্রতিবাদ তো করেইনি, বরং সোৎসাহে নিজেদের পরিবারবর্গকে নিয়োজিত করতে চেষ্টা করেছে অধিপতি জাতির ভাষা শিখতে। উদ্দেশ্য আমলা ও মুৎসুদ্দিগিরির সম্মান অর্জন (ব্যতিক্রম একমাত্র ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন)। আর্যরা বাংলাভাষা জানত না, শেখেনি, শেখার প্রয়োজনও বোধ করেনি। তারা বাঙালির ভাষাকে বলেছে পক্ষী ভাষা। বলেছে পিশাচ, পাপিষ্ঠ, দস্যু, রাক্ষস, দাস, কুকুর, ম্লেচ্ছ, বানর, ব্রাত্যদের ভাষা। মোগল-পাঠান-তুর্কিরা বাংলা দখল করলেও বাংলাভাষা শেখেনি। বাংলাভাষাকে ব্রাত্য করেই রেখেছে। দরবারি ও প্রশাসনিক ভাষা হয়েছে ফারসি। যে স্বাধীন নবাবকে নিয়ে বাঙালির আবেগ উথলে পড়ে, সেই নবাবও উর্দুতে-ফারসিতে

প্রশাসন চালাতেন। ১৯৪৭-এর পরে পাকিস্তানীরা চাপিয়ে দিতে চাইল উর্দু। তাদের মতে বাংলা মুসলমানের ভাষা হবার উপযুক্ত নয়, যেমন বাঙালিরাও মুসলমানিত্বের যোগ্য নয় পুরোপুরি।

ভাষার বিষয়ে বাঙালির স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে, শত শত বছরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। বাংলাভাষায় লিখিত রূপের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের পদ রচয়িতারা অধিকাংশই ছিলেন পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ। বাঙালি পণ্ডিতরাও তৎকালে সাহিত্যসৃষ্টি ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায়। মধ্যযুগে, সুলতানি আমলে বাংলাভাষায় কিছু সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি ও অনূদিত হলেও বাংলা প্রশাসনিক বা অভিজাত ভাষার

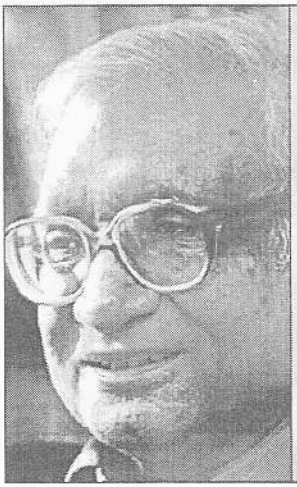

লেখকের কথা অনুসারে বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে স্থান দিলেও ধর্মনিরপেক্ষতার সবগুলো শর্তকে পালন করতে পারেননি, এমনকি করতে চানওনি। যেমন তিনি ওআইসি'র সদস্য হবার জন্য আন্তর্জাতিক তদবির করেছেন, দেশ থেকে ধর্মভিত্তিক মাদরাসা শিক্ষার প্রচলন বন্ধ না করে তাকে যুগোপযোগী করার নামে আরো সম্প্রসারিতও করেছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হজ্ব পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন। জিয়াউর রহমান এসে তো 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকেই সংবিধান থেকে মুছে ফেলেছেন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পদলাভে সমর্থ হয়নি। ইংরেজ আমলেই জাতীয়তাবাদের মতোই বাংলাভাষা বিষয়েও সচেতনতার সূত্রপাত। আমরা সন্দ্বীপের কবি আব্দুল হাকিমের অমোঘ উচ্চারণ শুনতে পাই এই সময়েই–

... যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।

সুনীতিকুমার বলেছেন:

> ... বাঙালি জাতি বলিলে যে জনসমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে বা ঘরোয়া ভাষারূপে ব্যবহার করে সেই জনসমষ্টিকে বুঝি।
>
> [*বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পৃ. ৬]

সুকুমার সেন বলছেন:

> ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ। বাংলা ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী জাতির ইতিহাস শুরু। [প্রাগুক্ত, পৃ. ৬]

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে ভাষাই বাঙালির ভরসা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> ... এতকাল যে আমাদের বাঙালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে

থাকি। শাসনকর্তারা বাংলা প্রদেশের অংশ প্রত্যংশ অন্যদেশে জুড়ে দিয়েছেন কিন্তু সরকারী দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাকে ছেঁটে ফেলতে পারেননি।

[প্রাগুক্ত, পৃ. ৬]

উপর্যুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধ বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশে আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে, বর্তমানকালও তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, ভাষার এই ঐক্য টেকেনি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে এই ভাঙনে শ্রেণীচেতনাই কাজ করেছে মূলত। ইংরেজসৃষ্ট বাঙালি-হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীচেতনা প্রথমে বিভক্তির সূচনা করেছে, সেটিকে আগুনের গনগনে শিখায় পরিণত করেছে পরবর্তীতে উদ্ভূত আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানেরা। ইংরেজের প্রত্যক্ষ ও কুটিল ইন্ধন অব্যাহতভাবে যোগান দিয়ে গেছে বিষমন্ত্র। যার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কুফল এখনো ভোগ করে চলেছে বিভক্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি জাতি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বিশ্লেষণের কাছে ফিরে আসা যাক। ইংরেজ আমলের প্রথম একশো বছর বাংলার কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। এই সময়ে কলকাতাবাসীদের মধ্যে একটি অংশ ইংরেজদের দেশী অনুচর ও সহায়ক হিসাবে কাজ শুরু করে। ব্রিটিশের অনুগ্রহপুষ্ট এই গোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত হয় ভারতবর্ষের প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল মূলত বাঙালি এবং উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হিন্দু। তাদের কাছে বাঙালি জাতির অর্থই ছিল বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অর্থাৎ নিজেদের শ্রেণীটিকেই তাঁরা বাঙালিজাতি হিসেবে ভাবতেন। নিজেদের বাইরে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধ বাংলাভাষী বা বিপুল পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম বাংলাভাষীর অস্তিত্ব আছে, তা তারা কখনোই মেনে নিতে চাননি। ১৮৭২ সালের আদমশুমারির ফলাফল একটি চাঞ্চল্যকর বাস্তবতা উন্মোচিত করে দিয়েছিল। তা হচ্ছে বাংলার জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান। তবুও উপর্যুক্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদেরকে মেনে নিতে, এমনকি গুরুত্ব দিতেও নারাজ ছিলেন। এই শ্রেণীটির উৎপত্তি ও মানসিক গঠনের সামাজিক রাজনৈতিক কারণ নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ ইতোমধ্যেই প্রণীত হয়েছে। এই গ্রন্থেও লেখক সে-ব্যাপারে যথেষ্ট বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেদিকে না গিয়ে শুধু এটুকু বলাই সঙ্গত হবে যে ইংরেজের ইন্ধনে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত এদের হাতেই। আরো দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এই সাম্প্রদায়িকতা তারা প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন বাংলাভাষার মধ্যেও। লেখক মনে করেন, আজকের বাংলাবিভক্তির লক্ষণ সেসময়েই দেখা গিয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে।

মোগল ও পাঠান আমলে হিন্দুরা ফারসি পড়তে ও শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রশাসনিক চাকরি ও বিভিন্ন সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে। ইংরেজ আমলে এসে সেই শোধ তারা তুলতে চাইলেন সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। তাদের কাছে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজ-কর্তৃক ভারতবর্ষ দখল প্রতিভাত হয়েছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে। বিধাতা-প্রেরিত ইংরেজ এসে তাদের উদ্ধার করেছে যবন-রাজত্ব ও যবন-ভাষা থেকে। হিন্দু-মধ্যবিত্তের হাতে যে বাংলা গদ্য লেখ্য-রীতির সূত্রপাত হলো তা ক্রমান্বয়ে সংস্কৃতঘেঁষা হতে থাকল। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। বাংলা ভাষা থেকে মুসলমানত্ব দূর করা এবং বাংলাভাষা যে কেবলমাত্র হিন্দুদের ভাষা তা প্রমাণ করা। এই কাজে কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকতে ছিলেন নারাজ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন:

... বাঙ্গালা ভাষা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণের জন্য অন্য ভাষা হইতে

> সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত।
>
> [প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯]

মোহিতলাল মজুমদার লিখলেন:

> ... এ ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, জন্ম হিসাবে বাঙালি এক জাতি কিন্তু ভাব-বিস্তার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপাদান সংস্কারের দ্বারা সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। খাঁটি বাংলাভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায় তাহাও প্রকৃত বাংলা নয়— বারো আনা সংস্কৃত।
>
> [প্রাগুক্ত, পৃ.২৪]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যে জানাচ্ছেন যে,

> ... ভাষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা কেবল শব্দ নিয়ে গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি, বিশেষ বিশেষ শব্দ নিয়ে প্রচণ্ড কলহেরও জন্ম পর্যন্ত দিয়েছে। যেমন 'পানি' শব্দটি। যেমন নজরুলের কবিতায় রক্ত অর্থে 'খুন' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া।

সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে দেবভাষার দুহিতার আসনে পুনরায় অভিষিক্ত করার জন্য প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন মধ্যবিত্ত হিন্দু-লেখকেরা। সেই সঙ্গে তাঁরা ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেও ভোলেননি। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন:

> ... বাংলাদেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাঙলাভাষা লিখিতে বসিয়া 'গরিবেনেওয়াজ শেলামাত' বলিয়া শুরু করিয়া 'ফিরাব' বলিয়া শেষ করিতে হইতো। [প্রাগুক্ত, পৃ.২০]

আর আমাদের সমসাময়িককালের বিখ্যাত মনীষী অমলেশ ত্রিপাঠী ১৯৯৯-তে প্রকাশিত *ইতালীর রেনেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি* [কলকাতা ২০০২, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪] বইতে লিখেছেন:

> মুসলমান আমলে ফার্সী বাধ্যতামূলক হওয়ায় বাংলাভাষার মধ্যে বহু আরবী-ফারসী শব্দ রয়েছে এবং তৎসম শুদ্ধতা-সাবলীলতা নষ্ট করেছে। তাঁর (হেলহেডের) খাঁটি *বাংলাভাষার ব্যাকরণ* (১৭৭৮) বাংলাভাষার পুনর্জন্মেরই প্রথম পদক্ষেপ।

এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে ব্রিটিশ যুগে বাঙালি-হিন্দু মধ্যবিত্ত লেখকদের ইন্ধন যোগাতে ইংরেজ-ডাচ-ফরাসি মিশনারিরা এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮১৮ সালে উইলিয়াম কেরী লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষীয় অন্য যে কোনো ভাষার তুলনায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাভাষার সাযুজ্য বেশি। তাঁর মতে বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারের শতকরা আশি ভাগই সংস্কৃত শব্দ। অথচ বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদের* মোট দুই হাজার শব্দের মধ্যে প্রকৃত তৎসম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র একশো, যা শতকরা হিসাবে দাঁড়ায় মাত্র পাঁচটি। পরবর্তীকালের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তখনো অনুপাত শতকরা ১২.৫-এর নিচে। তাছাড়াও পরবর্তীকালে বাংলা যে সংস্কৃতভাষার

দুহিতা— এমন ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাংলাভাষার জন্ম মাগধী-প্রাকৃত ভাষা থেকে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করিয়ে দিচ্ছেন— বাংলা যে সংস্কৃত থেকে পৃথক তা ব্যাকরণের কয়েকটা ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। যেমন বাংলা হচ্ছে analytic ভাষা, সংস্কৃত inflection ভাষা। সংস্কৃত বাক্যগঠনের বেলায় অন্তর্গত পদগুলোর অবস্থান রদবদল হতে পারে, তাতে বাক্যের অর্থ বদলাবে না। আর বাংলায় ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বাক্যগঠনে পদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট। বাংলায় বিশেষ্য-র দ্বিবচন-বহুবচন নিয়ম নয়; সংস্কৃতে বিশেষ্য-র দ্বিবচন-বহুবচন রয়েছে। সংস্কৃতে বিশেষ্য-র লিঙ্গ রয়েছে এবং লিঙ্গের সঙ্গে ক্রিয়া বদলাবে; বাংলায় তেমন নিয়ম নেই। আধুনিক বাংলায় 'না' অব্যয়টি ক্রিয়ার পরে বসে, সংস্কৃতে না-জ্ঞাপক অব্যয় বসে ক্রিয়ার আগে। বাংলায় ব্যক্তিগত সর্বনামে 'আপনি' 'তুমি' 'তুই' আছে, সংস্কৃতে শুধু 'আপনি' ও 'তুমি'।

এসবের পাশাপাশি সৃজনশীল ও ছাত্রপাঠ্য পুস্তকগুলিতে হিন্দুয়ানির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলমানদের নীচু করে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টার চিহ্ন ছিল প্রকট। ১৮৯৯ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী হিন্দুদের লেখা বাংলা বইতে মুসলমানদের অপমান করা হয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, বাঙালি-মুসলমান ছাত্ররা দুর্ভাগা। তারা তাদের প্রচলিত জীবনে যে বাংলা ব্যবহার করে তার কোনো চিহ্ন তাদের পাঠ্যপুস্তকে খুঁজে পায় না। বরং তাদের এমন বিদ্যা অধ্যয়ন করতে হয়ে যা পরিষ্কাররূপে অপমানকর। অশ্রাব্য ভাষায় মুসলমানদের গালাগালি না দিয়ে হিন্দুরা কিছুই লিখতে পারেন না। তিনি সেই গালির তালিকাও তুলে ধরেছেন। সেগুলি হচ্ছে— যবন, পিশাচ, ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, নেড়ে, চাষা ইত্যাদি।

গদ্যরীতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত মীর মশাররফ হোসেন পর্যন্ত হিন্দু-লেখকদের এই হীন প্রবণতা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> ... পাগল সাজাইতে মুসলমান, আহাম্মক প্রমাণ করিতে হইলে মুসলমান, গালাগালি দিতে হইলেও মুসলমান। ইহার দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে।
>
> ['হিতকরী' পত্রিকা। জুন ১৮৯১ সংখ্যা।]

এইসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ১৯০৮ সালের মুসলিম লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে অনুরোধ করা হোক যে, তারা যেন বাংলার স্কুলগুলিতে মাতৃভাষার বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থাটি রহিত করেন। লেখকের ভাষায়:

> ... বাঙালী মুসলমান বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলা পড়বেই না, কেননা পাঠ্য বইতে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্বন্ধে যেসব কথা লেখা থাকে তা তাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। [পৃ. ৩৩]

এরচেয়ে মারাত্মক ও আত্মঘাতী প্রতিক্রিয়া আর কী হতে পারে! ভাষার প্রসঙ্গটি এভাবেই প্রবেশ করে শিক্ষায়।

৩. শিক্ষা: ঐক্যের কারণ না হয়ে হয়েছে অনৈক্যের উপাদান

এখানে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যা এখনো স্বমহিমায় বিরাজ করছে স্বাধীন বাংলাদেশে এবং সম্পূর্ণ উপমহাদেশে। ইংরেজ দখলদারিত্বের পর এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হয়েছিল। এই বিষয়ে পর্যাপ্ত মতভেদ ছিল শাসক ইংরেজদের মধ্যে। ডালহৌসি বলেছিলেন, যেহেতু তারা ইউরোপ থেকে এসেছেন তাই পতিত ভারতবাসীকে উদ্ধার করা (!) তাদের দায়িত্ব। তিনি বলেছিলেন সবাইকে জ্ঞান দেওয়া দরকার; কিন্তু মেকলে (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জানাচ্ছেন, সঠিক উচ্চারণ—মেকওলে) বললেন, সবাইকে জ্ঞান দেওয়ার বা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কাজ হবে একটি শ্রেণীকে শিক্ষিত করা, যারা নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজদের আজ্ঞাবহ হবে। এই ব্যাপারে মেকলের ১৮৩৫-এর প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি আরেকবার স্মরণ করা যাক। তিনি বলছেন—ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালিদের মধ্য থেকে, একটি নতুন শ্রেণী বের করে নিয়ে আসতে হবে, যে শ্রেণীটি রক্তে ও বর্ণে স্থানীয় হবে ঠিকই, কিন্তু রুচি, ধ্যান-ধারণা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।

অনেক পরে ১৯১৯ সালে ভারতসচিব মন্টেগু এই চিন্তার সফল প্রয়োগের ফলাফল নিয়ে রীতিমতো গর্বের সঙ্গে লিখলেন—

> ... ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যারা রাজনীতি সচেতন, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তারা আমাদের সন্তান। আমরা যেসব চিন্তা তাদের সামনে উপস্থিত করেছিলাম সেগুলো তারা নিজেদের মধ্যে উদ্দীপ্ত করেছে ...। [পৃ. ৬১]

মেকলের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে প্রস্তাবিত সালেই, অর্থাৎ ১৮৩৫-এ। আর ১৮৩৭ সালে প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে ফারসির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ইংরেজি। তবে কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা সরকারিভাবে প্রবর্তনের আগেই বেসরকারি উদ্যোগে প্রবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারি, দাপ্তরিক পেশাজীবী, কোম্পানির দালাল ও বেনিয়ান, জমিদার ও তাদের আশেপাশের মানুষ—সব মিলিয়ে নতুন একটি শ্রেণী তৈরি হয়ে গেল। এটাই হলো শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাঙালি বলতে 'বাঙালি-হিন্দুকে' উপস্থাপন করার সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। লেখক বলছেন:

> ... এক অর্থে শিক্ষামাত্রেই উপনিবেশিক। রাষ্ট্র যেমন উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায় জনজীবনের ওপর, শিক্ষা তেমনি উপনিবেশ স্থাপনের আশা রাখে জনগণের মনোভূমিতে।
>
> [পৃ. ১২৩]

একই কথা ভিন্ন ভাষায় আগেই বলে গেছেন চার্লস গ্রান্ট ১৭৯৫ সালে—

> ... আমাদের ভাষা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধ্যান-ধারণা এবং আমাদের ধর্ম—এশিয়ার ভূমিতে এদের যদি আমরা রোপণ করতে পারি তাহলে এখানে আমাদের কাজ কোনদিনই ধ্বংস হবে না। [পৃ. ৬৩]

১৭৯৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে ভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাজ, ১৭৯৫ সালে প্রস্তাব উঠেছে মনোভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্যোগ গ্রহণের। একাজে অসামরিক বরকন্দাজ

হিসাবে তারা বেছে নিল উচ্চবর্ণের হিন্দু-বাঙালিকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পৃষ্ঠপোষকতা দিলেও এদেরকে ইংরেজরা ঘৃণার চোখেই দেখত। মেকলের দৃষ্টিতে এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

> ... এরা প্রতারক, কথা দেয় কিন্তু কথা রাখে না, মিথ্যা দিয়ে সর্বদাই আচ্ছাদিত করে রাখে নিজেদেরকে, জালিয়াতি তাদের মজ্জাগত। এরা অত্যন্ত কাপুরুষ, নিজেদের দেশ অন্যরা জয় করে নিচ্ছে, বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, শিকার হচ্ছে অসম্মানের— এসব তারা নির্বিকারভাবে চেয়ে দেখত। [পৃ. ৬০-৬১]

চার্লস গ্রান্টের ধারণাও প্রায় একই রকমের—

> ... বাঙালী ইউরোপের পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলোর তুলনাতেও অধঃপতিত। অসততা ও দুর্নীতি এদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, বিশেষ করে আদালত পাড়ায়। এরা হচ্ছে স্বার্থপর এবং বিবেকবর্জিত। দেশপ্রেমের চিহ্নমাত্র নেই। [পৃ. ৬৩]

ঠিক যেমনটি ইংরেজরা খুঁজছিলেন, তেমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এরা। অচিরেই শুরু হলো পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নিম্নবর্ণের কৃষক-প্রজা ও মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেওয়ার কাজ।

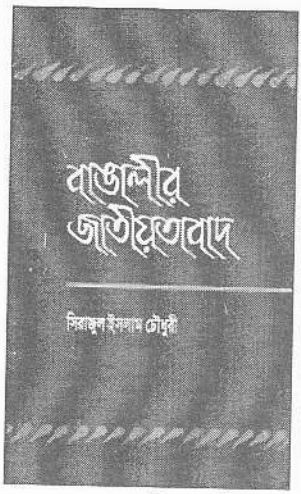

বাঙালির জাতীয়তাবাদ
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা
প্রথম প্রকাশ: ২০০০
৪৬৮ পৃষ্ঠা
২৯০ টাকা
পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ২০০৭
পৃষ্ঠা ৪৭২
৪০০ টাকা

ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ১৭৮১ সালে। সেখানে মুসলমান আশরাফ শ্রেণির সন্তানরা ফারসি, আরবি এবং উর্দু পড়ত। কিন্তু উদ্দিষ্ট শ্রেণিটির জন্য ১৮১৭ সালে স্থাপন করা হলো হিন্দু কলেজ। সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। এবং সেখানে ভর্তি হবার অধিকার ছিল শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের বাঙালি-হিন্দু সন্তানের। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— পৃষ্ঠপোষকতার ধারাবাহিকতায়। ততদিনে বাঙালি-হিন্দু ও বাঙালি-মুসলমান মধ্যবিত্তের মাঝখানে পাকাপাকি লম্বরেখ-বিভাজন সৃষ্টি হয়ে গেছে। ইংরেজদের পরেই যেহেতু বাঙালি-হিন্দু মধ্যবিত্ত, তাই বাঙালির পরিচয় পর্যবসিত হলো বাঙালি-হিন্দুর পরিচয়ে। তারাই হিন্দু-মেলা স্থাপন করেছে, পত্রিকা প্রকাশ করেছে, বই লিখেছে, ছোট হাকিম-ডেপুটি হয়েছে, উকিল-ডাক্তার হয়েছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছে, স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠান খুলেছে। ইংরেজ তাকে উৎসাহিত করেছে, পোষকতা দিয়েছে, সে নিজেও ভুলে যেতে চেয়েছে যে মুসলমানদের মধ্যেও বাঙালি আছে। দেখা যাচ্ছে, কোম্পানি বছরে যে ৫০ দিন ছুটির তালিকা ঘোষণা করেছে, তাতে হিন্দুদের ধর্মীয়

উৎসবের দিনগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও মুসলমানদের ঈদের দিন পর্যন্ত সেই তালিকায় স্থান পায়নি। ইংরেজ এভাবেই বাঙালি-হিন্দু মধ্যবিত্তকে শিখিয়েছে বাঙালি-মুসলমান ও শূদ্রকে ঘৃণা করতে। হৃদয়ঙ্গম করতে বাধ্য করেছে যে ইংরেজের অস্তিত্বের ওপরেই এই মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, আর ইংরেজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ভারতবর্ষে শাসন-শোষণের নিশ্চয়তায়। তাই শোষণকর্মে ইংরেজকে সর্বাত্মক সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে এই শ্রেণী। রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যে ইংরেজ-শাসনকে নিজেদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে ঘোষণা করতেন, তা তো এমনি এমনি নয়।

বাঙালি-মুসলমান পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে করতেই পেরিয়ে গেছে শতাধিক বৎসর। একটা উদাহরণ দিয়েই লেখক এই বিলম্বে বোধোদয়ের ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ সালে, আর মুসলমানদের উদ্যোগে প্রথম কলেজ, টাঙ্গাইলের করটিয়ার সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় একশ নয় বছর পরে, ১৯২৬ সালে।

বাঙালি-মুসলমান মধ্যবিত্ত চোখ মেলে দেখল সাম্প্রদায়িকতার ছায়া। সে তখন কোমর বেঁধে মত্ত হলো পাল্টা সাম্প্রদায়িকতায়। বাঙালি বলতে বাঙলি-হিন্দুকে বোঝানো হয় দেখে সে-ও নিজের বাঙালিত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ল। তদুপরি আধুনিক শিক্ষার সোপানে পা রাখতে গিয়ে সে দেখল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যেগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলোতে হিন্দু ধর্মীয় বাতাবরণ এতই সুস্পষ্ট যে ছানিপড়া চোখেও তা দেখা যায়। যেমন পাঠ্যতালিকায় অবশ্যপাঠ্য একটি পুস্তক ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'জাতীয় সাহিত্য' নামক গ্রন্থখানি। সেই বইয়ের ব্যাপারে মুসলমানদের আপত্তি ছিল প্রবল। বইটির কিয়দংশ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তুলে ধরেছেন,

> ... (ক) ভগবানের নাম করিয়া, দেশমাতৃকার চরণ স্মরণ করিয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হইব। (খ) জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টিতে ইউরোপের ইতিহাস, সাধারণ সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন হইতে উপাদান গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু আমাদের যাহা উত্তম তাহা যেন পরিত্যক্ত না হয়— সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ—যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ, কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুলরবি কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক ... (গ) বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শগ্রন্থ ... তাহাদের আবার অভাব কিসের? (ঘ) যদি সারা বঙ্গদেশীয়কে একভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমরা জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্তির বিমল প্রভায় বাঙালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভূজার মূর্তিতে বাঙালীর সমক্ষে অবতীর্ণ। [পৃ. ৯৭-৯৮]

বাঙালি-মুসলমান ছাত্র এই জাতীয় রচনা পাঠ করে মুখস্ত করতে ও পরীক্ষার পাতায় লিখতে সঙ্গত কারণেই বিব্রত বোধ করেছে। আর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে মুসলমান অভিভাবক মহলে। তারা এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেবার দাবি পর্যন্ত তুলেছে।

১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হলো ইংরেজ-শাসক। কারণ এটা মূলত বাঙালি-হিন্দু মধ্যবিত্তের আন্দোলন। এবার ইংরেজ-সরকার মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে বেশি করে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করল। মূল কারণ মুসলমান-প্রীতি নয়, হিন্দু-মধ্যবিত্তের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো এবং হিন্দু-মধ্যবিত্তের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। হিন্দু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অনুদান কমিয়ে দেওয়া শুরু হলো। ১৯২৫-২৬ অর্থবছরে কলকাতা মাদরাসার জন্য সরকারি অনুদান ত্রিশ হাজার টাকা, অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজের জন্য বিশ হাজার টাকা। সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজে মুসলমান-ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ঘোষিত হলো শতকরা পঁচিশ ভাগ আসন। মেয়েদের জন্য লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুসলমান মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ করা হলো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসন। এসব পদক্ষেপের ফলে হিন্দু-মধ্যবিত্তের আরো বেশি করে জাতীয়তাবাদী হবার সাধনা শুরু হলো। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তারা অতীতের ভ্রান্তির পর্যালোচনা না করে নিজেদের সম্প্রদায়কে কেন্দ্রে রেখে অন্য সব সম্প্রদায়ের মানুষকে দূরবর্তী করেই রেখে দিয়েছিল। ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎ বসু, সুভাষ বসু প্রমুখের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, এবং জাতীয়তাবাদের প্রধানতম শর্ত যে ধর্মনিরপেক্ষতা, সেকথা তাঁরা মনে রেখেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস জানাচ্ছে, তাঁদের ধারাটি মূলধারা হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন পাকিস্তান-পর্বে কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশেও মূলধারা হয়ে উঠতে পারেনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার ধারাটি।

মুসলমান-মধ্যবিত্ত ইংরেজ আমলেই হিন্দু-মধ্যবিত্তকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে পাকিস্তান-পর্বে। সেই প্রতিশোধ ছিল বীভৎস রকমের বিকৃত। পাকিস্তান আমলে সরকারি 'মাহেনও' পত্রিকা বাংলা থেকে সংস্কৃতের প্রভাব ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তা থেকে হিন্দুয়ানা (!) মুছে ফেলে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষাকে পাকিস্তানি-বাংলাভাষায় রূপান্তরের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সেই পত্রিকার একটি গদ্যের নমুনা—

> গোজেশতা এশায়াতে আমরা বাংলাভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোকতাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলাভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে বাংলাভাষা মুসলমান বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহদের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারে শানশওকত হাসিল করেছিল। ...সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুনের তায়লুক বর্জিত বাংলাভাষা মাশরেকী পাকিস্তানের মাতৃভাষা নয়, এবং হবে না, হতে পারে না।
>
> [পৃ. ৩৫]

শিক্ষার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে তৎকালীন হিন্দু-মধ্যবিত্ত সুনজরে দেখেনি, বরং তারস্বরে বিরোধিতা করেছে। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে পাকিস্তানি জান্তা। এখনো বাংলাদেশের শোষকশ্রেণীর সবচেয়ে ভয়ের জায়গা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ বাঙালির প্রগতিশীলতার সিংহভাগ যোদ্ধা এসেছে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই কাজটি কেমন করে সম্ভব হলো? একই ছাঁচে ঢালা শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে যখন বেরিয়ে আসছে খণ্ডিত জাতীয়তাবাদী চেতনার

মধ্যবিত্ত, তখন এই হঠাৎ হঠাৎ সম্পূর্ণ মানুষ বেরিয়ে আসার রহস্য কোথায়? উত্তরটাও দিয়েছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। শিক্ষাদান করার মানে হলো দেখতে শেখানো। যে দেখতে শেখে, তাকে যে দেখতে বলা হবে সেটুকু দেখেই সে সবসময় সন্তুষ্ট থাকবে, এমনটি হয় না। অন্তত সবার ক্ষেত্রে হয় না। সেই রকমই এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য থেকেও বেরিয়ে এসেছেন কিছু স্বচ্ছ দৃষ্টির মানুষ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁরা সংখ্যায় অল্প এবং কখনোই মূলধারা হিসাবে পরিগণিত হতে পারেননি। তারপরেও বাঙালির জাতীয়তাবাদ যে ধর্ম নয়, ভাষাভিত্তিক, তার প্রমাণ পাকিস্তানি শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

৪. বঙ্গভঙ্গ: ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি, নাকি উল্টোযাত্রা?

বঙ্গভঙ্গ ঘটেছে দুইবার। একবার ১৯০৫ সালে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে। বলা চলে ব্রিটিশের দ্বারাই। কিন্তু সাত বছরের মাথায় খণ্ডিত বঙ্গ জোড়া লেগেছিল। প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে হিন্দু-মধ্যবিত্ত। মুসলিম-মধ্যবিত্ত হয় বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল অথবা ছিল মৌন। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হয়েছে এবং এই বিভাজন পঞ্চাশোর্ধ্ব বছরেও অটুট আছে। এটাও ইংরেজদের দ্বারাই ঘটেছে বলা যায়। কিন্তু বলা চলে, এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে হিন্দু-মধ্যবিত্ত। মুসলমানরা ভোট দিয়েছে তো পাকিস্তানেরই পক্ষে। হ্যাঁ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দিয়েছে। কিন্তু বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে দেয়নি। মধ্যবিত্ত দেয়নি, এমনকি শ্রমজীবী-কৃষকেরাও দেয়নি। ১৯৪৭ সালের ৫ই এপ্রিল, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র জরিপ রিপোর্ট যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে হিন্দু-সম্প্রদায়ের শতকরা ৯৮.৩ জনই চেয়েছিলেন যে বাংলাকে ভাগ করা হোক। এই জরিপকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা যায় না, বরং এটি ছিল হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের মুসলিম-বিরোধী অংশের সঙ্গে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের যোগসাজসের ফলাফল। কেননা হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ কৃষক-ক্ষেতমজুর-জেলে-তাঁতি কেউই বঙ্গভঙ্গ চাইতেন না।

ড.অশোক মিত্র বলেছিলেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ না হলে বাঙালি-মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটত এবং বিকশিত বাঙালি-মুসলমান মধ্যবিত্ত হিন্দু-বাঙালির সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিতে পারত। ফলে ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের প্রয়োজন পড়ত না।

১৯০৫ সালে যেসব হিন্দু নেতা, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং মারোয়াড়ি-গুজরাতি বণিকেরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারাই আবার ১৯৪৭ সালের বঙ্গবিভাগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করল। না করে উপায় ছিল না। কারণ ১৯৪৭ সাল নাগাদ গান্ধী-নেহেরুসহ কংগ্রেসের সব বড় বড় নেতা মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল। তাদের টাকায় বিক্রি হয়ে গেছেন সবাই। আর বাংলা বিভাগ না হলে পশ্চিমবঙ্গে গোয়েঙ্কা, বিড়লা, বাঙুর, বাজেরিয়া, টাটা, জালান, কানেরিয়া, খৈতান প্রভৃতি মারোয়াড়িদের লগ্নিকৃত অর্থ বেহাত হয়ে যেত। কংগ্রেস যে তাদের কথায় উঠবে-বসবে এ আর বিচিত্র কী! কারণ গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে নিয়ে আসা, তাঁকে মহাত্মা বানানো, তাঁর আশ্রম, কংগ্রেস সংগঠন এবং তাঁর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত গান্ধী সেবা সংঘ, চরকা সংঘ,

গ্রামোদ্যোগ সংঘ প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের রসদ যুগিয়েছে মারোয়াড়িরাই। নেহেরুর জীবনীলেখক সর্বপল্লী গোপাল জানিয়েছেন, বিড়লা পরিবার কংগ্রেসের অনেক নেতাকে মাসিক মোটা মাসোহারা দিত। জহরলালও নিতেন, তবে গান্ধীর হাত থেকে, সরাসরি বিড়লাদের হাত থেকে নয়। এই টাকা খরচ করার পেছনে মারোয়াড়ি মুৎসুদ্দীদের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। গান্ধীর এককালীন সহকর্মী মাওলানা মুহাম্মদ আলী ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন—

> ... একচেটিয়া ক্ষমতার অভিলাষী ক্ষুদ্র একটি বেনিয়া গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সমগ্র ভারতীয় জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হতে চায়। ... আমার মনে হয় বম্বে ও গুজরাতের বেনিয়াদের টাকাতেই অধিকাংশ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।
>
> [সুনীতি কুমার দত্ত—'বাংলা কেন ভাগ হলো? কাদের স্বার্থে?', *আবুল হাশিম স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৫৮]

আবুল হাশিম ও শরৎ বসু মিলে অখণ্ড বাংলার ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেছিলেন, যা পরবর্তী পর্যায়ে সংবিধানের রূপ পেতে পারত। বাংলার কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায় মহাত্মা গান্ধীকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে বাংলাকে বিভক্ত করার চাইতে তাঁরা বরং অখণ্ড বাংলা নিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে রাজি আছেন। তবু বাংলাকে ভাগ হতেই হলো। কারণ তখন বাংলার রাজনীতি ও ভাগ্য আর বাঙালির হাতে নেই। ততদিনে ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছে দুই মুৎসুদ্দীর লড়াই। মারোয়াড়ি-গুজরাতির উৎপত্তি ঘটেছে আগেই। ১৯৪৭ সালনাগাদ বাংলার বাজারের দখল নিতে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা মুসলমান আদমজী-বাওয়ানী-লতিফ-হাবিব-ইস্পাহানীর দল। দুই দলই বাংলাবিভাগ চায়। চায় নিজ নিজ বাজারের দখলিস্বত্ব বজায় রাখার স্বার্থে।

১৯৪৭ সালের ৩ রা এপ্রিল কলকাতায় বড় হিন্দু-মুৎসুদ্দীদের একটি সভায় নলিনী সরকার বাংলাভাগের দাবি করে একটি প্রস্তাব আনলেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সভায় বি এস বিড়লা, স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, বি এল জালান, ডি সি ড্রাইভার, এম এল শা ও নলিনী সরকারকে নিয়ে একটি অ্যাকশন কমিটি গঠিত হলো। ইতোমধ্যে এই মর্মে লেখা চিঠিতে নেহেরু কী লর্ড ওয়াভেলের কাছে দাবি জানিয়েছেন যে ভারতবর্ষ যদি অবিভক্তও থাকে, তবুও বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করা হোক। বাঙালি-হিন্দু মধ্যবিত্তের তখনকার প্রতিনিধি শ্যামাপ্রকাশ ভট্টাচার্য, যদুনাথ সরকার প্রমুখ হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে দাবি জানালেন—পাকিস্তান হোক বা না হোক, বাংলাকে ভাগ করতেই হবে। হুমায়ূন কবির বলার চেষ্টা করেছিলেন—

> ... একশোভাগ বিদেশী, ভারতীয় ও ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজি যা বাংলাকে শোষণ করছে তা পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি হয়েছে। ... মুক্ত ঐক্যবদ্ধ বাংলায় তাদের যে অসুবিধা হবে তা উপলব্ধি করার মতো বিচক্ষণতা তাদের আছে। বিদেশী পুঁজির স্বার্থে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে, পঙ্গু করতে হবে এবং ক্ষমতাবিহীন করতে হবে যাতে শোষণকে প্রতিহত করার শক্তি বাংলার কোনো অংশের না থাকে। ... বিভক্ত বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই বিদেশী

> ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের একটি দূর প্রান্তবর্তী প্রদেশ, সম্ভবত উপনিবেশরূপে গণ্য হবে।
>
> [পৃ. ৬১]

সেটাই ঘটেছে। একই ভাগ্য পূর্ববঙ্গের। ৪৭-উত্তরকালে তা পরিণত হয়েছিল পাকিস্তানের উপনিবেশে। তবে, দুর্বল হলেও, অনুন্নত হলেও, হাজার বছর পরে বাঙালির একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা হয়েছে কৃষিনির্ভর, শিক্ষাহীন, পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গেই।

৫. তারপরেও কথা থাকে . . .

ব্রিটিশ ও পরে পাকিস্তানি প্রত্যক্ষ উপনিবেশিক শাসন অতীতে পরিণত হয়েছে আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে। এই তেত্রিশ বছরেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে পারল না? এদেশের মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদ এখনো ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ও প্রশ্নবিদ্ধ কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তবে সেই চেষ্টা প্রত্যক্ষ নয়। কেমন যেন অস্পষ্ট, একটু তালগোল পাকানো। যেমন তালগোল পাকানো অবস্থান বাংলাদেশের মানুষের। লেখক বারংবার বলার চেষ্টা করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইহজাগতিকতার (দুটিরই ইংরেজি প্রতিশব্দ সেক্যুলারিজম) চর্চা ও বিকাশ না ঘটার কারণেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি বলছেন—

> ... ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেই যে গণতন্ত্র থাকবে এমন নিশ্চয়তা কেউ দেবেন না, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ভিন্ন যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব এটা নিশ্চিত সত্য।
>
> [পৃ. ৩২১]

এবং–

> ... ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিকতা নয়, আবার সমান ধর্মের সমমর্যাদা কিংবা সমন্বয়ও নয়, এমনকি অসাম্প্রদায়িকতাও নয়, যদিও অসাম্প্রদায়িকতা এর একটি বৈশিষ্ট্য বটে। ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্মের বিরাষ্ট্রীয়করণ অর্থাৎ ব্যক্তিগতকরণ। [পৃ. ৩২১]

লেখকের কথা অনুসারে বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে স্থান দিলেও ধর্মনিরপেক্ষতার সবগুলো শর্তকে পালন করতে পারেননি, এমনকি করতে চানওনি। যেমন তিনি ওআইসি'র সদস্য হবার জন্য আন্তর্জাতিক তদবির করেছেন, দেশ থেকে ধর্মভিত্তিক মাদরাসা শিক্ষার প্রচলন বন্ধ না করে তাকে যুগোপযোগী করার নামে আরো সম্প্রসারিতও করেছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হজ্ব পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন। জিয়াউর রহমান এসে তো 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকেই সংবিধান থেকে মুছে ফেলেছেন। মীমাংসিত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' এর বদলে উদ্ভট বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব হাজির করেছেন। পরবর্তী সরকারগুলো ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা থেকে শুরু করে এই দেশকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। বর্তমানে চেষ্টা চালানো হচ্ছে বাংলাদেশকে 'মধ্যপন্থি মুসলিম রাষ্ট্র' হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করানোর। ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, সাম্প্রদায়িকতাই আজকের বাস্তবতা। এটিকে শুধু অতীতের সাম্প্রদায়িক চিন্তার ধারাবাহিকতা বলাটা ভুল হবে। কিন্তু লেখক বোধহয় সেকথাই বলতে চান। তিনি ১৯৭১-এর পর্বে পৌঁছে আবার পরবর্তী অধ্যায়ে ফিরে চলে যেতে চান ব্রিটিশ সময়ের পর্যালোচনায়। বাংলাদেশে এখন কোনো সংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই। না রাষ্ট্রক্ষমতায়, না সামাজিক ব্যবস্থাপনায়। আছে

ভুঁইফোড়-লুঠতরাজকারীর দল। তবুও লেখক বারবার ফিরে যান মধ্যবিত্তের পর্যালোচনাতেই। তিনি বলেন—

> ... এই মধ্যবিত্ত যখন গড়ে উঠছিল তখন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এর সদস্যরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এই হিন্দু মধ্যবিত্ত নিজেদেরকে একটি জাতি মনে করতো। মুসলিম মধ্যবিত্ত তখনো মঞ্চে এসে পৌঁছেনি; যখন তারা এলো তখন দেখলো প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারছে না, ফলে তাদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হলো, তারা মনে করা শুরু করলো যে তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি। [পৃ. ৩২৫]

এই মনে করাটা কি এতটাই দৃঢ়প্রোথিত যে তা এখনো অব্যাহত আছে? নাকি এর পেছনে আরো কোনো কারণ বিদ্যমান? এই হিন্দু-বিরোধিতা পরিণত হয়েছে ভারত-বিরোধিতায়। বাংলাদেশের জনগণ তো এই বিরোধিতার ঢোলে চাঁটি পড়ামাত্র নেচে ওঠে। তাহলে কি একথা বলা দোষের হবে যে এদেশের সাধারণ মানুষ, যাদের আমরা জনগণ বলে সম্মান করি, তাদের গভীরে ঢুকে গেছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ? জনগণের প্রবাদপ্রতীম অসচেতনতার কথা বলে আসছি আমরা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জনগণ কোনো পক্ষ নেয়নি। পলাশীর যুদ্ধ চলাকালে পাশের গাঁয়ের বাঙালি কৃষকেরা ধানচাষ করছিল। রবার্ট ক্লাইভের স্মৃতিচারণে জানা গেছে যে বিজয়ী ইংরেজসৈন্য যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করছে, তখন রাস্তার দুইধারে লক্ষ বাঙালি দাঁড়িয়ে ছিল, তারা একটি করে ঢিল ছুঁড়লেই ইংরেজবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এসবগুলোকে না হয় জনতার অসচেতনতা বলে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু স্রেফ হিন্দু-বিরোধিতার নাম করে আড়াই শ বছর পরেও যখন একটা দল ভোটে জিতে যায়, তখন ভোটদাতা জনগণকে কী বলে অভিহিত করা যায়? যখন জনগণ জানে ও বলে যে বর্তমান দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রধান দুই দলের কেউ তাদের পক্ষের দল নয়, বন্ধু নয়, বরং তাদের দুর্দশার মূল কারণ, তবু তারা যখন এদের কোনো একটিকে বেছে নেয় তখন এই জাতিগত আত্মহত্যাপ্রবণতাকে কী বলে আখ্যায়িত করা যায়? সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী নিরঙ্কুশ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই স্বাধীন দেশেও কেন এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দৃঢ়মূলে প্রোথিত হয়নি তার উত্তর হিসাবে তিনি বলেছেন—

> ... বাঙালীর জন্য ভাষাভিত্তিক পরিচয় প্রধান হয়ে ওঠার পথে অন্তরায় ছিল একাধিক। দূর অতীতেও এবং নিকট অতীতে তো বটেই, বাঙালী ছিল অবাঙালীদের অধীনে। রাজার ভাষা আর বাঙালীর ভাষা সে-জন্য এক হয়নি। বিত্তবান বাঙালীকে তাই দ্বি-ভাষী হতে হয়েছে, বাধ্য হয়ে। বিত্তহীন বাঙালীর পক্ষে অবশ্য কোনো ভাষাই আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি, মাতৃভাষাও নয়। [পৃ. ৪৬১]

এই বক্তব্যের প্রথম অংশের সঙ্গে একমত হলেও শেষ বাক্যটিকে মেনে নেওয়া যায় কি?

সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির পেছনে ইংরেজ-ইন্ধনের পাশাপাশি তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তকে দায়ী করেছেন। লিখেছেন:

> ... লোকজীবনে যে গণতান্ত্রিকতা, অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িকতা, ইহজাগতিকতা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও মৈত্রী এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে উষ্ণ বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিল মধ্যবিত্ত তাকে বিকশিত না-করে বরঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সম্প্রদায়ের ভিত্তিকে মধ্যবিত্তই

> বাঙালিকে বিভক্ত করেছে, যে বিভাজন এখনও মুছে যায়নি। [পৃ. ৩২৪]

এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায় না। তবে আরেকটি কথা বলা দরকার। মধ্যবিত্তের একাংশ, যারা বামপন্থি, যাদের প্রতি লেখকের পক্ষপাত সুস্পষ্ট, সেই বামপন্থিরা তো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের পতাকা সর্বশক্তিতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে, গত চুয়াত্তর বছর ধরে সকল সংগ্রামে জনগণের পাশে থেকেছে, সে-আন্দোলন জাতীয় হোক আর স্থানীয় হোক, তাদের ত্যাগ স্বীকারের সার্বিক পরিমাণ রূপকথাকেও হার মানায়, তারা জনগণের সকল সদর্থক বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকশিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু জনগণ তাদের গ্রহণ করেনি কেন? কেন তারা 'লড়কে লিয়ে লালঝাণ্ডা, ভোটকে লিয়ে কংগ্রেস' শ্লোগানে সর্বদাই তাদের কৃতঘ্ন চরিত্রের প্রমাণ রেখেছে? উত্তরে যদি একথাই বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার দিকেই, পশ্চাৎপদতার দিকেই, শোষককে চিনতে পেরেও তার অনুগত থাকার সংস্কৃতির প্রতিই জনগণের প্রাণের টান বেশি তাহলে কি বক্তব্যটি নিছক ফ্যাসিস্ট চিন্তা বলে উড়িয়ে দেবার অবকাশ আছে? অন্তত গত আড়াই শ বছরের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী *বাঙালির জাতীয়তাবাদ* নিয়ে সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। দৃঢ়তার সঙ্গে উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে,

> ... জাতীয়তাবাদ মানুষের জন্য কেবল যে আত্মপরিচয়ের অবলম্বন তা নয়, দাঁড়াবার জায়গাও বটে। ওইখানে দাঁড়িয়ে সে অগ্রাসী বিশ্বের মুখোমুখি হতে পারবে, আপনজনদের সঙ্গে নিয়ে, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে। [পৃ. ৪৭২]

বাঙালির জাতীয়তাবাদের বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন রিক্সাযোগে চলার পথে হঠাৎ-ই রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম—

> ...ভাই, আপনার জাতীয়তা কী? আপনি বাঙালি না বাংলাদেশী? রিক্সাওয়ালার নির্বিকার উত্তর— 'আমার বাপ জানে। বড়ভাইও জানলে জানতি পারে।

অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ এমন একটা বিষয় যা, ব্যক্তি অর্থে, জাতীয় অর্থেও বাপ-ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিলেও চলে। এটাই বাস্তবতা। শতভাগ না হলেও কাছাকাছি বাস্তবতা। সেক্ষেত্রে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এই অক্লান্ত পরিশ্রম-সৃষ্ট গ্রন্থ, এবং সেই সঙ্গে আমাদের লেখক-ভাবুকদের রচনাবলি কি নিছকই একাডেমিক-অনুশীলনের স্বাক্ষরমাত্র? একথা মেনে নিলে চিন্তাশীলতাকে হেয় এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মেনে নেওয়া হয়। এখন বরং সময়টা উল্টো। এখন চিন্তাশীলতার চাইতে মহার্ঘ্য এই দেশে আর কিছু নাই।

জাকির তালুকদার : জন্ম ২০ জানুয়ারি ১৯৬৫; কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। পেশা: চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তু পুরাণ* (১৯৯৭), *বিশ্বাসের আগুন* (২০০০), *কন্যা ও জলকন্যা* (২০০৩), *কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই* (২০০৬); উপন্যাস: *কুরসিনামা* (২০০২), *হাঁটতে থাকা মানুষের গান* (২০০৬), *বহিরাগত* (২০০৮), *মুসলমানমঙ্গল* (২০০৯), *পিতৃগণ* (২০১১); প্রবন্ধ: *গল্পপাঠ* (২০০১), *বাংলা সাহিত্যের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন* (২০০৩); কিশোর-রচনা: *চলনবিলের রূপকথা* (২০০৪); ছড়া: *তিনতিড়ি* (১৯৮৯), *নাইমামা কানামামা* (১৯৯৫)।

বইটির প্রাপ্তি উৎস: ইউপিএল, e-mail:upl@btcl.bd, upl@bangla.net

গদ্যমঙ্গল : কুষ্টিয়া যেখানে গদ্যময়

আদিত্য শাহীন

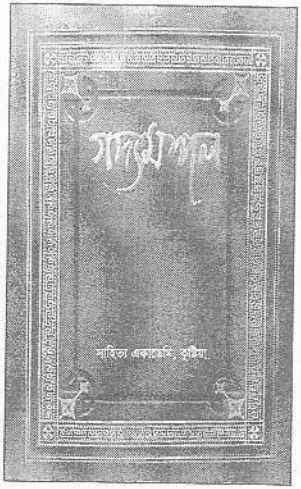

গদ্যমঙ্গল
বিলু কবীর
মতিউল আহসান
মিজান সরকার
প্রথম প্রকাশ: ২০১৩
সাহিত্য একাডেমি, কুষ্টিয়া
৭০০ টাকা
৫৭৬ পৃষ্ঠা

গদ্যমঙ্গল শক্ত বোর্ডে বাঁধাইকৃত পাঁচশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার ঢাউস একটি বই। শাদা চোখে দেখলে স্বভাব-বিবেচনায় এটি একটি গদ্য-সংকলন। ধর্মগ্রন্থের মতো মার্জিত-গম্ভীর এর প্রচ্ছদে ফ্রেমের নকশার ভেতর সোনালি ফয়েলের হস্তলিপিতে *গদ্যমঙ্গল* নামটি লেখা। এমনভাবে এর বহিরঙ্গ প্রস্তুত করা হয়েছে যে, প্রথম দৃষ্টিতেই এর প্রতি কৌতূহল জাগতে পারে। বিমূর্ত কিংবা অর্থহীন বাগাড়ম্বর এতে নেই, নেই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইশতেহার; সাহিত্যকে উদ্ধারের গালভরা অথচ দুঃসাহসী কোনো আহ্বানও এতে নেই। মলাট উল্টিয়ে কিছুদূর এগোলেই জানা যায়, এটি কুষ্টিয়া সাহিত্য একাডেমির একটি প্রকাশনা এবং এটি একাডেমির তৃতীয় প্রকাশনা-প্রয়াস। সম্পাদক হিসেবে নাম রয়েছে তিনজনের। তাঁরা হলেন মতিউল আহসান, মিজান সরকার ও বিলু কবীর। এতে যে পরিশ্রমের ছাপ রয়েছে তা বৃহদায়তন এই সংকলনটি উল্টেপাল্টে দেখলেই অনুভব করা যায়। সম্পাদকীয় ভাষ্যটি লিখেছেন বিলু কবীর। প্রথমোক্ত দুজন সম্পাদকের মধ্যে একজনের (মিজান সরকার) পরিচয় পাওয়া যায় সংকলনের হওয়ার লেখক

সুবাদে পেছনে পরিচিতি যুক্ত হওয়ার কারণে। প্রথম জন মতিউল আহসানের নামটুকুর বাইরে তাঁর সম্পর্কে পরিচিতিমূলক কোনোকিছু সংকলনটির কোথাও নেই। কেবল এই ওজনদার সংকলন প্রকাশের স্বপ্ন ও তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবতার গল্প জেনে নেয়া যায় এর অন্যতম সম্পাদক বিলু কবীরের জবানিতে।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সাংবাদিকতা, সাহিত্য কিংবা রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুশো বছরেরও বেশি দিনের ইতিহাস কুষ্টিয়ার সচেতন সমাজে উচ্চারিত হয়। সুতরাং, সে-বিবেচনায় *গদ্যমঙ্গল*-এ কুষ্টিয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাম্প্রতিকতম গবেষণা ও গদ্যচর্চা মলাটবদ্ধ হবে এমন একটি ভাবনা প্রাথমিকভাবে মনে জাগে। আরো জোরদার হয়ে ওঠে কুষ্টিয়ায় জন্ম নেয়া ব্যক্তির লেখা বা কুষ্টিয়া-প্রাসঙ্গিক কিছু রচনা এতে প্রকাশিত হওয়ায় বিবেচনাটি। কিন্তু সংকলনের সকল রচনা পাঠ করে দেখা গেল *গদ্যমঙ্গল*-এর পরিসীমা শুধু কুষ্টিয়ার ভেতরেই সীমাবদ্ধ তো থাকেইনি বরং প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাতের 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌলবাদ ও মনোদারিদ্র্য' থেকে শুরু করে অজয় কুমার বিশ্বাসের 'পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঝুঁকি'র মতো জনগুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আলোচিত ইস্যুও রয়েছে। রয়েছে ড. সৈয়দা আইরিন জামানের 'একুশ শতকে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা', ড. তপন বাগচীর 'বাংলা গানে ঘাটের কথা', ড. সোহেলী নার্গিসের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম দলিল 'রাইফেল রোটি আওরাত'-এর মতো বিষয়ের গুরুত্বে উজ্জ্বল ও ভারী গবেষণাধর্মী রচনা। সবমিলিয়ে এখানে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসংখ্যা ৪১। এর বাইরে রয়েছে ১৫টি গল্প, ১টি নাটক ও ১টি সাক্ষাৎকার। এর লেখকদের সম্পর্কে জানা গেল যে তাঁরা সকলেই কুষ্টিয়াবাসী নন বা কুষ্টিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নন। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে, এটি কি শুধুই একটি সাহিত্য সংকলনমাত্র? না-কি এর সম্পাদকীয় চিন্তায় কোনো লিটলম্যাগাজিনীয় প্রবর্তনা ছিল? সম্পাদকীয় ভাষ্যে অবশ্য এর কোনো জবাব মেলে না। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে কুষ্টিয়ার প্রথম শহীদ আব্দুর রাজ্জাককে।

কুষ্টিয়া এই সংকলন-উদ্যোগের কেন্দ্র-প্রসঙ্গ। কুষ্টিয়ার সন্তানদের মধ্যে যাঁরা দেশব্যাপী পরিচিত সাহিত্যিক, গবেষক, নাট্যকার কিংবা অন্যপেশায় প্রতিষ্ঠিত তাঁরাই প্রধানত এর লেখক। কিন্তু সম্পাদকেরা সংকলনের সম্পন্নতা-বিচার করে সংকলিত রচনার তথ্যগুলোকে হালনাগাদ করেননি বা পূর্ববর্তী গবেষণার সম্পূরক রচনা অন্তর্ভুক্ত করেননি। এমনকি সম্পূরক রচনা না দিয়ে টীকা-টিপ্পনি দ্বারাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতাগুলোকে নির্দেশ করে দেয়া যেত। সূচিপত্রে গবেষণামূলক প্রবন্ধ, মুক্তগদ্য কিংবা নিছক রচনা বা প্রবন্ধ আলাদাভাবে বিন্যস্ত না হওয়ার কারণে প্রবন্ধ-সারিতে বিচিত্রস্বাদের লেখা একাকার হয়ে যাওয়ায় অনেক রচনাই তাৎপর্য হারিয়েছে। দীপংকর চক্রবর্তীর 'উৎসবের সামাজিকতা', শুকদেব সাহার 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে', রফি হকের 'নস্টালজিয়ার অনুস্মৃতি', আনিস উল ইসলামের 'বিশ্বশান্তির অন্বেষণে' শীর্ষক রচনাগুলো বিষয় ও প্রেক্ষাপট বিচারে নিজস্ব চিন্তা ও মতামতধর্মিতার কারণে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি শুধু রবীন্দ্রনাথকে বিষয় করেই এসেছে ড. আখতার উদ্দিন মানিকের 'শাহজাদপুর:

সংস্কৃতির স্মৃতি সন্তাপ', আলম আরা জুঁইয়ের 'রবীন্দ্রস্বজন : অনালোকিত কয়েকজন বিদূষী', ড. অনীক মাহমুদের 'রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীপ্রীতি', ড. সৈয়দা আইরিন জামানের 'একুশ শতকে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা' প্রভৃতি রচনা। সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এসেছে নাসিমা আনিসের 'গল্প নিয়ে কথা', মাসুম রেজার 'নাটক রচনাশৈলী', দীপু মাহমুদের 'বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে রাজনৈতিক ভাবনা', আনজীর লিটনের 'ছড়ায় চাই নতুন মত ও পথ', ড. মাসুদ রহমানের 'ছোটগল্পের সমাপ্তি'।

আশির দশকে শ. ম. শওকত আলী রচিত গবেষণাগ্রন্থ 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস', ড. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য', কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরির প্লাটিনাম জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংকলনের পর কুষ্টিয়া সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এক মলাটে বন্দী হয়েছে। কিছু কাজ পুরনো ও ইতিহাসের অংশমাত্র, কিন্তু কিছু গবেষণা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গল্পকার মোসাদ্দেক আহমেদ সম্ভবত *গদ্যমঙ্গল*-এ-ই অতলসন্ধানী এক গবেষক হিসেবে ধরা দিয়েছেন। মরমি সাধক লালন সাঁই নিয়ে এ পর্যন্ত বহু কাজ হয়েছে। কিন্তু তা থেকে লালনের চিত্ত ও চেতনা, ভাব ও সাধনা, এমনকি মানবধর্মের গভীর জলাঙ্গিতে অবগাহন করা বড় কঠিন। চিন্তকের নিজস্ব প্রবণতা সেখানে থাকে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রূপে, না রসে মুগ্ধ হচ্ছেন সেটি বড় বিষয়। জীবনের নানান অধ্যায় ও কাজের ফিরিস্তিই বেশি চান অনুসন্ধানীরা। বাণিজ্যিক হিসেবেও মনীষীর জীবনের বাহ্যিক দিক আর বাহ্যিক কাজগুলোই সহজবোধ্য। বড় কাজগুলো গবেষক ছাড়া সাধারণকে টানে কম। জাহিরী ও বাতেনি বলে যে দুটি ভিন্ন অভিধা লালন নিজেই বাতলে দিয়ে গেছেন, তার প্রথমটির চর্চাই বেশি চলছে শুরু থেকে। এবার এক ব্যতিক্রমের সন্ধান পাওয়া গেল। কথাসাহিত্যিক মোসাদ্দেক আহমেদের ভিন্নতর লালন বয়ান 'সাধু শাস্ত্রের আলো আঁধারি' কয়েক পৃষ্ঠায় শেষ হওয়া একটি প্রবন্ধ। কিন্তু তার মধ্যেই লালনের ভাবজগৎ, লালনধর্মের নির্জলা এক রূপ পাওয়া যায়। একে প্রচলিত গবেষণা বলা যাবে না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ঘাঁটাঘাটি কিংবা তথ্যসূত্রের দীর্ঘকায় অবয়ব বা চিহ্ন নেই লেখাটির শেষে। অতএব এটি মৌলিক চিন্তামালা আর সাধনজগতের বাস্তবতার মিহি মিশ্রণ, যা অনুরাগীকে গভীরতার দিকেই টানবে।

কুষ্টিয়ার লোক-সংস্কৃতির বিপন্ন, বিলুপ্তপ্রায় ও অতি প্রচলিত বিষয়গুলো মাত্র এগারো পৃষ্ঠার একটি বুনোট গবেষণায় তুলে ধরেছেন ড. মুন্সি আবু দাউদ। লোক-গবেষক সাইমন জাকারিয়ার কুষ্টিয়ার লোকসঙ্গীত বিষয়ক লেখাটি সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর কাজটি পরিপূর্ণ এই অর্থে যে, অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে যুগে যুগে এই ভূখণ্ডের সঙ্গীতসাধনার গভীর সম্পর্ক তুলে ধরেছেন তিনি। এক্ষেত্রে লোকসংগীতের উপযোগিতা বিচারে স্থান, কাল ও পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন।

আরেকটি বড় কাজ করেছেন ড. সরওয়ার মুর্শেদ। তিনি এ যাবৎকালে প্রকাশিত কুষ্টিয়ার সাহিত্যপত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনের একটি সুদীর্ঘ তালিকা তুলে ধরেছেন। অবশ্য ডক্টর মুর্শেদ কুষ্টিয়ার সাহিত্যআন্দোলনের প্রবণতা, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সাহিত্যপত্রিকার প্রভাব, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার প্রেক্ষাপটগুলোর সবিস্তার কোনো ব্যাখ্যায় যাননি। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ তালিকায় ১৮৮৩ সালে কুমারখালী থেকে প্রকাশিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদার

সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত অন্তত দেড় শতাধিক লিটল ম্যাগাজিন ও সাহিত্যপত্রিকার নাম, প্রকাশকাল, সম্পাদক ও লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনায় কুষ্টিয়ার অবদানকে চিহ্নিত করা সহজ হবে।

গদ্যমঙ্গল-এ একাধিক গবেষণামূলক লেখায় তথ্যসূত্রের উল্লেখ নেই। এটি নিশ্চয়ই মুদ্রণজনিত কোনো সংকট নয়, বরং লেখকই তথ্যসূত্রের দায় এড়িয়ে গিয়ে তাঁর শ্রমলব্ধ কাজটিকে খাটো করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আলম আরা জুঁই-এর 'রবীন্দ্রস্বজন : অনালোকিত কয়েকজন বিদূষী' এবং লালিম হকের 'পলাশীর যুদ্ধ অতঃপর

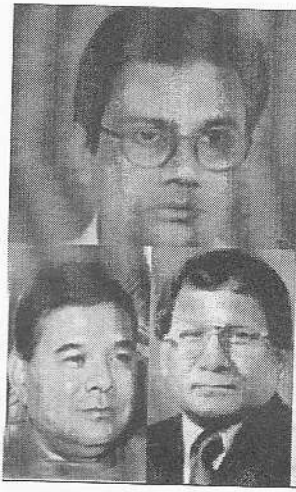

এই ধরনের সংকলনগ্রন্থ আমরা হামেশাই দেখে থাকি। এগুলোর উৎকর্ষের নমুনা যে খুব বেশি পাওয়া যায় তা নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উদ্যোগ নির্ভর করে সাংগঠনিক তৎপরতার ওপর এবং সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের অর্থ সরবরাহের ওপর। কিন্তু অর্থ যা ব্যয় হয় তা পেশাদারিত্বের সঙ্গে হলে, উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার সঙ্গে পেশাদারিত্বের দিকটি যোগ হলে সংকলনগুলো হয়ে উঠতে পারে উৎকৃষ্ট সামাজিক ইতিহাস ও সৃষ্টিশীলতার আকর উৎস।

বিলু কবির, মতিউল এবং মিজান সরকার

প্যারিসুন্দরীর বাংলাদেশ', মো. এনামুল আযীমের 'বলরামহাড়ি: মেহেরপুরের ব্রাত্যজন সাধক' লেখাগুলোর কথা। একইভাবে সিকদার আবুল বাশার এর 'বেভারিজ : বাকরগঞ্জ মূল্যায়ন' রচনাটি *দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ : ইটস হিস্টরি এণ্ড স্ট্যাটিসটিক্স* গ্রন্থের সুন্দরবন অধ্যায় থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু লেখাটি প্রকাশের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা না করার কারণে বিষয়টি অপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। আকস্মিকভাবে কোনো পাঠক এটি পুনঃপ্রকাশের কারণ ও সঙ্গতি খুঁজে পাবেন না। বিশেষ করে কুষ্টিয়া-যশোরের প্রাচীন ভূপ্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে একসময়ের বাকেরগঞ্জ অর্থাৎ বরিশালের কোনো যোগসূত্র পাঠক খুঁজে পারেন না।

গদ্যমঙ্গল-এর সিংহভাগ অনেকটা একাডেমিক গবেষণাপত্রের মতো। সেক্ষেত্রে ছন্দপতন হতে পারে গল্পাংশ। গভীর কিছু গবেষণার পথ পার করে সরল গদ্যের গল্প পড়তে গিয়ে পাঠকের মূল্যায়ন পাল্টে যেতে পারে। কিছু গল্প সংকলনভুক্ত কেন করা হলো এর উত্তর পাওয়া মুশকিল। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক সুশীল বসুর আট বছর আগের সাক্ষাৎকারটি *গদ্যমঙ্গল*কে

বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। তাঁর জীবনের সহজ কথামালার ভেতর দিয়ে একটি সময়, শিল্পীর নিজস্ব অহংকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন মহৎ শিল্পীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সংগীতের জন্য সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন জীবনের আখ্যান এতে উঠে এসেছে। বলা যেতে পারে শিল্পীর প্রতি ন্যায্য আচরণ বা মূল্যায়নের তাগিদ পূর্ণ করেছেন বিলু কবীর ও ড. সরওয়ার মুর্শেদ।

লালন-রবীন্দ্রনাথ, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, মীর মশাররফ হোসেন, জলধর সেন, বিপ্লবী বাঘা যতীন থেকে শুরু করে বহু মনীষীর সৃষ্টিকর্ম যুগ যুগ ধরে এ জেলার মানুষকে অন্য এক গর্বে ভরে রেখেছে। সৃষ্টি, দেশপ্রেম, সাহিত্যপ্রীতি, সমাজভাবনা, মানবপ্রেম কিংবা আধ্যাত্মজগৎ সবই এখানকার মানুষের অতি চেনা পথ। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা, জনসংখ্যা, জীবন সংকট, সর্বোপরি সার্বিক নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠার কারণে সংগঠনভুক্ত সাহিত্য উদ্যোগের স্বর্ণসলতে যখন সারা দেশে নিবু নিবু করছে ঠিক তখন বেরিয়েছে *গদ্যমঙ্গল*। সাহিত্য একাডেমি, কুষ্টিয়া এর আগে ২০১০ সালে কাব্য সংকলন *অপনিহিতি* প্রকাশ করে। এছাড়া তাদের রয়েছে অনিয়মিত সাহিত্যপত্রিকা 'শুদ্ধস্বর'। সবমিলিয়ে তাদের প্রকাশনা বিষয়ক একটি সচল উদ্যোগের সন্ধান পাওয়া যায়। সবকিছু যখন কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন প্রান্তমুখি এই উদ্যোগ অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করছে। তারপরও জিজ্ঞাসা, পুরোপুরি কুষ্টিয়ার প্রতিনিধিত্ব থাকলে তা কি অপূর্ণ হতো? সেক্ষেত্রে আকার হয়তো কিছুটা কমতো, কিন্তু আকরের সন্ধান মিলতো।

গদ্যমঙ্গল-এ যা আছে, তার মূল্য রয়েছে। অনেকগুলো ক্ষেত্রে এসেছে নতুন অভিনিবেশ। পাশাপাশি *গদ্যমঙ্গল*-এ যা নেই, তা হলো আজকের সমাজ ও জীবন বাস্তবতা বিবেচনায় নতুন কোনো বিষয়ের উদ্ভাবন, নতুন কোনো গবেষণা ও নব্য আবিষ্কৃত কোনো তথ্য বা তত্ত্ব। পাশাপাশি বিষয়ের ভিন্নতায় পৃথক পৃথক অধ্যায় সৃষ্টি করার যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও সবরকমের লেখাই গড়পড়তা মিশিয়ে-কুশিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, যা অনুসন্ধানী পাঠকের কাছে অসংলগ্ন মনে হতে পারে। এছাড়া *গদ্যমঙ্গল* পড়তে গিয়ে বারবারই তাগিদ বোধ হয়েছে সুদীর্ঘ একটি ভূমিকা'র, যা এমন একটি প্রকাশনার যৌক্তিকতা, প্রেক্ষাপট, কুষ্টিয়া সাহিত্য একাডেমি'র কার্যক্রম, কুষ্টিয়া জেলার ঐতিহাসিক কিছু বিবর্তন, আজকের বাস্তবতাকে বুঝতে সাহায্য করতো।

পরিশেষে বলা দরকার, এই ধরনের সংকলনগ্রন্থ আমরা হামেশাই দেখে থাকি। এগুলোর উৎকর্ষের নমুনা যে খুব বেশি পাওয়া যায় তা নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উদ্যোগ নির্ভর করে সাংগঠনিক তৎপরতার ওপর এবং সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের অর্থ সরবরাহের ওপর। কিন্তু অর্থ যা ব্যয় হয় তা পেশাদারিত্বের সঙ্গে হলে, উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার সঙ্গে পেশাদারিত্বের দিকটি যোগ হলে সংকলনগুলো হয়ে উঠতে পারে উৎকৃষ্ট সামাজিক ইতিহাস ও সৃষ্টিশীলতার আকর উৎস।

আদিত্য শাহীন: জন্ম ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। কবি। পেশা: সাংবাদিকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *জনভাষ্য (বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কিত বার্ষিক সংকলন)* (২০০৬-২০১৪), *ভেবলুর গালিভার* (২০০৭) [ছোটদের গল্প], *ওগো মোর দেহ প্রভু* (২০১০) [কবিতা]

বইটির প্রাপ্তি উৎস: গতিধারা; ৩৮/২ খ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ফোন :৭১১৭৫১৫, ৭১১৮২৭৩
email: gatidhara@yahoo.com

ব্যাকরণের সদর ভাষার অন্দর

মোহাম্মদ আজম

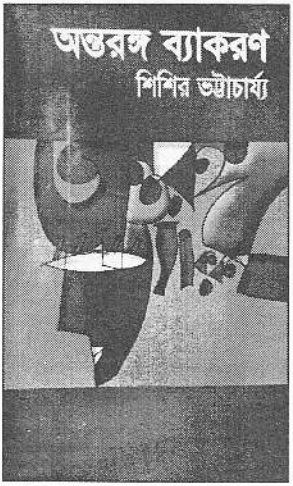

অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ
শিশির ভট্টাচার্য্য
নবযুগ প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৮০ টাকা
পৃষ্ঠা ২১৬

শিশির ভট্টাচার্য্য তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সংকলনের নাম রেখেছেন *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ*। এই নাম আমার মনে ধরেছে। ব্যাকরণ আসলে ভাষার অন্দরমহলের আলোচনা—এ কথাটা মেলাদিন ধরে আমার মাথায় গেঁথে আছে। পয়লা সবক পেয়েছিলাম বাংলা ব্যাকরণচর্চার এক নম্বর ওস্তাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইতে 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' নামে একটা প্রবন্ধ আছে। সেখানে এক জায়গায় ওস্তাদজি লিখেছেন:

> আমাদের ইস্কুলে-শেখা ইংরেজিতে ভুল হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে-বিদ্যা পুঁথিগত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজি ভাষার ঠিক মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য অনেক খাঁটি ইংরেজের ন্যায় তাঁহারা হয়তো ব্যাকরণে ভুল করিতেও পারেন, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এ দেশে থাকিয়া যাঁহারা ইংরেজি শেখেন, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে বাঁচাইয়াও ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না। ইংরেজগণ তাহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন।

রবীন্দ্রনাথ এখানে ঝিকে মেরে বউকে শিখিয়েছেন। ইংরেজির উদাহরণ দিয়ে আসলে বাংলার কথা

বলেছেন। তাঁর শিক্ষাটা আমার জন্য কাজের হয়েছে। কাঠামোবদ্ধ ব্যাকরণচর্চায় ভাষার 'অন্তরঙ্গ' পরিচয়টা ধরা পড়ে না; বাইরের স্বভাবটা চিহ্নিত হয় মাত্র। তত্ত্বীয়ভাবে কথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো ইউনিভার্সেল বা সামান্য কাঠামোয় বিশেষ ভাষা পড়া যায় কিনা, সে প্রশ্নই এখানকার গোড়ার প্রশ্ন। বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনে প্রশ্নটা আরো জরুরি। কারণ, বাংলা প্রথম থেকেই সংস্কৃত ও ইংরেজির আধিপত্যে পঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পরে আরেকবার আসব।

অন্তরঙ্গ ব্যাকরণের আরেক প্রস্ত শিক্ষা পেয়েছি মহামতি হকেটের কাছে। Charles F. Hockett তাঁর *A Course In Modern Linguistics* গ্রন্থে একে ব্যাখ্যা করেছেন 'Surface and Deep Grammar' নামে। এক জায়গায় লিখেছেন:

> In the preceding eight sections we have been discussing grammar largely in terms of constructions. ... But the specification of the forms and constructions in a sentence does not always tell everything of grammatical relevance about the sentence. A pair of forms in a sentence which do not stand in construction with each other may nevertheless be tied together, in a rather different way.

এই ভিন্নতাটা বিচার-বিশ্লেষণ করার নামই হবে 'অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ', আমার বিবেচনায় যা 'আসল ব্যাকরণ'—রবীন্দ্রনাথ বা হকেটের আশকারা পেয়ে এরকম একটা ধারণা আমার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এ কারণেই শিশির ভট্টাচার্য্যের বইয়ের নাম *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ* দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। তবে *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ* আমার অনুমান মোতাবেক রচিত গ্রন্থ নয়; আর তা হওয়ারও কোনো কারণ নাই। শিশির ভট্টাচার্য্য তাঁর নিজের অনুমান ও রুচিকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি 'অন্তরঙ্গ' নামের পক্ষে দুই কিস্তি কৈফিয়ত দিয়েছেন। প্রথমটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণ আগে, নাকি ভাষা আগে—এই কূটতর্ক আস্তে করে সরিয়ে রেখে তুলনামূলকভাবে কম-চলতি ধারণা প্রস্তাব করেছেন তিনি। প্রতিটি ভাষা প্রকাশ্যরূপের আড়ালে নিজ নিজ ব্যাকরণ মোতাবেকই কাজ করে। ভাষা-ব্যবহারকারী সেই ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকুক চাই না থাকুক, তার উচ্চারিত শব্দ-বাক্য সেই ব্যাকরণ মেনেই তৈরি হয়। আবার যিনি তা শোনেন, তিনিও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই ব্যাকরণ মেনেই শোনেন-বোঝেন। ফলে ব্যাকরণ হল 'ভাষার অন্তর্নিহিত কাঠামো'। এই অর্থে সব ব্যাকরণই আসলে 'অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ'। এই ধারণার সাথে রবীন্দ্রনাথ বা হকেটের পূর্বোক্ত ধারণার খানিক মিল আছে। দ্বিতীয় কৈফিয়তটি তত্ত্বীয়ভাবে অত গুরুতর নয়; কিন্তু লেখার ভঙ্গি বা উপস্থাপনের ঢঙের দিক থেকে মূল্যবান। ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলো তিনি উপস্থাপন করেছেন যথাসম্ভব অন্তরঙ্গভাবে। কাজেই নাম রেখেছেন *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ*।

গ্রন্থটি পড়ে মনে হয়েছে, তাঁর প্রথম কৈফিয়ত বাস্তব হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ লেখাগুলোতে ভাষা-ব্যাখ্যার কাঠামোগত দিকটা যত প্রাধান্য পেয়েছে, আলোচিত প্রধান ভাষা বাংলার 'অন্তরঙ্গ' পরিচয় সে-অনুপাতে মনোযোগ পায়নি। আদতে সমস্যাটা ঠিক মনোযোগ দেয়া বা না দেয়ার নয়; ভাষা-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির সাথেই ব্যাপারটা সম্পর্কিত। শিশির ভট্টাচার্য্য 'ভাষাবিজ্ঞান' চর্চা করেন। বাংলা তাঁর 'ভাষাবিজ্ঞানচর্চা'র কাঁচামাল। বিশেষভাবে বাংলা

ভাষাচর্চার জন্য তিনি 'ভাষাবিজ্ঞানে'র দ্বারস্থ হন না। আমাদের এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর নিজের সংজ্ঞা অনুসারেই এই গ্রন্থ বাংলা ভাষার 'অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ' হতে পারে না। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় দাবিটি যথার্থ। ভাষাবিজ্ঞানের অতি জটিল কিছু ধারণা তিনি সরস ভঙ্গিতে আন্তরিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ গুণ দেখা গেছে পুরানা মুহম্মদ আবদুল হাই আর পরবর্তী হুমায়ুন আজাদের লেখায়। তাঁদের দুজনের তুলনায় শিশির ভট্টাচার্য্যের গোছগাছ সম্ভবত কয়েক চিমটি কম — বিশেষত হুমায়ুন আজাদের তুলনায়; কিন্তু ভঙ্গির আন্তরিকতা, সরস উপস্থাপন আর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভট্টাচার্য্য সম্ভবত বাকিদের ছাড়িয়ে গেছেন।

২

অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থে সাকুল্যে দশটি প্রবন্ধ আছে। শিরোনাম যথাক্রমে 'কী আছে শব্দকোষে?', 'শব্দ কিভাবে গঠিত হয়?', 'রূপতত্ত্বের বিভিন্ন মডেল ও অখণ্ড রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', 'ইস্কুলে হাসতো সন্ত্রস্ত বাঘ: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যালোচনা', 'সঞ্জননী বাক্যবিন্যাসের রূপরেখা', 'বাংলা নামবর্গের আন্তর্গঠন', 'চিহ্নবিজ্ঞান ও অর্থতত্ত্ব', 'বাংলা অবধারকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', 'ফরাসি নামশব্দের লিঙ্গ', 'বাংলা ভাষা কি সংস্কৃতের দুহিতা?'।

'সঞ্জননী বাক্যবিন্যাসের রূপরেখা' আর 'চিহ্নবিজ্ঞান ও অর্থতত্ত্ব' প্রবন্ধ দুটি পরিচিতিমূলক। কাজটা লেখক ভালোভাবেই করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ নাই, কিন্তু কৌতূহল আছে — এমন পাঠকের উপযোগী ভাষা আর ভঙ্গিতে প্রবন্ধগুলো রচিত। আমি নিজে এই গোছের পাঠক বলে নির্দ্বিধায় এই সাফাই গাইতে পারি। হুমায়ুন আজাদ তাঁর *বাক্যতত্ত্ব* গ্রন্থের ভূমিকায় সাবধান করে লিখেছিলেন, অদীক্ষিত পাঠকদের এই এই পরিচ্ছেদ দুরূহ মনে হবে এসব কথা। শিশির ভট্টাচার্য্য এ ধরনের সাবধানবাণীর দরকার বোধ করেননি। তিনি আনাড়িদের জন্যই লিখেছেন। ভঙ্গির মধ্যে সারল্য আর বোঝানোর চেষ্টা খুব স্পষ্ট। বলা যায়, উদ্দেশ্য-পূরণে তিনি ব্যর্থ হননি। বিশেষত 'চিহ্নবিজ্ঞান' অংশের আলোচনা প্রাঞ্জল বিবরণের আদর্শ হিসাবে গণ্য হতে পারে। অর্থতত্ত্ব-সম্পর্কিত আলোচনায় অবশ্য একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। তিনি থেমেছেন যথেষ্ট আগে। উত্তর-কাঠামোবাদী তাত্ত্বিকেরা গত কয়েক দশকে অর্থবিজ্ঞান নিয়ে যেসব টানাহেঁচড়া করেছেন, তিনি তার ধারেকাছেও ঘেঁষেননি। হুমায়ুন আজাদ *অর্থতত্ত্ব* নামে যে কেতাব লিখেছিলেন, তাতেও একই কাহিনি। শিশির ভট্টাচার্য্য অবশ্য অর্থবিজ্ঞানের আগাপাশতলা তুলে আনবেন এমন কোনো কথা দেননি। আগেই বলা হয়েছে, তাঁর এই প্রবন্ধটি পরিচিতিমূলক। তিনি প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ধারার পরিচয় দিয়েছেন। তারপরও কথাটা তোলা প্রয়োজন এই কারণে যে, কাঠামোবদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অর্থ সবসময়েই হাজির হয় মূর্তিমান ত্রাস হয়ে। অর্থকে তো আর কাঠামোয় আঁটানো যায় না। অথচ অর্থের বিচিত্র সম্ভাবনার মধ্যেই ভাষাবিশেষের বিশিষ্টতার গভীর-গোপন দিকগুলো লুকিয়ে থাকে। বিশ্লেষণের কাঠামো বা পদ্ধতির মধ্যে অর্থকে আঁটানো মুশকিল, আর অর্থের নিগূঢ় পরিচয় ছাড়া ভাষার

অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে না — এই ঝামেলায় খোদ 'ভাষাবিজ্ঞান' প্রশ্নবিদ্ধ হয় কি না কে বলবে? রবীন্দ্রনাথ কেন অর্থের হদিশ না নিয়ে এমনকি ধ্বনির আলোচনাও করতে চাইতেন না, আর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ প্রশিক্ষিত ভাষাতাত্ত্বিককুল কেন পারতপক্ষে অর্থতত্ত্বের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছেন, কিংবা বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিকেরা সাধারণভাবে অর্থতত্ত্বের আলোচনায় কেন প্রধানত ব্যুৎপত্তির চর্চা করেছেন, তা বিশদভাবে খতিয়ে দেখা সম্ভবত লাভজনক হবে।

প্রথম তিনটি প্রবন্ধের বিষয় ও বিন্যাসে নানা ধরনের মিল আছে। তিনটিই শব্দ, রূপ বা শব্দরূপ-সম্পর্কিত। প্রবন্ধ তিনটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল, আলোচ্য বিষয়ের উপর সামগ্রিক ধারণার বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী। গত আড়াই হাজার বছরে পুব বা পশ্চিমে ভাষাব্যাখ্যার যেসব প্রণালিপদ্ধতি বিকশিত হয়েছে, সেগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক বয়ান আছে প্রবন্ধ তিনটিতে। ভঙ্গির সরসতা অক্ষুণ্নই থেকেছে। কিন্তু এগুলোর লক্ষ্য প্রাথমিক ধরনের পরিচয়-প্রদান নয়। লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উঁচু এবং গভীর তলগুলো ভালোভাবেই স্পর্শ করেছেন। বিভিন্ন প্রণালিপদ্ধতির মধ্যে নিজের পক্ষপাতের এলাকাগুলোও গোপন করেননি। বাংলাভাষী ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ভঙ্গিতে আলোচনা করেন হুমায়ুন আজাদ বা প্রবাল দাশগুপ্ত। সমগ্র বিষয়ের উপর প্রচণ্ড অধিকারের একটা ভঙ্গি এঁদের রচনায় পাওয়া যায়, যা একই সাথে ঈর্ষণীয় আর আকর্ষণীয়। আমাদের পুবদেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক দারিদ্র্যের মধ্যে এ বস্তু খুব সুলভ নয়। আমরা সাধারণত ছোট এলাকার সাথে পরিচিত হই, আর তার সীমায় খুব সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে লেখালেখি করি। লেখার মধ্যে হীনম্মন্যতাটা ফুটে ওঠে। বোঝা যায়, লেখকের জানা এলাকার বাইরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক কিছু রয়ে গেছে। আমাদের একাডেমিক দারিদ্র্যের মধ্যে এ রকম হওয়া খুব অস্বাভাবিকও নয়। শিশির ভট্টাচার্য্য এ ধরনের হীনম্মন্যতা থেকে মোটামুটি মুক্ত। স্থানের দিক থেকে দুনিয়ার পুরো মানচিত্রই তাঁর এলাকা, কালের দিক থেকে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত। ফাঁক-ফোকরে অনেক কিছুই হয়ত বাকি থেকে যায়; কিন্তু আত্মবিশ্বাসের প্রবলতায় পাঠক প্রশ্ন না তুলেই লেখকের সাথে আগাতে থাকেন। ভঙ্গিটার সঙ্গে লেখকের গরিমা ও প্রত্যয়ের যোগ আছে, কিন্তু এর উৎস নিঃসন্দেহে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণজাত আত্মবিশ্বাস।

রূপতত্ত্বের বিভিন্ন মডেল আলোচিত হলেও প্রবন্ধগুলোতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে 'অখণ্ড রূপতত্ত্ব'। রাজেন্দ্র সিং আর অ্যালান ফোর্ড 'Whole Word Morphology' নামের এই নতুন রূপতত্ত্বের প্রস্তাব করেন ১৯৯০ সালে। শিশির ভট্টাচার্য্য এই প্রস্তাব অনুসারে বাংলা রূপতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন তাঁর পিএইচ ডি থিসিসে। থিসিস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে (*Word Formation in Bengali: A Whole Word Morphological Description and Its Theoretical Implications, Lincom* Europa, Munchen, 2007)। এই বইতে আমাদের চেনাজানা পদ্ধতির বাইরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাংলা রূপতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ভিন্নতার দিক থেকে পদ্ধতিটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু কী কারণে 'আণবিক মডেল' বাদ দিয়ে এই 'অখণ্ড রূপতত্ত্ব' অনুসরণ করা হল, তার ব্যাখ্যা বোধ করি অতটা মাননীয় হয়ে ওঠেনি। অন্তত বাংলা ভাষা থেকে যেসব উদাহরণ শিশির ভট্টাচার্য্য দিয়েছেন, তা আমার

কাছে নানা কারণে গোলমেলে মনে হয়েছে। এখানে দুটি কারণের কথা বলতে চাই। এক. বাংলা শব্দের অণু-অংশগুলো — উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি — সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রচণ্ড চাপে নির্দিষ্ট রূপই পায়নি, বিধিবদ্ধভাবে বিশ্লেষিত হওয়া দূরের কথা। এমতাবস্থায় এ রূপগুলোর উপর ভিত্তি করে যদি 'আণবিক মডেলে'র সীমাবদ্ধতা নির্দেশিত হয়, তাহলে তা খুব ন্যায্য হয় না। যেমন বাংলা ভাষা-বর্ণনায় 'ষ্ণিক' প্রত্যয়টি উল্লিখিত হতে পারে কেবল সংস্কৃত আর বাংলাকে একাকার করে ফেললে। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে এরকম করা হয়, এবং শিশির ভট্টাচার্য্যও করেছেন। আমরা পরে দেখব, উনিশ শতকে সংস্কৃতায়নের প্রচণ্ডতা বাংলা ভাষা-বর্ণনায় যে নজিরবিহীন সংকট তৈরি করেছে, তিনি তা মোটেই আমলে আনেননি। আনা দরকার ছিল। অন্তত বাংলা ভাষার সনাতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যদি 'অখণ্ড রূপতত্ত্বে'র যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে হয়, তাহলে আগে ভাষাটি যে 'আণবিক মডেলে' নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, তা দেখানো দরকার। বলা জরুরি, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই তা হয়নি। দুই. ভাষা-ব্যবহারকারী হিসাবে আমার কাছে উপযোগিতার প্রশ্নটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 'অখণ্ড রূপতত্ত্বে'র মডেলে বাংলা ভাষা বিশ্লেষিত হলে কার কী লাভ? তত্ত্বীয়ভাবে তা লাভজনক হতেও পারে। কিন্তু ব্যবহারকারীর দিক থেকে এতগুলো সূত্র (শিশির ভট্টাচার্য্যের উপরিউক্ত গ্রন্থে বার শতাধিক সূত্র আছে) লাভজনক হবে বলে মনে হয় না। বরং খুব নিবিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ হলে কথিক 'আণবিক মডেল' অনেক লাভজনক। 'ইক' প্রত্যয়যোগে 'দৈনিক'-এর মতো 'মৈনিক' হয় না বটে, কিন্তু আরো অনেক কিছু হয়। যেমন, 'চৈনিক' হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কণ্ঠস্বরগোষ্ঠীর গদ্যকারেরা, বা আহমদ শরীফ যে 'ইক' প্রত্যয়ান্ত শব্দ দিয়ে বাংলা ভাষাকে একদা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলেন, তার আশকারা তো তাঁরা পেয়েছিলেন ওই ব্যাকরণ থেকেই। মুশকিল হল, উপসর্গ হোক, আর প্রত্যয়-সমাস হোক — ব্যবহারকারীর দিক থেকে ভাষার আর্থস্তরের সঙ্গে যোগ না ঘটলে কিছুই সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিশির ভট্টাচার্য্য তাঁর 'বিজ্ঞান'-এর অনুরোধে অর্থকে জায়গা দিতে নারাজ। তিনি জানেন, ভাষা শুধু শরীরী উপাদান নয়। মন-রূপ অর্থ তার নিত্য সহচর। তিনি জানেন, ভাষা একটি 'অতিমানবিক' ব্যাপার। যুক্তির মতো 'মানবিক ভাষা' দিয়ে তাই ভাষাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা দুরূহ। কিন্তু পদ্ধতিগত প্রশ্নে তিনি ছাড় দিতে নারাজ। ফলে 'বিজ্ঞান' রক্ষা করতে গিয়ে 'ভাষা' অংশে ছাড় দিতে হচ্ছে কিনা তা ভাববার বিষয়।

আমার নিজের কাছে শিশির ভট্টাচার্য্যদের 'অখণ্ড রূপতত্ত্ব' একদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে — বাংলা ভাষার ইতিহাস আর বাংলা ভাষাচর্চার ইতিহাসের দিক থেকে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে, প্রধানত সংস্কৃত আর গৌণত ইংরেজির চাপে, বাংলা ব্যাকরণ গভীর অর্থে ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র হিসাবেই চর্চিত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ১৯২৬ সালের থিসিসে খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল সম্ভবত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ 'নবব্যাকরণবিদে'র প্ররোচনায়। দেবেশ রায় *অপর ভাষা* গ্রন্থের 'নতুন পাঠোদ্ধারের প্রস্তাব: ও-ডি-বি-এল' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, সুনীতিকুমারের বাস্তবলিপ্ততা অর্থাৎ সংগৃহীত বিপুল তথ্য-উপাত্তের

চাপে কিভাবে তাঁর অবলম্বিত তত্ত্ব ও পদ্ধতি ভেঙে পড়েছে। তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রতি অপ্রয়োজনীয় বিশ্বস্ততা দেখাননি বলেই তাঁর গ্রন্থ বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণে এতটা সাফল্য পেয়েছে। সেই সুনীতিকুমার ১৯৩৯ সালে যখন *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* লিখলেন, তখন দেখা গেল, বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য-স্বায়ত্তশাসন আবিষ্কার ও রক্ষার বদলে সংস্কৃত সূত্রের অনুকূলে উদাহরণ তালাশ করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বাংলা ভাষা-বর্ণনার সেই প্রতিক্রিয়াশীলতা যে কতটা তেজি, তার প্রমাণ মেলে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* বইয়ে। বহু-প্রশংসিত এই বইতে লেখক বাংলা ব্যাকরণের নামে প্রচার করেছেন সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র, আর বাংলা উদাহরণগুলো জড়ো করেছেন তার অনুসরণকারী বা ব্যতিক্রম হিসাবে। মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, এ গ্রন্থের সবচেয়ে সুলিখিত অধ্যায় 'প্রত্যয়'। কারণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের সুশৃঙ্খল প্রত্যয়গুলো তিনি চালিয়েছেন বাংলার নামে। এই বাস্তবতায় বাংলা ভাষা-বর্ণনার একটা বড় অংশ সমকালিক না হয়ে হয়েছে কালানুক্রমিক, যদিও কালানুক্রমের মধ্যে প্রাকৃত-অপভ্রংশ প্রভৃতির স্থান হয়নি — তথ্য-উপাত্ত হিসাবে কেবল সংস্কৃতই স্থান পেয়েছে। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্ত্বের একটা বড় অংশ আসলে ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র। শিশির ভট্টাচার্য্যদের 'অখণ্ড রূপতত্ত্ব' এই কারণে আমার কাছে দারুণ স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। এই পদ্ধতি সংজ্ঞার দিক থেকেই সমকালিক। অর্থের নামে, ব্যুৎপত্তির নামে বা অণু-অংশগুলোর সুলুক-সন্ধানের নামে অতীতে যাওয়ার কোনো দরকারও নাই, উপায়ও নাই।

৩

ফরাসি ভাষা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় 'ফরাসি নামশব্দের লিঙ্গ' প্রবন্ধ সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করার ঝুঁকি থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হল। বেশ পরিমাণ ঝুঁকি অবশ্য ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছি — আধা বা সিকি বা নাই-ধারণা নিয়ে অনেক মন্তব্য করেছি স্রেফ একজন ভাষা-ব্যবহারকারীর আকাঙ্ক্ষার বশে। পরে আরো কিছু মন্তব্য করার খায়েশ আছে। আপাতত এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বলা যাক, ব্যাকরণিক লিঙ্গ সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বেশ উপাদেয়-উপকারী আলোচনা আছে। ফরাসি না-জানা পাঠকের জন্যও তা আলবত কাজের। বাংলা লিঙ্গের আলোচনায় কথাগুলো নতুন আলো ফেলতে পারে।

বিশেষভাবে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করেছে এ রকম প্রবন্ধ আছে তিনটি। তার একটি 'বাংলা নামমণ্ডলের আন্তর্গঠন'। সূচিতে প্রবন্ধটির নাম দেখতে পাচ্ছি 'বাংলা নামবর্গের আন্তর্গঠন'। অনিচ্ছাকৃত ভুল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের 'সিরিয়াস' বিষয়-আশয় নিয়ে লিপ্ত বইটিতে মুদ্রণ-প্রমাদ, বিকল্প বানানের ব্যবহার আর মুদ্রণ-সৌকর্যের উৎকর্ষ-সম্পর্কিত নানা অবহেলা এত বেশি যে কিছু দায়-দায়িত্ব লেখক-প্রকাশককে না দিয়ে উপায় নাই। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক সংজ্ঞাগুলো ঠিক করে নিয়েছেন। অন্য প্রবন্ধগুলোতেও তাই আছে। বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার জন্য এটা দরকার। সংজ্ঞাগুলো ঠিক করে নিতে নিতে তিনি নতুন পরিভাষার প্রতি তাঁর পক্ষপাত জানিয়েছেন। বাংলা ভাষার এই উপাদানগুলোকে 'বিভাজক' বা 'নির্দেশক' না বলে 'অবধারক' বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টি/টা/খানা/খানি/গাছা/গাছি/টুকু ইত্যাদিকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য-মোতাবেক, রবীন্দ্রনাথই

প্রথম 'নির্দেশক' নামে অভিহিত করেছিলেন। সম্ভবত আপত্তি উঠেছিল। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করার সময় আলাদা টীকায় তিনি লিখেছেন, এই পারিভাষিকই ব্যবহার করতে হবে তা নয় — অন্য নামও দেয়া যেতে পারে। আমার কিন্তু সবসময় মনে হয়েছে, ইংরেজির প্রভাব সত্ত্বেও, 'নির্দেশক' পরিভাষা হিসাবে চমৎকার। বোধগম্য। উপাদানগুলোর কায়কারবারও অনেকটা বোঝা যায়। পরিভাষায় সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য কে কবে নিঃশেষে আঁটাতে পেরেছে? যা-ই হোক, শিশির ভট্টাচার্য্য তাঁর পরিভাষার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। ফলে কথা না বাড়ানোই ভালো।

প্রবন্ধের পরের অংশে — মূল অংশে — সঞ্জননী ব্যাকরণধারার পরিমিত প্রকল্প (Minimalist Program, Chomsky 1995) অনুসরণে নামমণ্ডলের অভ্যন্তরীণ স্বলক্ষণ পরীক্ষিত হয়েছে। সম্ভবত ভালোই হয়েছে। সম্ভবত বললাম এই কারণে যে, কথিত 'পরিমিত প্রকল্প' সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় পরীক্ষার গুণাগুণ মূল্যায়ন করার সাধ্য আমার নাই। কিন্তু এই প্রবন্ধ পড়তে পড়তে আবার আমি, অন্য অনেকের অনেক লেখার মতো, এক ঘোরতর সংশয়ে পতিত হয়েছি। সে কথাটা খুলে বলতে চাই। বাংলা ভাষাচর্চা সংস্কৃত ব্যাকরণের দীর্ঘ ছায়ার নিচে লম্বাকাল যাপনের পর আরো অনেকটা সময় তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের খপ্পরে ছিল। হয়ত ভালোই ছিল। যাঁদের নামে আমরা আজো বাংলা ভাষা পড়ে বা পড়িয়ে খাই, তাঁদের বড় অংশ ওই ঘরানারই তাত্ত্বিক। তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ, ভাষার সিনক্রোনিক বা আড়াআড়ি রূপটায় নজর না দিয়ে ডায়াক্রোনিক বা খাড়াখাড়ি রূপটাতেই তাঁরা লিপ্ত থেকেছেন। কথা সত্য। প্রশ্ন হল, তাহলে তাঁদের এমত সাফল্যের উৎস কী? আমার ধারণা, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের জন্ম আর বেড়ে ওঠায় সংস্কৃতের প্রধান ভূমিকা থাকায় এই শাস্ত্রে একটা উপমহাদেশীয় আবহের অন্তরঙ্গতা ছিল। উপমহাদেশীয়ই বা বলি কেন, চর্চার একটা প্রধান ক্ষেত্র তো ছিল কলকাতা। ফলে তত্ত্বানুসারী চর্চায় বাংলা ভাষার আড়াআড়ি রূপটা মার খেয়ে গেলেও প্রোডাক্টিভিটি বা উৎপাদনশীলতার ঘাটতি দেখা যায়নি। পরে বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানীরা বর্ণনামূলক চর্চা শুরু করেছেন। তাও অনেকদিন হল। চমস্কির লাইনেও হেঁটেছেন অনেকে। কিন্তু প্রায় সবাই একমত: বাংলা ভাষা-বর্ণনার দৈন্য কাটে নাই। কারণ কী?

আমার ধারণা, একটা কারণ হল, বাংলা ভাষার সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ নাই এমন আবহে বিকশিত তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতির আরোপ। বাংলা ভাষা ব্যাখ্যার জন্য পদ্ধতি ধার করা যাবে না, এমন কোনো ফতোয়ার দিকে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের চর্চার প্রধান ধরন অনেকটা পশ্চিমে উৎপাদিত নতুন পণ্যের মতো, যার কার্যকরতা পরীক্ষা করা হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। বাজারে এ ধরনটার প্রচলিত নাম 'গিনিপিগ বানানো'। আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা ভাষাবিজ্ঞানে পশ্চিমে গবেষণা করেছেন, এমন গবেষকদের থিসিসগুলোর বেশিরভাগই এই গোছের। এ ব্যাপারে আমার কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক উদাহরণ হুমায়ুন আজাদ। তিনি পরিচ্ছন্ন বাংলায় ভাষাবিজ্ঞান লিখতে জানতেন। লিখেছেনও। তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে পরিচ্ছন্ন গদ্যে এবং ভঙ্গির বলিষ্ঠতায়। কিন্তু *Pronominalization in Bengali*

এবং *বাক্যতত্ত্ব* পড়ে মনে হয়, বিশেষ মডেল পাক্কা ইমানদারের মতন অনুসরণ করে তিনি তত্ত্ববিশেষের ভাষ্য তৈরি করেছেন মাত্র; বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের নতুন কোনো বার্তা জানাতে চাননি। এ বিষয়ে কারো অবিশ্বাস হবে না যদি তিনি গুণে দেখেন মোট কী পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত এই দুই বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। উপাত্তগুলোর ধরনও বিচড়ে দেখতে পারেন। দেখবেন, তত্ত্ব বা মডেলের সাথে খাপ খায় এমন 'বানানো' উদাহরণ জড়ো করে বিশ্লেষিত হয়েছে মডেলটি — বাংলা ভাষা নয়।

তাহলে ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিখ্যাত মডেলগুলো কি আমরা আমাদের ভাষা-ব্যাখ্যায় কাজে খাটাব না? অবশ্যই খাটাব। ইংরেজি-ফরাসি-জার্মানের মতো 'কেন্দ্রীয়' ভাষার তালিকায় পড়ে না, এমন সমস্ত ভাষাই মডেল ধার করে। আমরাও করব। আমাদের একটা গোড়ার গলদ এই যে, যাকে বলে প্রথাগত ব্যাকরণ, বাংলার ক্ষেত্রে তার প্রণয়ন আজো হয়নি। বিপুল তথ্য-উপাত্ত জড়ো করে বাংলা ভাষার কর্মপদ্ধতি ও বিশিষ্টতাগুলো গুছিয়ে মলাটবন্দী করা সম্ভব হয়নি। ফলে নিজের বিশিষ্টতা জানান না দিয়েই ব্যবহৃত উপাত্তগুলো মডেলের আওতায় হজম হয়ে যায়। তাছাড়া বিশেষ ভাষা-ব্যাখ্যায় কোনো পদ্ধতি হুবহু অনুসৃত হতে পারে না। বরং পদ্ধতির পেছনে যে দর্শন বা অনুমানগুলো কাজ করেছে, তার অনুসরণ চলতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন সংস্কৃতবাদী আর বিরোধী শিবিরে যথেষ্ট উত্তেজনা চলছিল। ত্রিবেদী মহাশয় বললেন, গোলমালের কারণ নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ হুবহু অনুসরণ করার চেষ্টা তো বৃথা। তা সম্ভবও নয়, কাজেও আসবে না। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের যে দর্শন বা ভাষাব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গি — তা আলবত বাংলা ভাষা-ব্যাখ্যায় কাজে লাগবে। লাগাতে হবে। এই কথাটা পশ্চিমা মডেল বা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ দেখি না। যদি দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলা ভাষার কিছু বিশিষ্টতা আর তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নতুন কাঠামো প্রস্তাবিত হয় আর সেই কাঠামো-মোতাবেক বাংলা ভাষার তথ্য-উপাত্ত যথাসম্ভব নিঃশেষে বিশ্লেষিত হয়, তাহলেই কেবল একই সাথে 'ভাষাবিজ্ঞান' আর বাংলা ভাষার চর্চা সম্ভব বলে ধারণা করি। তাতে বাংলা ভাষাচর্চায় উৎপাদিত কিছু ধারণা দুনিয়ার জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত করাও হয়ত অসম্ভব হবে না।

ছোট মুখে বড় কথা অল্প চলতে পারে; কিন্তু ইতিমধ্যে যথেষ্ট বলা হয়ে গেছে তাই কয়েকটি সতর্কবার্তা দরকার। প্রথমত, উপরে এক ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সাম্রাজ্যবাদের কথাই বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো অতি-উপনিবেশিত একটি দেশে কলা-সমাজবিজ্ঞান, এমনকি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মতো সকল ক্ষেত্রেই এ জিনিসের রাজত্ব। তাই আলাদা করে ভাষাবিজ্ঞানীদের দায়ী করা সত্যের আংশিকায়ন অর্থাৎ অপলাপ হবে। তাছাড়া জ্ঞানগত ধারাবাহিকতা বা নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এ ধারার পঠন-পাঠনও মাঝে-মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উপনিবেশিত কলকাতায় তা অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিশির ভট্টাচার্য্য 'বাংলা নামমণ্ডলের আন্তর্গঠন' প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে মডেলের পেটে সম্পূর্ণরূপে হজম হতে দেননি। পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন, কিছু কিছু উপাত্ত এই প্রকল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, গত কয়েক দশকের পশ্চিমে

প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানীদের কাজমাত্রই 'গিনিপিগমার্কা', এমন দাবি নিশ্চয়ই হাস্যকর হবে। ওয়াকিবহাল মহল ব্যতিক্রমের তালিকা করতে পারবেন। সীমিত অভিজ্ঞতায় আমি মুহম্মদ আবদুল হাই আর প্রবাল দাশগুপ্তের নাম নিতে চাই, যাঁরা আমার পঠিত তাঁদের রচনাবলিতে বাংলা ভাষার প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন।

কাজের কথায় আসা যাক। 'বাংলা অবধারকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে লেখক প্রধানত পূর্বসূরিদের মতের পর্যালোচনা করেছেন। তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা খুব একটা করেননি। তবে অন্যদের মতামতে অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। সন্দেহ করার যুক্তিগুলো হাজির থাকায় তাঁর সন্দেহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের মর্যাদাই পেতে পারে।

এই বইয়ের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রবন্ধ 'ইস্কুলে হাসতো সন্ত্রস্ত বাঘ: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা'। প্রবন্ধটি কাজের, একই সাথে মজাদার। এ প্রবন্ধের আকার বা গড়ন রীতিমত ঈর্ষণীয়। বর্ণনাপদ্ধতিতে শৃঙ্খলা আর তত্ত্বের মেজাজ পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গ বিস্তারে তিনি মোটেই অনাগ্রহী নন, বিশেষত তত্ত্বের সূক্ষ্ম নানা ফাঁকফোকর যথাবিহিত পরিসর নিয়েই বিশ্লেষিত হয়েছে; কিন্তু তাতে প্রবন্ধের সম্মুখগতি ক্ষুণ্ন হয়নি। আলোচ্য বিষয়ে সামগ্রিক দখল আর প্রবন্ধ-রচনার অভ্যস্ত নৈপুণ্যই কেবল এ ধরনের নিটোল আকারকে সম্ভব করতে পারে।

এ প্রবন্ধেও শিশির ভট্টাচার্য্য আমূল বিজ্ঞানবাদী। ধ্বনিবর্ণনার বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সে-কাজটি ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। বাড়তি হিসাবে পাওয়া গেছে বাংলা ধ্বনিবর্ণনার একাংশ। কিন্তু বাংলা ধ্বনিবর্ণনা তাঁর লক্ষ্য নয় বলে, সূত্রের দাবি মেটানোর জন্য ধ্বনির উদাহরণ এসেছে বলে, কোথাও কোথাও বর্ণনাভঙ্গিটা হয়েছে এরকম যে, সূত্রানুযায়ী উচ্চারণ হয়েছে, উচ্চারণ-অনুযায়ী সূত্র হয়নি। যেমন এক জায়গায় প্রাবন্ধিক লিখেছেন: 'রাষ্ট্র'-এর জার্মান প্রতিশব্দ Rad-এর উচ্চারণ 'রাট', কারণ জার্মান ভাষায় অক্ষরের উপধায় ঘোষতার অবসান হয়। আবার ইংরেজিভাষী শিশুকে এ ব্যাপারটি শিখতে হয় কারণ ইংরেজিতে অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় থাকে (উদাহরণ: Red, Read, Rod)।' জার্মানরা 'রাড'কে 'রাট' উচ্চারণ করে — কথাটা কেমন যেন! একই ভাষার সমকালিক বর্ণনার ভাষা তো এমন হওয়ার কথা না। জার্মান শব্দ নিশ্চয়ই 'রাট'। হতে পারে পুরোনো জার্মানে 'রাড' ছিল। কিংবা একই উৎস থেকে জাত শব্দটি অন্য ভাষায় 'রাড' আকারে আছে। জার্মান ভাষায় অক্ষরের উপধায় ঘোষধ্বনি থাকে না — এর নমুনা হিসাবে শব্দটা ব্যবহৃত হতে পারে। আবার ইংরেজ শিশুরা পূর্বোক্ত শব্দগুলোর উচ্চারণে বিশেষভাবে ঘোষতা বা মহাপ্রাণতা 'শেখে', এ কথারও তো কোনো অর্থ হয় না। তারা তো ঘোষতা-মহাপ্রাণতাসহই শব্দগুলো শেখে। প্রবন্ধটিতে এ ধরনের কথা যথেষ্ট আছে। এটা কি অসাবধানতা, নাকি সূত্রকে বাস্তব উচ্চারণের উপর প্রাধান্য দেয়ার অনিচ্ছাকৃত ফল?

আরেকটি খটকার কথা এখানে টুকে রাখি। শিশির ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, অন্তর্লীন স্তরের 'স্কুল' ভূমিস্তরে এসে হয়ে যায় 'ইস্কুল'। ঘটনাটা কখন ঘটে? ইংরেজি থেকে বাংলায় ঋণশব্দ হিসাবে গৃহীত হওয়ার কালে, নাকি গৃহীত হয়ে যাওয়ার পরে? প্রবন্ধের ভঙ্গি থেকে

মনে হয়, ঋণশব্দ হিসাবে গৃহীত হওয়ার পরে ঘটনাটা ঘটে। কিন্তু এরকম তো হওয়ার কথা নয়। যদি বাংলায় শব্দটি 'স্কুল' আকারে গৃহীত হয়ই, তাহলে অন্তত 'প্রমিত'ভাষীদের তো এইরূপেই শব্দটি উচ্চারণ করার কথা। তা তো হয় না। তার মানেই হল, শব্দটি 'ইস্কুল' হয়েই বাংলায় এসেছে। 'স্পর্শ', 'স্কন্ধ', 'স্তর' ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণরূপের ক্ষেত্রেও একই কথা। সবক্ষেত্রেই স্বরাগম আবশ্যিক — তা সেই স্বরকে যে নামেই ডাকা হোক, বা যে সূত্রেই বিন্যস্ত করা হোক। এখানে কি শব্দের লিখিতরূপ আর উচ্চারণরূপের মধ্যে কোনো গোলমাল ঘটেছে? আরো কয়েকটি উদাহরণের ক্ষেত্রে এরকম দেখা গেল। আমার আন্দাজ — ভাষা-ব্যবহারকারী হিসাবে — অন্তর্লীন স্তরে 'ইস্কুল' রূপটাই থাকে। কেউ 'ইশ্‌কুল' উচ্চারণ করলে ভূমিস্তরে পরিবর্তনটা ঘটে। এ সিদ্ধান্ত ঠিক হলে অবশ্য সূত্র বদলাতে হয় না, কেবল বর্ণনাভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হয়।

যা-ই হোক, 'ইস্কুলে হাসতো সন্ত্রস্ত বাঘ: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা' একটি উপভোগ্য জরুরি রচনা। এতে পূর্বসূরিদের ঋণ কতটা আছে বলতে পারব না। কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান আলোচনায় প্রবন্ধটি আরো বহুদিন গুরুত্বের সাথে পঠিত হবে বলে ধারণা করি।

৪

'বাংলাভাষা কি সংস্কৃতের দুহিতা?' প্রবন্ধটি বাকি নয়টি থেকে আলাদা। কেবল বিষয়ের দিক থেকে নয়, ব্যবহৃত তত্ত্বের দিক থেকেও।

এক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনকে অন্য ভাষাতাত্ত্বিকদের বরাতে প্রাবন্ধিক পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। ঠিকই করেছেন। কিন্তু তিনি লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ার ভাষাগুলোর' ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। এ মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। আসলে ভারতবর্ষে চালু বিপুল সংখ্যক ভাষার মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আর্য-গোত্রে পড়ে। একে কলমের ভুল হিসাবেই নেওয়া যেত, যদি বাংলা ভাষার কুলজির বিবরণে অনার্য ভাষাগুলো অতটা গুরুত্ব না পেত। বাংলা ভাষার আকার, গড়ন, কাঠামো বা ছাঁচ মূলত অনার্যের — এই মত প্রচার করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার কুলজী' ইত্যাদি প্রবন্ধে। এন্ডারসনসহ আরো অনেকেই এ মতের খরিদ্দার। সাম্প্রতিক ভাষ্যকারদের মধ্যে প্রবাল দাশগুপ্ত মতটি কিনেছেন 'টায়ে টোয়ে' ইত্যাদি রচনায়।

দুই. শিশির ভট্টাচার্য্য বৈদিক সংস্কৃত থেকে নতুন নতুন ভাষা উদ্ভবের কয়েকটা ছক এঁকেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক অনুমান হিসাবে এগুলো সম্ভবত গ্রহণযোগ্য। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় এ ধরনের অনুমান খুবই চালু ব্যাপার ছিল। সমস্যা হল, ছকগুলোতে মোটের উপর সংস্কৃতকে বৈদিক সংস্কৃতের পরবর্তী ধাপ আর প্রাকৃতকে সংস্কৃতের পরবর্তী ধাপ হিসাবে দেখানো হয়েছে। সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ বা সুকুমার সেন কোনো ছকেই সংস্কৃতকে এই ধারাক্রমের আবশ্যিক ধাপ হিসাবে বিবৃত করেননি। এ কথা ঠিক, পাণিনি সমকালীন উপভাষার একটি চালু রূপকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্য কিছু উপভাষার অভিজ্ঞতাও তিনি নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছিলেন। বেদের টেক্সট তো

ছিলই। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দী-পরম্পরায় সংস্কৃত ভারতে কিরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল, তার শনাক্তিতে বড় ধরনের বিভ্রাট প্রবন্ধটিতে ঘটেছে, সন্দেহ নাই। এ বিভ্রাটের দুটি প্রকাশ ঘটেছে তাঁর তুলনামূলক উদাহরণে। তিনি সংস্কৃত আর প্রাকৃতের তুলনা টেনেছেন বর্তমান প্রমিত বাংলা আর আঞ্চলিক বাংলার সাথে। খুবই অযথার্থ তুলনা। সংস্কৃতের ব্যবহার-পরিধি ছিল অতি ব্যাপক। কিন্তু ব্যাপকতা কথ্যভাষা হিসাবে ব্যবহারের প্রমাণ নয়। এ দাবি শিশির ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের লেখায় পাওয়া যায় না। ভারতে আরবির ব্যাপক চর্চা হয়েছে। কেবল ধর্মীয় ভাষা হিসাবে নয়, জ্ঞানজাগতিক কর্মকাণ্ডেও। কিন্তু আরবি কখনো কথ্যভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। ফারসি হয়েছে। এ কথা সংস্কৃতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্যত্র শিশির ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতকে বলেছেন ভারতের অন্যতম 'লিঙ্গুয়া একাডেমিয়া'। কথা সত্য। তবে অন্যতম নয়, প্রধান। এ ব্যাপারে তিনি সংস্কৃতের তুলনা টেনেছেন ইংরেজির সাথে। খুবই ভুল তুলনা। ইংরেজি শুধু দুনিয়ার বিপুল মানুষের মাতৃভাষা নয়, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবেও অসংখ্য মানুষের কথ্যভাষা। ইংরেজির সাথে যোগ আছে ক্ষমতা-কাঠামোর। ইংরেজির আছে বিশ্বব্যাপী বিচিত্র ব্যবহার, যার একটা ছোট্ট অংশ মাত্র জ্ঞানজগতের সাথে যুক্ত। একাডেমিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের যথার্থ তুলনা হবে লাতিনের সাথে, যে ভাষাটি, ধরা যাক, নিউটন বিজ্ঞান ও গণিতচর্চায় ব্যবহার করেছিলেন। আসলে কোনো ভাষার সম্মান, আভিজাত্য, ব্যবহার-বৈচিত্র্য এক জিনিস, আর ভাষাটি কথ্যভাষা হিসাবে কোনো জনগোষ্ঠীর মুখে চালু থাকা একেবারেই আলাদা ব্যাপার। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা অঞ্চলে সংস্কৃতের উঁচুমাপের চর্চা হয়েছে। কিন্তু বাঙালি ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতে বাতচিত করতেন, এমনটা শোনা যায়নি। প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, এই গোষ্ঠীটি সংস্কৃতবহুল বাংলা ব্যবহার করতেন — কথায়ও, লেখায়ও। শিশির ভট্টাচার্য্য এই ফারাকটা তাঁর আলোচনায় রক্ষা করতে পারেননি। 'মৃতভাষা' বলে ভাষাবিজ্ঞানে যে পরিভাষা চালু আছে তাকে অনেকে 'মৃত' শব্দের দৈনন্দিন ব্যবহারের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। তাঁরা 'মৃতভাষা' কথাটাকে নেতিবাচক মনে করেন। আশা করা যায়, শিশির ভট্টাচার্য্যের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয়নি।

তিন. ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে শিশির ভট্টাচার্য্য জানেন, দুটি ভাষার মধ্যে ব্যাকরণিক মিল থাকে না, বা সামান্যই থাকে। মিল থাকে শব্দকোষে আর কিছু রূপতাত্ত্বিক নিয়মে। তাহলে একটি ভাষাকে অন্য ভাষার মেয়ে বলা হবে কিসের ভিত্তিতে? তাঁর উত্তর: প্রধানত শব্দগত মিলের কারণে। এখানে কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ক্যাটাগরি হিসাবে 'দুহিতা' কথাটির সংজ্ঞা বদলে গেল। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার মধ্যে পরিবার বা গোত্রতন্ত্র মোটেই শুধু শব্দের মামলা নয়, ব্যাকরণিক মিলেরও ব্যাপার। ওই পুরো শাস্ত্রটাই গড়ে উঠেছে ধ্বনিতাত্ত্বিক-রূপতাত্ত্বিক পরম্পরার ভিত্তিতে। শিশির ভট্টাচার্য্য ভাষাবিজ্ঞানের নতুন-সব ধারণার ভিত্তিতে খুব ন্যায্যভাবেই প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞাটি বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি নতুন সংজ্ঞা ধার্য করেছেন 'দুহিতা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যে দোহন করে' থেকে। কী দোহন করে? শব্দ। ব্যাকরণ নয়। সংজ্ঞা পরিবর্তনের ঘোষণা না দিয়ে লেখক এখানে একটা ইচ্ছাকৃত অস্বচ্ছতা তৈরি করেছেন। এ এক ধরনের অসাধুতাই বটে। কারণ, নতুন

এই সংজ্ঞা নিয়ে তো বিতর্ক নয়। এই অতি পুরানা বিতর্ক 'দুহিতা' শব্দের তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ঘরানার সংজ্ঞাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে, যা ব্যাকরণগত সাদৃশ্যকেও সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করে। দেখা যাক, শিশির ভট্টাচার্য্যের সংজ্ঞা মোতাবেক তাঁর বিশ্লেষণ ঘাতসহ কিনা।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ কত? রবীন্দ্রনাথের মতে প্রায় শূন্য। শিশির ভট্টাচার্য্য পুরো বইতে যে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা করেছেন, সে-মোতাবেক রবীন্দ্রনাথের হিসাব ঠিকই আছে। কারণ, অন্য ভাষার শব্দ তো বাংলায় আসতে পারে না। বাংলায় সংস্কৃতের যেসব শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলো বাংলার ধ্বনিতন্ত্র-রূপতন্ত্র মেনেই এসেছে। সেগুলো

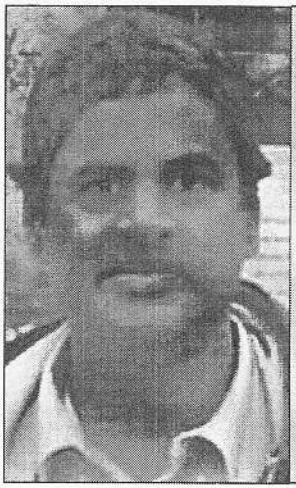

ঢাকায় ভাষাচর্চা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভাষা-উৎসাহীদের গরিষ্ঠাংশ ভাষাবিজ্ঞানে অশিক্ষিত, আর 'ভাষাবিজ্ঞানী'দের মধ্যে ভাষার ব্যাপারে আগ্রহ বিশেষ দেখা যায় না। শিশির ভট্টাচার্য্য বিরলদের একজন, যাঁর মধ্যে দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে। সুখের বিষয়, লেখায়ও তিনি বিরামহীন। কেন লেখেন? এ বইয়ের ভূমিকার ভাষ্য-মোতাবেক, বাংলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণের জন্য অকর্মক হায়হুতাশ তিনি আর শুনতে চান না। কাজ শুরু করা দরকার এখনই।

শিশির ভট্টাচার্য্য

আর সংস্কৃত শব্দ থাকেনি। তাহলে প্রশ্নটা হওয়া উচিত এরকম: বাংলায় 'তৎসম' শব্দের পরিমাণ কত? এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারে চালু জনপ্রিয় মতটি সুনীতিকুমারের। তাঁর মতে শতকরা পঁয়তাল্লিশটি। তিনি একটি অভিধান থেকে হিসাবটা বের করেছেন। *ওডিবিএল*-এর যে পৃষ্ঠায় হিসাবটা আছে, সে পৃষ্ঠাতেই সুনীতিকুমার সাবধান করে লিখেছেন, এ হিসাব অবলম্বিত অভিধানের হিসাব মাত্র — বাংলা ভাষার নয়। কিন্তু অতি-উৎসাহীরা সাবধানবাণীতে গলেননি। বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ শতকরা পঁয়তাল্লিশটাই ধরেছেন। ভিন্নমতগুলোও বিচড়ে দেখেননি। যেমন, মুহম্মদ এনামুল হকের হিসাবে তৎসমের সংখ্যা শতকরা পঁচিশটি। বেশি হিসাবটাই নেয়া যাক। ধরা যাক, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উৎসজাত শব্দের সংখ্যা শতকরা পঁয়তাল্লিশটি। এর ভিত্তিতে শিশির ভট্টাচার্য্যের সুবিধাজনক নতুন সংজ্ঞা অবলম্বনে বাংলাকে সংস্কৃতের 'মেয়ে', 'কন্যা', 'দুহিতা' যা-ই বলা হোক — সংজ্ঞাটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। কারণ, এ প্রবন্ধেই বলা হয়েছে — এবং আমরাও জানি — 'ইংরেজির সিংহভাগ শব্দ এসেছে ফরাসি প্রভুর শব্দকোষ থেকে'। তাহলে তো

বলতেই হয়, যে পরিমাণ শব্দ 'দোহন' করার জন্য তিনি বাংলাকে সংস্কৃতের 'দুহিতা' বলতে চান, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ শব্দ 'দোহন' করে ইংরেজি ফরাসির ততোধিক 'দুহিতা' হয়েছে। কিন্তু তা তো কেউ বলে না। শিশির ভট্টাচার্য্যও বলেননি। আমাদের হাতের কাছেই আরো ভালো উদাহরণ আছে। উর্দু তো বটেই, এমনকি ব্যাপক সংস্কৃতায়নের পরের হিন্দিতেও ফারসি শব্দের পরিমাণ বাংলায় সংস্কৃতের কথিত পরিমাণের চেয়ে বেশি। তাহলে এ দুটি ভাষাকে ফারসির দুহিতা বলা যাবে কি? দেখা যাচ্ছে, নিজের সংজ্ঞার প্রতি তাঁর নিজেরই কোনো ইমান নাই। আমরা কোন ছার?

সম্ভবত এই সংজ্ঞা সুবিধাজনক না হওয়ায় প্রাবন্ধিক অন্যরকম কথাও বলেছেন। লিখেছেন, 'কেউ কিন্তু বলেন না: জার্মান বা ইংরেজি ল্যাটিনের দুহিতা। এর কারণ ল্যাটিনের সাথে ফরাসি (এবং স্প্যানিশ, ইতালিয়ান ও রুমানিয়ান) ভাষার যে সম্পর্ক তা যে জার্মান বা ইংরেজির সাথে ল্যাটিন ভাষার যে সম্পর্ক তার তুলনায় গভীরতর সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ নেই।' এই বাক্যের ভাষা কিন্তু 'বিজ্ঞানে'র ভাষা নয়। এই 'গভীরতর'র সংজ্ঞায়ন হয় নাই। তাহলেও আমরা কথাটাকে গুরুত্বের সাথে নেব। কারণ, কথাটা 'বিজ্ঞানসম্মত' না হলেও সত্য। বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক আসলেই কেবল শব্দঋণের নয়। আরো গভীর ও ব্যাপক। মুশকিল হল, এই ব্যাপকতা আর গভীরতা উৎস ও ক্রমবিকাশের সাথে যতটা জড়িত, তার চেয়ে অনেক বেশি যুক্ত পরবর্তী চর্চা আর ঋণপ্রবাহের সাথে। উৎস আর বিকাশের হদিশ নিতে গেলে অপভ্রংশ ও প্রাকৃতের হদিশ নিতে হবে। এই খোঁজখবর বিশেষ নেয়া হয়নি। সংস্কৃত আর প্রাকৃতের মধ্যে মোটেই কোনো সরল সম্পর্ক ছিল না। আসলে 'সংস্কৃত' আর 'প্রাকৃত' নামায়নের মধ্যেই গোলমালের ফাঁদটা পাতা ছিল। শিশির ভট্টাচার্য্যও সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন। কারণ, এতে তাঁর সুবিধা। তিনি এমনভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কুলজি বর্ণনা করেছেন, যেন একই কালে সংস্কৃত ছিল 'প্রমিত' আর প্রাকৃত ছিল 'উপভাষা'। ভয়ানক বিভ্রান্তি। আদতে প্রতিটি প্রাকৃতেরই নানা কালে অনেকগুলো করে 'প্রমিত' রূপ ছিল। তাতে রাষ্ট্র চলেছে। জ্ঞানচর্চা হয়েছে। প্রভাবশালী ধর্মীয়-জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের সাথে এর প্রত্যেকটির পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এসব কথা বিস্তারিত বলেছেন বহু ভাষ্যকার। কিন্তু 'সংস্কৃতওয়ালারা' তা আমলে আনেননি। তাঁরা জনপ্রিয় করেছেন একটি ছেলেমানুষি ছক: সংস্কৃত>প্রাকৃত>বাংলা (হস্ত>হথ>হাত)। এর মধ্যেও আবার অপভ্রংশ বাদ পড়েছে। যদি এই ছেলেমানুষি কবুলও করি, তাহলেও বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা হয় না, হয় দুহিতার দুহিতার দুহিতা। প্রকৃত ব্যাপারটা আরো জটিল। সে-জটিলতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ আরো বহু পণ্ডিত-তাত্ত্বিক সংস্কৃতকে বলেছেন বাংলার নানির-নানির-খালা বা এরকম কিছু একটা। তাঁরা প্রায় সবাই সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃতের প্রতি বিরাগের কোনো লক্ষণ তাঁদের লেখায় কস্মিনকালেও দেখা যায়নি।

চার. যুক্তি বা তত্ত্বে সুবিধা করতে পারেননি বলেই সম্ভবত শিশির ভট্টাচার্য্য প্রবন্ধের শেষাংশে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে নির্জলা গালিগালাজ করেছেন। গালিগালাজটা বড্ড অপাত্রে অন্যায্যভাবে পড়েছে। কেন, সে-কথা বলবার আগে তাঁর দু-একটা অনুমান সম্পর্কে বলি।

তিনি ঠিকই বলেছেন, ভাষা-সম্পর্কিত কিছু আলোচনা কেবল 'ভাষাবিজ্ঞান' দিয়ে হবে না; ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক আলোচনাকে আমলে আনতে হবে। কিন্তু মিথ্যা তথ্য, কাঁচা অনুমান আর অন্যায্য বিশ্লেষণ কাজে লাগার কোনো কারণ নাই। তিনি লিখেছেন: 'বাংলা যে সংস্কৃতের দুহিতা সে ব্যাপারে পাকিস্তানী শাসকদের মনে সম্ভবত কোন সন্দেহ ছিল না এবং সে কারণেই তারা জোর করে আরবি-ফার্সি শব্দ ঢুকিয়ে দুহিতাকে জননীর কাছ থেকে দূরে সরাতে চেয়েছেন।' এ মন্তব্যের প্রতিটি শব্দ শোচনীয়ভাবে অনৈতিহাসিক। প্রগলভও বটে। বাংলায় আরবি-ফারসি সবচেয়ে বেশি ঢুকেছে আঠার শতকে। কোনোপ্রকার অনুরাগ বা বিদ্বেষ থেকে ঘটনাটি ঘটেছে — এমন কথা কেউ বলেনি। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমান্তরালে ব্যাপারটা আরেকবার ঘটেছে চল্লিশের দশকে — পাকিস্তান-আন্দোলনের অংশ হিসাবে, কিন্তু রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে। পাকিস্তান হওয়ার পরে ব্যবহারিক দিক থেকে এ প্রবণতা বিস্ময়করভাবে কমে যায়। রাজনৈতিক চেতনা থেকে তত্ত্বীয় কিছু উদ্যোগ-আয়োজন চলেছিল, এবং তাতে রাষ্ট্রের ইন্ধন ছিল — একথা সত্য; কিন্তু এগুলোর একটিও আলোর মুখ দেখেনি। এ মন্তব্যে শিশির ভট্টাচার্য্য জটিল রাজনীতির সরল ব্যাখ্যার সস্তা সুবিধা নিতে চেয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, দেশভাগের পর হিন্দিতে সংস্কৃত ঢুকিয়ে 'হিন্দুভাষা' আর উর্দুতে সংস্কৃতমুল শব্দ 'খৎনা করে' 'মুসলমান ভাষা' বানানোর চেষ্টা চলেছে। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে ভারসাম্যপূর্ণ। শুনতে মিষ্টি শোনায়। কিন্তু ইতিহাস বলছে, ঘটনাটা মোটেই দেশভাগের পরে ঘটেনি। শুরু হয়েছে উনিশ শতকের শুরু থেকে। আর ব্যাপারটা মোটেই উর্দুর ব্যাপার নয়, আগাগোড়া হিন্দির পুনরুত্থানের মামলা। বোম্বাই থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত সেই হিন্দু-হিন্দি আন্দোলন সম্পর্কে যাদের প্রাথমিক ধরনের জানাশোনা আছে, তারাই বুঝবেন, এ ধরনের আপাত ভারসাম্যপূর্ণ মন্তব্য – হয়ত অজ্ঞাতসারেই — আসলে গভীরভাবে পক্ষপাতদুষ্ট।

'ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতেরা অনর্থক সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে' বাংলা ভাষাটিকে মুসলমানদের ব্যবহারের অনুপযোগী করে তুলেছেন — এ ধরনের আলোচনার নিন্দা করেছেন শিশির ভট্টাচার্য্য। তিনি অনাস্থী সেই আলোচকদের মুণ্ডপাত করেছেন। তাঁর উদ্দিষ্ট আলোচকেরা বোধ হয় মুসলমান। তাঁর ভঙ্গি থেকে সেরকমই মনে হয়। এখানে এই লেখকের জন্য মায়া না দেখিয়ে উপায় নাই। ঠিক 'মুসলমানদের ব্যবহারের অনুপযোগী' হয়ে ওঠার কথা বলেননি, কিন্তু ওই পণ্ডিতেরা যে বাংলা ভাষাটাকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলেছিলেন, সে-কথা সবচেয়ে বেশি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুসলমানদের কথাও বারবার বলেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শিশির ভট্টাচার্য্য বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতদের কথা আবেগ থেকে বলেছেন। তাঁদের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর নেননি। আমি দু-চারটি উল্লেখ করি। চর্যাপদে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ — সুনীতিকুমার আর হরপ্রসাদের হিসাবে — শতকরা পাঁচ ভাগ। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* এই সংখ্যা শতকরা সাড়ে বার ভাগ। মধ্যযুগের বহু কাব্য ঘেঁটে সুনীতিকুমার আর গ্রিয়ার্সন পেয়েছেন শতকরা তেত্রিশ ভাগ। মনে রাখতে হবে এ হিসাব কবিতার ভাষার। গদ্যের বা সামগ্রিক বাংলা ভাষার নয়। আরো

উল্লেখ্য, উক্ত তেত্রিশ ভাগ শব্দের অধিকাংশই আমরা এখনো প্রায় একই রূপে ব্যবহার করি। ফোর্ট উইলিয়ামের গদ্যে কী হয়েছে? শিশিরকুমার দাশ *আরলি বেঙ্গলি প্রোজ* (১৯৬৬)-এ জানাচ্ছেন: সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা লেখক-ভেদে শতকরা বিরানব্বইটি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। এর অধিকাংশ শব্দ বাংলায় আগে-পরে কখনোই আর ব্যবহৃত হয়নি। উনিশ শতকে বেরিয়েছে অভিধানের পর অভিধান — আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য অভিধান। সংস্কৃত আর ফারসি শব্দের অভিধান। কেন? ভূমিকায় পরিষ্কার করে প্রণেতারা লিখেছেন: অভিধান প্রণয়নের কারণ পাঠককে শিক্ষিত করা যেন তারা সংস্কৃত শব্দ অধিক হারে ব্যবহার করতে পারে, আর আরবি-ফারসি চিনে নিয়ে বাদ দিতে পারে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, শিশির ভট্টাচার্য্য খুবই কম তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন; যেসব তথ্য ব্যবহার করেছেন সেগুলোও অনেকাংশে বিকৃত।

উপরে সামান্য কিছু তথ্য ব্যবহার করা গেল। সৌভাগ্যবশত তথ্যপ্রণেতাদের সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। নচেৎ সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠতে পারত। শিশির ভট্টাচার্য্য তুলেছেন। তিনি গালিগালাজটা ভদ্রভাষায় করেছেন। কিন্তু উদ্দিষ্ট গোপন করেননি। কাজটা অন্যায্য হয়েছে। বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা হিসাবে স্বীকৃতি দেননি বা ফোর্ট উইলিয়ামের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন — এমন পণ্ডিতদের সবাই নিষ্ঠাবান হিন্দু। প্রত্যেকেই সংস্কৃতের যোগ্য চর্চাকারী। বাংলায় 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' বলে যে প্রবাদ আছে, তার অব্যর্থ নজির হয়ে রইল শিশির ভট্টাচার্য্যের অন্যায় দোষারোপ।

এই প্রবন্ধের আলোচনায় লম্বা পরিসর নিতে হলো তাঁর এক কারণ ব্যক্তিগত। দশটি প্রবন্ধের মধ্যে একমাত্র এই প্রবন্ধের বিষয়েই আমার খানিকটা দখল আছে। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। এই বিষয়গুলোর একপ্রকারের মীমাংসা হয়ে গেছে বহুদিন আগে। নতুন আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু পুরানা কাজের আলাপ বাদ দিয়ে নয়। শিশির ভট্টাচার্য্য বিষয়গুলো হয় ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেছেন, নয়ত ভুলে গেছেন। অনুমান করা যায়, কালগত দূরত্বের কারণে আরো অনেকেরই সমরূপ বিস্মৃতি ঘটেছে। এখানে দুই-চার তথ্যে ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে। গ্রন্থকারের দিক থেকেও দুটি কারণ আছে। এক. শিশির ভট্টাচার্য্য বাংলা এবং সংস্কৃতের বৈধ সীমানা মাঝে-মধ্যেই ভেঙে ফেলেন। অন্তত উদাহরণ চয়নের ক্ষেত্রে। এ বইয়ের বাইরে তাঁর অন্য রচনায়ও ব্যাপারটা খেয়াল করা যায়। বিশেষত প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের উপর সংস্কৃতের আছর সম্পর্কে বেখবর থেকেই তিনি প্রায়শ সুনীতিকুমার বা জ্যোতিভূষণের ব্যাকরণ ব্যবহার করে থাকেন। এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। দুই. পরিভাষা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে অচেনা সংস্কৃত শব্দের প্রতি তাঁর বাড়াবাড়ি রকমের প্রীতি আছে। 'মূলধ্বনি'র মতো কার্যকর প্রচলিত শব্দের বদলে তিনি 'প্রণব' ব্যবহার করেন। 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে'র বদলে পছন্দ করেন 'সঞ্জননী ব্যাকরণ'। পরিভাষা পরিচিত শব্দেই হতে হবে এমন দাবি করা হাস্যকর। কিন্তু স্বচ্ছ, বিজ্ঞানসম্মত, চালু পরিভাষার বদলে জটিল পরিভাষা ব্যবহার একটি খারাপ প্রবণতা বলেই মনে করা যেতে পারে। তাঁর এ প্রবণতা এতটাই প্রবল যে, 'বহু-অক্ষর' শব্দটিকে তিনি সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে 'বহ্বক্ষর' (তাঁর ব্যবহৃত শব্দটি অবশ্য 'বহ্বাক্ষর' — সম্ভবত

মুদ্রণ-প্রমাদ) করে অনাবশ্যক জটিলতা তৈরি করেন। এসব ব্যাপারে আমার কাছে হুমায়ুন আজাদকে দুর্দান্ত মনে হয়। এও মনে হয়, শিশির ভট্টাচার্য্য যে আজাদের লাইনে না গিয়ে অনাবশ্যক জটিলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তার পেছনে 'বাংলাভাষা কি সংস্কৃতের দুহিতা?' প্রবন্ধে প্রচারিত ধারণাগুলো গভীরভাবে কাজ করেছে।

৫

ঢাকায় ভাষাচর্চা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভাষা-উৎসাহীদের গরিষ্ঠাংশ ভাষাবিজ্ঞানে অশিক্ষিত, আর 'ভাষাবিজ্ঞানী'দের মধ্যে ভাষার ব্যাপারে আগ্রহ বিশেষ দেখা যায় না। শিশির ভট্টাচার্য্য বিরলদের একজন, যাঁর মধ্যে দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে। সুখের বিষয়, লেখায়ও তিনি বিরামহীন। কেন লেখেন? এ বইয়ের ভূমিকার ভাষ্য-মোতাবেক, বাংলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণের জন্য অকর্মক হায়হুতাশ তিনি আর শুনতে চান না। কাজ শুরু করা দরকার এখনই। আলো জ্বালাবার আগে হয়ত অনেকদিন ধরে চলবে 'সলতে পাকানোর কাজ'। তাঁর বিনয়-ভাষণ: তিনি সেই সলতে পাকানোর কাজ করছেন।

তাঁর কথায় পাক্কা ইমান আছে বলেই মনে করি: 'ভাষাবিজ্ঞানে'র চর্চায় 'ভাষা'র পরিমাণটা খানিক বাড়ালে, আর বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত পুরানা লেখালেখিতে উন্নাসিকতা সামান্য কমালে সলতে পাকাতে পাকাতে, তাঁর হাতেই, আলো জ্বলে ওঠা অসম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র :

এ প্রবন্ধের জন্মকথার সাথে আমার সামান্য যোগ আছে। সংক্ষেপে বললে আশা করি সে যোগের বয়ান বাহুল্য গণ্য হবে না।

শিশিরদা'র সাথে নানা বিষয়ে আলাপ-প্রলাপ বা তর্ক-বিতর্ক হয়। একবার কিভাবে যেন সে-বিতর্কের বিষয় দাঁড়িয়ে গেল — বাংলা সংস্কৃত-মায়ের কন্যাসন্তান কি না। আমি কালবিলম্ব না করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দাখিল করলাম। পাত্তা পেল না। আমি সুনীতিবাবুর হাজার পৃষ্ঠা থিসিসের শ-খানেক পাতা পড়ে ফেললাম। শিশিরদা আমার পাঠকে তাঁর নিজের মতো ব্যাখ্যা করলেন। তর্ক কিভাবে শেষ হয়েছিল মনে নাই। দিনকতক পরে খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিক কুলীন পত্রিকা *একবিংশে* তাঁর প্রবন্ধ পড়লাম। দেখলাম, তিনি আমার আপত্তি এক বিন্দুও গ্রাহ্য করেননি। করার কথাও না। আমি উদ্ধৃত করেছি শহীদুল্লাহ সাবের চটি পুস্তক — বাংলায় লেখা; আর শিশিরদা'র রেফারেন্স পয়েন্ট জার্মান বা ইংরেজিভাষী পণ্ডিতের পেটমোটা ইংরেজি কেতাব। ফলে আমি শুরুতেই কাবু ছিলাম। কিন্তু অবাক হলাম দেখে, শিশির ভট্টাচার্য্য এ মীমাংসিত-পুরানা প্রসঙ্গে বাঙালি তাত্ত্বিকদের মত একেবারেই আমল করেননি। তাঁর এই মত-নিষ্ঠাকে আমি চিন্তার ব্যক্তিত্ব আকারেই পড়তাম, যদি প্রবন্ধটি যুক্তির দিক থেকে সুশৃঙ্খল হত। তা হয়নি। আমার মনে হল, তাঁর এ মতের উৎস ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান নয়, অন্য কিছু। তাই এখানে কথা বাড়াতে হল। বিস্তারে না গিয়ে পদ্ধতিগত কিছু সমস্যা নিয়েই কেবল কথা বলা যাক।

মোহাম্মদ আজম : জন্ম ২৩ আগস্ট ১৯৭৫। প্রাবন্ধিক-সমালোচক-গবেষক। পেশা : বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বাংলার ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* (২০১৪) [গবেষণা]

প্রাপ্তি উৎস : নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১১৫২২৯৯৮, ০১৯৪০১১২৬৭২

আইয়ামে জাহেলিয়ার প্রেমোপাখ্যান *কবি ও কামিনী*: শৈল্পিক সুবাতাসে শাশ্বত কবি-হৃদয়

খোরশেদ আলম

কবি ও কামিনী
জাকির তালুকদার
কনকর্ড অ্যাম্পোরিয়াম, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১২
৯৬ পৃষ্ঠা
১৬০ টাকা

কবি তো সে-ই
যার আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই,
কামনার শেষ নেই,
প্রতিদিন যার জীবন নতুন একটি বাঁকবদলের দিকে
ছুটে যায়।

...

কবি তো সে-ই
কারো কাছে যে বিপদ নিয়ে অভিযোগ করে না;
বরং বিপদ নিয়ে খেলতে ভালবাসে।

[*কবি ও কামিনী*, পৃ. ৭]

সারা পৃথিবীর কবিকুলকে শ্রদ্ধা জানাবার ভাষা দিয়েই *কবি ও কামিনী* উপন্যাসটির শুরু। কথাশিল্পী জাকির তালুকদার ইসলাম-পূর্ব আরবের কবি ইমরুল কায়েসকে নিয়ে রচনা করেছেন এক অনবদ্য প্রেমোপাখ্যান। পৃথিবীর যে-কোনো উপকরণের চেয়ে কবির কাছে শ্রেয়তম তার প্রেমের সুতীব্র আবেগ। অসংযত জীবনে কোনো তিয়াসাই মেটে না কবির কাছে। অপমান, জ্বালা, প্রতিশোধের অনির্বাপিত আগুন কবির মনের মতোই স্বচ্ছ ও সত্য সেখানে। আবেগময়, বিশৃঙ্খল, ছকে না বাঁধা জীবনচেতনা যার সে-ই তো কবি। কবিরা আগুন নিয়ে খেলতে ভালবাসে। কবি আল মাহমুদ যেমন

সংরক্ত ও সহজাত বাসনায় প্রকাশ করেন, 'পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা; / দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা উপশিরা'। ['সোনালী কাবিন', আল মাহমুদ]

ষড়যন্ত্র জেনেও যে পরাজিত হয় না সেই অপরাজেয় এক কবিসত্তার নাম ইমরুল কায়েস। বাসনায়-প্রেমে-ভালবাসায় যে রক্তাক্ত, আহত-বিক্ষেপে তার পদচারণা শুষ্ক মরু আরবে। কাম ও প্রেমে জর্জর এক কবি-হৃদয় কখনো মরুদ্যান, কখনো যেন বিশুষ্ক ধূলিরাশি। সমস্ত আরব-সুন্দরীর হৃদয় জয়কারী কবি সে। তার প্রেমে আত্মাহুতি দিতেও যেন দ্বিধা নেই তাদের। বহির্মুখি, নারী-প্রেম ও সম্ভোগে অস্থির, অথচ কারো বাহুডোরে বন্দিত্ব তার স্বভাবে নেই। কিন্তু উম্মুল জুনদব নামক এক নারীর দুয়ারে হোঁচট খেল সে। প্রত্যাখ্যাত হবার ভয় তাকে জুনদবের আচলে বাঁধে। বন্ধনভীরু কবি-মনের অভিব্যক্তি,

> যে জীবন আমি যাপন করছিলাম, সেই জীবনে বৈভব আছে কিন্তু প্রশান্তি নেই। উত্তেজনা আছে কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দ নেই।

[*কবি ও কামিনী*, পৃ. ১৭]

কিন্তু একে একে তিনজন নারীর আত্মহননের খবর তাকে দুর্বল-চিত্ত করে মিখলাফের পথে উনায়জার দিকে ধাবিত করে। প্রথমদিকে উনায়জার আপত্তি সত্ত্বেও 'প্রেমে দোহে মিলি পরস্পরে' কবির হাত দিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিষিদ্ধ প্রেমের কাব্য।

> কেন যে এমন লাগে! উনায়জা, রূপসী সে নারী
> আমার দেহের ভাঁজে মিশে আছে তার প্রেমশিখা,
> মনের অতলে যেন নিবু নিবু অগ্নির দাহিকা,
> আমাকে জ্বালায়, আমি রূপে জ্বলি তারই।
> জীবনের বহুদিন অজস্র নারীর মায়া-ভোরে
> নিজেকে বেঁধেছি আমি। কিন্তু সেই 'জুলজুল' দিন
> সমস্ত দিনের শেষে এখনো রঙিন
> উজ্জ্বল জ্যোতির মতো ফুটে আছে স্বর্ণের মুকুরে।

[*কবি ও কামিনী*, পৃ. ৪৫, ৪৬]

ইমরুলের খাতায় এ-কবিতা আবিষ্কারে উম্মুল জুনদবের হৃদয় ক্ষয়ে যায়। প্রেম পরিণত হয় ঈর্ষায়, সংঘর্ষে—পরিণাম যার ভয়াবহ প্রতিশোধ। উম্মুল জুনদব সেই প্রেয়সীর নাম যে প্রেমে, কাব্যবোধে ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালাতে বদ্ধ পরিকর। ইমরুল কায়েসের গায়ে ছলনাপূর্বক তার পরিয়ে দেয়া বিষমাখা কাপড়ের পরিণাম মৃত্যুর দিকে কবির ঝুঁকে পড়া। ভাবতে শরীরের রোমকূপ শিউরে ওঠে—যাকে ভালবাসা যায় তার প্রতি কি নেয়া যায় এই নিষ্ঠুর প্রতিশোধ?

উম্মুল জুনদব প্রেমিক হত্যায় দ্বিধাহীন চিত্ত, খলনায়িকার বদনাম বহনকারী অন্যরকম এক আরব নারী। অন্যদিকে কবি আল-কামাহ্ উম্মুল জুনদবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। প্রেমে উন্মাদ কবি আল কামাহর বাহুলগ্না উম্মুল জুনদব শতচ্ছিন্ন করে কবি ইমরুল কায়েসের হৃদয়। তাই কবির লড়াইয়ে ইমরুল হেরে যায়। কিন্দ গোত্রের গোত্রপতি হজর-পুত্রের পরাজয় ঘটে নিতান্ত দরিদ্র কবি আল কামাহ্র কাছে। যে ইমরুল কায়েসের কাছে কেবলি তুচ্ছ 'হুদা

গীতি' অর্থাৎ উটচালকের গান লেখার ক্ষমতা রাখে মাত্র।

দুটো ঘটনার বিস্তার ঘটে উপন্যাসটির আখ্যানভাগে। সমান্তরালে ইমরুল কায়েস-উনায়জা-উম্মুল জুনদব এবং ইমরুল কায়েস-উম্মুল জুনদব-আল কামাহ্ দুই ত্রিভূজ-প্রেমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে কাহিনি। ইমরুল কায়েসের বিদ্রূপ সত্ত্বেও একসময় আরব-কাব্যের সকল ছন্দ ভেসে ওঠে আল কামাহর মধ্যে। অথচ একটি নারীর আগ্রাসী প্রেমের ক্ষমতার কাছে সে যেন মজনু হয়ে গেছে। লেখকের ভাষায়, 'লাত-মানাত-ওজ্জার শপথ, প্রেমে পড়েছে আল কামাহ।' ইমরুল কায়েস নামটি তার কাছে এখন তীব্র ঘৃণা। পৃথিবীর কোনোকিছুই তার কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ নয় এক উম্মুল জুনদব ছাড়া। গোত্রের সবাই ভীষণ চিন্তিত তার জন্য। কারণ কোনো কবিকে তারা ধ্বংসের দিকে যেতে দিতে চায় না। 'ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কবি আপনি। এমন অবিবেচকের মত আচরণ করছেন কেন?' — উম্মুল জুনদবের এমন প্রশ্নেরও উত্তর তার জানা নেই। মরুভূমির বিপদ-সঙ্কুল বালিয়াড়িতে লুটিয়ে পড়া আল কামাহ্র দেহ খুঁজে পায় গোত্রের মানুষ। পরিশেষে আল কামাহ্র সেই অভীষ্ট দিন আসে। উনায়জার প্রতি প্রেমের কবিতা আবিষ্কারে উম্মুল জুনদব প্রতিশোধের আগুনে ইমরুল কায়েসকে পরিত্যাগ করে।

আগরেবাতুল আরাব বা কালো বর্ণের আরব কবি আনতারাহ্ ও ফখরিয়া উপাখ্যানটি মূলকাহিনিতে ভিন্নস্রোতের সৃষ্টি করেছে। হজর-পুত্র কবি ইমরুল কায়েসের প্রেমিকসত্তার সঙ্গে হাবশি দাসী-পুত্র আনতারাহ্ বিন শাদ্দাদের প্রেম-বিষয়ক জটিলতা ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি মিলেমিশে একাকার। বনু আসাদ গোত্র-কর্তৃক পিতা হজরের হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিশোধ-পরায়ণ উন্মাদ ইমরুল কায়েস পাঠকের মনে ট্র্যাজিক সুর রচনা করে। নির্বান্ধব ও ভগ্নহৃদয় ইমরুলের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালনাকারীদের সম্মুখে দাঁড়ায় এক বেদনাহত যুবক। সে আবস গোত্রের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কবি আনতরা। হাবশি দাসীর গর্ভে জন্মা আনতরাকে প্রত্যাখ্যান করে আবস গোত্রের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ফখরিয়া। তার গোত্রপতি চাচা শদ্দাদের ঔরসে জন্মালেও স্রেফ এক ক্রীতদাস আনতরা। ফখরিয়া বলে চলে,

> ...তুমি পুত্র নও। দাস। তুমি তার হাবশি দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া একজন আগরেবাতুল আরাব (কালো বর্ণের আরব)। আর দাসীর পুত্র সবসময় দাসই হয়। একজন দাস হয়ে কোন সাহসে আমার মতো সম্ভ্রান্ত নারীর দিকে চোখ তুলে তাকাও? প্রেমের পয়গাম পাঠাও? ... আমার উচিত ছিল আব্বাজানকে বলে তোমার চোখ উপড়ে নেবার ব্যবস্থা করা।

[*কবি ও কামিনী*, পৃ. ৬৮]

এ অপমান সইতে পারে না কোনো কবি। স্বয়ংবরা সভায় কবিতা পাঠে জিতে তবেই সে ফখরিয়াকে বশে আনে। কিন্তু অপমানিত কবি-হৃদয়ের ক্ষতস্থানটি তো মুছে যায় না। তাই প্রতিশোধের বিষমাখা তীর সে ছুড়ে দেয় ফখরিয়ার দিকে।

ওকাজ মেলায় রাতের অন্ধকার নেমে আসে, আলোকসজ্জিত মঞ্চের চারপাশে ভিড় করে নেকাবে মুখাবৃত মরুনারীর সঙ্গে ফখরিয়া বসা। শ্রেষ্ঠ কবিকে আজ সে বরণ করে নেবে। কবিদের প্রতিযোগিতায় জয়ী আনতরা। তার হৃদয় ফখরিয়ার দিকে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু

আজই যেন তার প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত সময়—

> ...আর এগিও না। আমি চাই না তোমাকে! চাই না তোমার প্রেমহীন বরমালা! তুমি যাও, সরে যাও আমার সম্মুখ থেকে! কোনো কবির সহধর্মিণী হওয়ার মতো মন তোমার নেই। আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি! প্রত্যাখ্যান করছি!
>
> [*কবি ও কামিনী*, পৃ. ৮২]

প্রেমাস্পদকে কাছে পেয়েও এমন প্রতিশোধ যার সে-কি ভালবেসেছিল? আনতরার ভেতরে প্রেমের আগুন ছিল বলেই পথে-বিপথে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই অস্বীকার তার নিজস্ব সত্তার

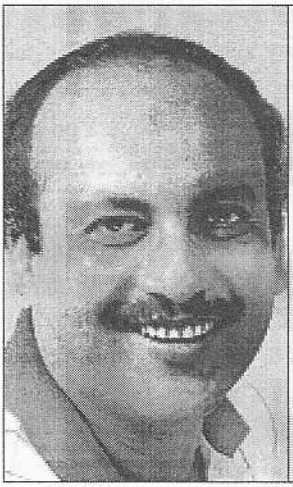

আরব-সংস্কৃতির এক বিশ্বস্ত বর্ণনা উপন্যাসের শুরুতেই দিয়েছেন লেখক। আরবদের প্রিয় বাদ্য মরু-সন্ধ্যায় বেজে ওঠা দফ। সে-বাজনায় পরিশ্রুত হয় পরিশ্রান্ত আরব-বেদুঈনের শরীর-মন। উটের পাখির বাসা নষ্ট করার সামান্য ঘটনা নিয়ে তঘলিব ও বকর গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বছরব্যাপী ঘটে বসুসের যুদ্ধ। উম্মুল জুনদব ব্যতিক্রম হলেও আরবজাহানে নারীর অবস্থা অবরুদ্ধ শায়খ বেধা পাখির মত। এ-প্রসঙ্গগুলো উপন্যাসে নির্মাণ করে বিশ্বস্ত পটভূমি।

জাকির তালুকদার

স্বীকৃতি। ইমরুল কায়েসের কাছে আনতরার নিজের প্রেমের বর্ণনায় তার ভেতরে সে-ধরনেরই আকুতি ছিল।

হাবশি কৃতদাস হবার কষ্টকে সে নিজের ভেতরে চালনা করে হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য এক মানব। নিজের মনিব ও পিতার কাছে স্বীকৃতি পাবার আশায় সে উদ্বেলিত হয়। কিন্তু তিনি তাকে চাকরের মতই জ্ঞান করেছেন। এটাই তৎকালীন আরব-সংস্কৃতি। কিন্তু যোদ্ধা ও কবিশ্রেষ্ঠ আনতরা আপন ক্ষমতা দিয়েই প্রমাণ করেছে তার ভেতরের শক্তিকে। বদ্ধ শৃঙ্খলিত সমাজে সে মানব-মুক্তির দূত। কিন্তু সুবিধাভোগী নয় বলে দাস-মুক্ত হবার পরও, শদ্দাদের স্বীকৃতি পাবার পরও, এমনকি মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বয়ংবর সভা জিতেও ফখরিয়াকে প্রত্যাখ্যান—তার অপ্রতিরোধ্য হার না মানা হার্দিক শক্তিরই অনন্য পরিচয়। ইমরুল কায়েসের চরিত্রের তুলনায় তাকেও লেখক কম দীপ্তি দিয়ে তৈরি করেননি। দুই বিপরীতমুখি সত্তার মিলন ও চাওয়া-পাওয়ার ভিন্নতায় জীবনের বিশাল বৈচিত্র্যকেই যেন স্থাপন করা হয়েছে।

ধনী-অভিজাত-অসংযত-আবেগী কবিকুল শিরোমণি ইমরুল কায়েসের পার্শ্বে আনতরা ও আল কামাহর প্রেমাবেগে যে ঐশ্বর্য তা লেখক তাদের চরিত্র-দৃঢ়তা দিয়ে, অন্তরের কবিত্বশক্তির গুণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রেণিব্যবধানের সকল সূত্র অবহেলা করা কবি আনতরা যেন সমকালীন আরব-সমাজের প্রথার বুকে পদাঘাত। পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত আনতরা জন্মদাতার কাছে পেয়েছিল নিঃসীম নিগ্রহ, মালিকসুলভ আভিজাত্য আর কর্কশতা। আনতরাকে গোত্র অধিবাসীরা অনারব বলেই অবজ্ঞা করতে চেয়েছিল। 'শিরার নিচ দিয়ে রক্ত নয়, বয়ে চলে কবিতার স্রোত'—সে-কাব্যশক্তিতে দেদীপ্যমান হয়েই সে যেন আত্মপ্রতিষ্ঠার মহান বাণীকে গ্রহণ করেছে। সে-সঙ্গে মুক্তির বার্তা ঘোষণা করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে শত বছরের শৃঙ্খলে বন্দি অন্ধকার-আরবকে। পিতা ও মালিক শদ্দাদকে গজল-কাসিদার পরিবর্তে সে প্রদর্শন করে তার পরাধীনতার যন্ত্রণাদগ্ধ আবেগ :

> ...এখন কবিতা হবে না।
> কেন এখন হবে না কেন? আমি চাইছি। তবু কবিতা হবে না কেন?
> কবিতা কারো হুকুমে তৈরি হয় না। কবিতা স্বাধীন। কোনো গোলামের কণ্ঠে কখনো কবিতা আসে না। এখন আমার কণ্ঠেও আসবে না।
>
> [*কবি ও কামিনী*, পৃ. ৭৩-৭৪]

কিন্তু যুদ্ধে যারা মালিক-পক্ষের হয়ে অস্ত্র ধারণ করে তারা তো আনতরার মত ক্রীতদাস। আক্রমণকারীরা এলে মালিক শদ্দাদ তাই তাকে হুকুম করে অস্ত্রধারণের জন্য। কিন্তু আনতরা আজ অস্ত্র ধারণ করবে না। শিল্পীর চৈতন্য জগতের অনিয়মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এতদিনের প্রশ্নহীন অস্তিত্বকে এবার সে জাগিয়ে তুলে নিজেকে তুলাদণ্ডে মাপার সুযোগ অর্জন করে। তার প্রশ্ন :

> ...কেন যুদ্ধ? কার জন্য যুদ্ধ? যুদ্ধে জিতলে কার লাভ? লাভ শুধু মালিকেরই। আনতরা যে গোলাম সেই গোলামই থেকে যাবে। সে কেন অন্যের যুদ্ধ লড়তে যাবে?
>
> [*কবি ও কামিনী*, পৃ. ৭৫]

পরিশ্রমের ফসল যখন তাদের পাওনা নয় মালিকের পক্ষে যুদ্ধ করা তখন অবান্তর। নিছক ক্রীতদাসত্বের বোঝা বইয়ে চলা আনতরা তাই সুযোগ বুঝেই তার ও তার মায়ের মুক্তি ছিনিয়ে নেয়।

অন্যদিকে কবি আল কামাহ চরম দারিদ্র্য নিয়েও প্রজ্জ্বল অগ্নিপ্রাণ এক প্রেমিকসত্তা। সামান্য খাদ্যের সংস্থান নেই তার ঘরে। দরিদ্র পিতার দাঁড়িতে বিশীর্ণভাবে লেগে থাকে ছাগলের বাটে দুধ পানের রেখা। দুফোঁটা ছাগলের দুধ নষ্ট হবার ভয়ে পাত্রে না রেখে সরাসরি পান করে পিতা। জীর্ণকুটিরে আল কামাহর বাস। কিন্তু দারিদ্র্যের চেয়েও মহান তার প্রেমাভিষেক।

কবি ও কামিনী প্রেমোপাখ্যানকে ঔপন্যাসিক কবিত্বের দারুণ শক্তির মোড়কে আবৃত করেছেন। উপন্যাসের বর্ণনার পরতে পরতে ইসলামপূর্ব যুগের আরব-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়া যায়। জাকির তালুকদারের বর্ণনার গুণে সে-আরব যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। প্যাগান-সংস্কৃতির আরবেও ছিল শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মানুষের সুতীক্ষ্ণ অনুভব।

আরব-সংস্কৃতির এক বিশ্বস্ত বর্ণনা উপন্যাসের শুরুতেই দিয়েছেন লেখক। আরবদের প্রিয় বাদ্য মরু-সন্ধ্যায় বেজে ওঠা দফ। সে-বাজনায় পরিশ্রুত হয় পরিশ্রান্ত আরব-বেদুঈনের শরীর-মন। উটের পাখির বাসা নষ্ট করার সামান্য ঘটনা নিয়ে তঘলিব ও বকর গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বছরব্যাপী ঘটে বসুসের যুদ্ধ। উম্মুল জুনদব ব্যতিক্রম হলেও আরবজাহানে নারীর অবস্থা অবরুদ্ধ শায়খ বেধা পাখির মত। এ-প্রসঙ্গগুলো উপন্যাসে নির্মাণ করে বিশ্বস্ত পটভূমি।

প্রতিবছরের ওকাজ মেলায় ঘটে কবিদের অংশগ্রহণ, কবিতা পাঠ, প্রতিযোগিতা। গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধপ্রিয় আরবেও কবিরা সম্মানীত। বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতাকে তারা ঠাঁই দেয় লাত-মানাত-ওজ্জা দেবতা-অধ্যুষিত কাবাঘরের দেয়াল গাত্রে। উৎকৃষ্ট সোনালী মিশরীয় বস্ত্রে কবিতা-উৎকীর্ণ হয়ে আচ্ছাদিত হয় কাবাঘর। লেখকের ভাষায়,

> ... আরবদের শরীরে চামড়ার তলা দিয়ে কেবল রক্তের নদী নয়, বয়ে চলে কবিতারও নদী।
>
> [*কবি ও কামিনী*, পৃ. ২৩]

আরবদের কবিতায় রয়েছে নানা মনোমোহিনী ছন্দ। তভিল, মদিদ, বসিত, ওয়াফির, কামিল, হজজ, রজজ, রমল, স'রি, মুনসরিহ, খফিফ, মুদারি, মুক্তদিব, মুজতস, মুতাকারিব, মুতাদারিক— ষোল রকম ছন্দে কবিতার নহর বইয়ে দেয় আরব কবিকুল। একজন কবি আরবদের কাছে অনির্বচনীয় শান্তিসুধা বহনকারী অমৃত-ঝরঝর মানবাত্মা। উপন্যাসের বর্ণনায়—

> ...কবি হচ্ছে সে-ই, যার রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। সে পারে শব্দ দিয়ে মানুষের বুকের মধ্যে অনুভূতির নতুন নতুন নহর সৃষ্টি করতে। একজন কবিই কেবল হতে পারে তার গোত্রের সবসময়ের মুখপত্র; শান্তির পথপ্রদর্শক আর মন্ত্রণাদাতা; যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের প্রতীক। কবি না হলে কেউ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হতে পারে না, জ্যোতির্বিদ্যার রহস্য শিখতে পারে না, দেবতার অস্ফুট ইঙ্গিতের রহস্য উন্মোচন করতে পারে না।
>
> [*কবি ও কামিনী*, পৃ. ২২]

উপন্যাসে বর্ণনায়, চরিত্রের অন্তর্লোকের সৌন্দর্য আবিষ্কারে ও বিষয়বস্তুর গঠনে জাকির তালুকদার সর্বাঙ্গে আধুনিক এক প্রেমকাহিনি নির্মাণ করেছেন। নাটকীয়তায় ভরা এ-আখ্যানের কাহিনি আরব-ভূগোলের উপল-বন্ধুর পরিবেশে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। তিনি বহু পুরনো এক কাহিনির নব-নির্মাণ করেছেন। আধুনিক উপন্যাস হলেও মধ্যযুগের শিল্পকৃতির স্বীকৃত 'উপাখ্যান' নামটিই তিনি নির্বাচন করেন। এজন্য তা হয়ে ওঠে *আইয়ামে জাহেলিয়ার প্রেমোপাখ্যান*। *লাইলি-মজনু, শিরি ফরহাদ, ইউসুফ-জুলায়খা, গুলে বকাওলি* প্রভৃতি মধ্যযুগের আরব-ইরানের কাব্যচ্ছটা এ-উপন্যাসের পরতে পরতে।

১. ... আল কিন্দি মরুদ্যানে যেন নেমে এসেছে সহস্র রংধনুর বর্ণালী। ইয়াকুতের আতরদানিতে মৃগনাভি বিতড়িত হচ্ছে হাতে হাতে। ঝরনার পানিতে মেশানো হয়েছে মেশ্‌ক-আম্বর। আলোক-পিছলানো পোষাকসজ্জিত নারী-পুরুষ অজস্র ধারায় বর্ষণ করছে ফুল, হাসি আর

শুভকামনা।

[*কবি ও কামিনী*, পৃ. ১১]

২. ...গরমের শ্বাসের চেয়ে ঢের কামনার দারাতে জুলজুলের শীতল ইশারা। পুকুরের পাড়ে পৌঁছেই শীতের ঝরাপাতার মতো টুপটাপ ঝরে পড়ে একচল্লিশ যুবতীর অঙ্গের বসন। ব্যগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করে সবাই দারাতে জুলজুলের পানিতে। যেন একদল রাজহংসী অপেক্ষা করছিল পানিতে নামার জন্য। আবার পানিও যেন অপেক্ষা করছিল তাদের স্পর্শের জন্যই। পানির জলছলাৎ আর যুবতী কণ্ঠের কলকাকলীতে ভয় পেয়ে খেজুর পাতার আড়াল থেকে উড়তে শুরু করে পাখির ঝাঁক। টলটলে জল-পিছলানো যুবতী শরীরে সূর্যকিরণ ঠিকরে যেন চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সূর্যেরই।

[*কবি ও কামিনী*, পৃ. ৪০]

আরব-পটভূমি না হলে দ্বিতীয় স্তবকের বর্ণনায় স্নানরতা উনায়জা ও সখীদের দেহসৌষ্ঠবে ভারতীয় রাধার প্রতিমূর্তি কল্পনা করা অসম্ভব নয়। কাব্যবোধ এ-বর্ণনা আরো জীবন-ঘনিষ্ঠ। উপন্যাসে ধ্রুপদী কাব্য-ভাষা যেন আধুনিক গদ্যে রূপান্তরিত। এ-উপন্যাসের বর্ণনা ও কথনভঙ্গির আড়ালে ঝরঝরে গদ্যশৈলীতে পুরনোগন্ধি শাব্দিক ব্যঞ্জনা দুর্লক্ষ নয়। উপন্যাসের আকার না দিলে এ-আখ্যানের ভাষাভঙ্গির ধ্রুপদ চালে কাহিনিমূলক প্রেমকাব্য লেখা যেত অনায়াসে।

অন্যদিকে মধ্যযুগের অলৌকিক মেদ নির্ভারতা থেকে এ-আখ্যানের মুক্তি ঘটে। মায়ের আদেশে যুলখলস্বহ মন্দিরে ইমরুল কায়েসের উপস্থিতি, পিতৃহত্যার প্রতিশোধে না-বোধক তীর ওঠানো— বিষয়গুলো অলৌকিকতার মোড়কে অঙ্কন করা। আমর বিন লুইয়ার স্বপ্নযোগে দৃশ্যমান জেদ্দার খাড়িতে আটকা পড়া মূর্তি আরব জাহানে স্থাপিত হয়েছিল। আরবদের কাছে তার সম্মান অনেক, তারা এ-মন্দিরকে বলে 'ইয়ামেনের কাবা'। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের শরীর-সংস্থানে লেখক তাকে অতিক্রম করেন ইমরুল কায়েসেরই অপ্রতিরোধ্য আবেগের প্রাবল্যে। তাই যুলখলস্বহ মন্দিরের কাহিন (পুরোহিত)-এর নিষেধবাণী উপেক্ষা করে প্রতিশোধ-জর্জর ইমরুল কায়েস পিতৃহত্যার বদলা নিতে চায়। জাকির তালুকদার একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ভিন্নভূগোলের এক কাহিনি নির্মাণে নানাদিক থেকেই মুন্সিয়ানার সাক্ষর রেখেছেন। একটি কবিসত্তার অন্তর্গূঢ় নির্ঝরনী যেন বহমান তার ঔপন্যাসিক সত্তায়। কবি ইমরুল কায়েসের উচ্চণ্ড স্বভাব, ভোগাকাঙ্ক্ষা, কামনার অনিঃশেষ প্রবহমানতা সত্ত্বেও সে পাঠকের সহানুভূতি হারায় না কখনো, এখানেই এ-চরিত্রের শক্তি। তাকে ঘিরে শেষপর্যন্ত টিকে থাকে যে অসীম বেদনাবোধ তা প্রত্যেকটি অনুভূতিপ্রবণ পাঠক-চিত্তে চিরজাগরূক থাকে। উম্মুল জুনদবের পরিয়ে দেয়া বিষময় পোশাকের পরিণতিতে শরীরী বাঁধন খসে পড়া ইমরুল কায়েসের মুখ দিয়ে শুধু কবিতাই উচ্চারিত হয়। কিন্তু হিংস্রতা অপেক্ষা করছে তার দেহ-বিগলিত মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য। নির্মম-পরিণতির শিকার সেই কবিই যখন আকাশে উড্ডীন শকুনকে 'ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে

বলে— কবিতা শুনবি?'— তখন অনিঃশেষ এক কবিসত্তার স্বীকৃতি এ-কাহিনিকে শাশ্বত শৈল্পিক সুবাতাসে অবগাহন করায়।

খোরশেদ আলম: জন্ম ৪ মে ১৯৮০। পেশা: বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা।

প্রাপ্তি উৎস: প্রকৃতি, কনকর্ড এম্পোরিয়াম কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

রূঢ় বাস্তবতা, খটখটে ডাঙা ও *সাবিত্রী উপাখ্যান*

রাজীব সরকার

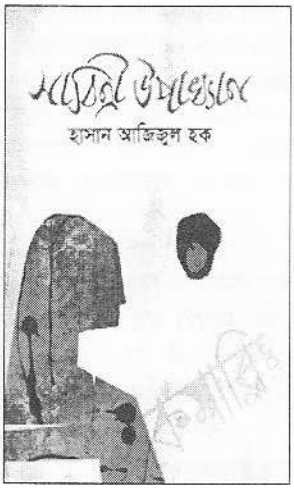

সাবিত্রী উপাখ্যান
হাসান আজিজুল হক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
২২২ পৃষ্ঠা
৩২৫ টাকা

দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক ধরে হাসান আজিজুল হক তাঁর সৃষ্টিশীলতা দিয়ে বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটগল্পে সাফল্যে এতটা হওয়া সত্ত্বেও তিনি উপন্যাস লেখার ব্যাপারে দীর্ঘকাল যে নিরাসক্তি দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর! প্রায় সত্তর বছর বয়সে উপনীত হয়ে প্রথম উপন্যাস লিখে তিনি সে জড়িমা ভাঙলেন এবং পঁচাত্তর বছর বয়সে দ্বিতীয় উপন্যাস লিখে রক্ষা করলেন এর ধারাবাহিকতা। এতটা পরিণত বয়সে এসে উপন্যাস রচনা শুরু করে এভাবে সক্রিয় থাকাও এক বিরল সামর্থ্য।

রাঢ়বঙ্গ-পূর্ববঙ্গ-উত্তরবঙ্গ—এই তিন ভুবন হাসানের ছোটগল্পের বৈচিত্র্যময় তট। সেই তটে নোঙর ফেলে বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ। প্রায় সকলেই প্রাকৃতজন—স্থানিকতা ও আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ। কিন্তু তাদের উচ্ছ্বাস-আর্তি, স্বপ্ন-রোদন, সংগ্রাম-বিরহ আঞ্চলিকতার পরিসর ভেঙে বিচিত্রগামী ও সর্বজনীন। হাসানের ছোটগল্প স্বদেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অনাস্বাদিত সত্তাকে উন্মোচন করে আমাদের সামনে, প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় সচেতন পাঠককে। নিয়ত

বৃত্তভাঙ্গা এই লেখক তাঁর পাঠকদেরকে নিয়ে যান 'পাতালে হাসপাতালে', জ্বালিয়ে দেখান 'জীবন ঘষে আগুন', অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাঠকদেরকে অঙ্গীকার করান 'রোদে যাবো' বলে; আশাবাদের স্বপ্ন দেখিয়ে বলেন, 'আমরা অপেক্ষায় আছি'। 'শকুন', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'মন তার শঙ্খিনী', 'ঘের', 'মা-মেয়ের সংসার' 'জননী' প্রভৃতি গল্পে গ্রামীণ অন্ত্যজজীবনের বহুস্বর এক অবিস্মরণীয় মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়।

বাংলা উপন্যাসের কাছে নিজের প্রত্যাশার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন স্পষ্টভাবেই। বাংলা *কথাসাহিত্যের কথকতা* (১৯৮১) প্রবন্ধগ্রন্থে। প্রথম প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসকে তিনি পর্যালোচনা করেছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। সেই সময়ের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে তীব্র নির্মোহ মন্তব্য করেছেন। এক পর্যায়ে বলেছেন :

> ...বাঙালি ঔপন্যাসিক ঘটনার ছিবড়ে নিয়ে টানাটানি করেছেন, দেশের সঙ্কটের মূলে কখনো যাননি।
>
> [পৃ. ১৮]

বিংশ শতাব্দীর চার ও পাঁচের দশকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহই যে সবচেয়ে প্রতিভাবান ও শক্তিমান একথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর বিবেচনায়—

> ...বাংলাদেশের উপন্যাসে কিভাবে অচেতন প্রয়াসের ক্লান্তিকর অনুবর্তনের মধ্যে প্রথম সচেতন শিল্পীর পদপাত ঘটে তা বুঝতে গেলে আমাদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। জীবননিষ্ঠা ও আধুনিক শিল্পপ্রকরণ, তীব্র শৈল্পিক সচেতনতা ও দক্ষতা, স্নায়ু-ছেঁড়া সংযম ও পরিমিতিবোধ, নিচু ও নির্বিকার উচ্চারণ—আধুনিক সুনির্মিত উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহতে পাওয়া যায়। 'লালসালু' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উপন্যাস আধুনিক কথাসাহিত্যে প্রবেশ করে।
>
> [পৃ. ২১]

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ যে পরবর্তী দুটি উপন্যাসে দৈশিক বাস্তবতার সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতে পারেননি, কামুর প্রভাবের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছেন—এমন অভিযোগও রয়েছে তাঁর। *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসের ঐশ্বর্য ও শক্তি স্বীকার করেও হাসান বলেন, ওয়ালীউল্লাহ বাংলাদেশ ও বাঙালির ঔপন্যাসিক থাকেন না শেষ পর্যন্ত। তাঁর মনোভাবে শুধু নয়, উপন্যাসের মূল শরীরেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিদেশি উপস্থিতি। তাঁর সম্পর্কে হাসানের নিরাসক্ত মূল্যায়ন:

> ...'চাঁদের অমাবস্যা' বা 'কাঁদো নদী কাঁদো' বিদেশে বসে শক্ত কলমে অসাধারণ বাংলা ভাষায় লেখা ইউরোপীয় উপন্যাস।
>
> [পৃ. ৩৮]

অর্থাৎ হাসান আজিজুল হক খাঁটি বাংলা ভাষায় বাঙালির অকৃত্রিম উপন্যাস চান যা একইসঙ্গে দেশজ মৃত্তিকা ও কালসংলগ্ন।

> ...কোনো মতেই কি আমাদের কথাসাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে, বাঁচার আনন্দ, বেদনা, যন্ত্রণা, উপভোগ, ভালোবাসা, ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনা আমরা?
>
> [পৃ. ৪২]

উপর্যুক্ত প্রশ্নের জবাব হাসান এতদিন সার্থকতার সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর অসাধারণ সব ছোটগল্পে। সেই জবাব আরও বৃহত্তর পরিসর খুঁজে পেল তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস *সাবিত্রী উপাখ্যান*-এ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয় ঘোষণা করে 'বুর্জোয়া আর্ট ফর্ম' রূপে পাশ্চাত্যে একদিন উপন্যাসশিল্পের অভ্যুদয় ঘটেছিল। মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তা ও বোধের জাগ্রত হওয়ার ফসল উপন্যাস। উপন্যাসে একদিকে যেমন যুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা, তেমনি যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপাদান। উপন্যাসের বহুতলবিশিষ্ট দায়ের মধ্যে একমাত্র অন্বিষ্ট হচ্ছে মানুষ এবং মানুষের জীবনের কেন্দ্রমূল অনুসন্ধান। সমাজ ও স্বকালের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েও আধুনিক ঔপন্যাসিক এই দুইয়ের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গতি আবিষ্কারের প্রতি বেশি সচেষ্ট। নতুন ধারার উপন্যাস অন্বেষণে প্রয়াসী কথাশিল্পী দেবেশ রায় বলেছেন :

> ...উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ আর ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বরাবরই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তি মানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।
>
> [*দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, পৃ. ৫১]

ব্যক্তিই তাই প্রধান অন্বিষ্ট নতুন ধারার উপন্যাসে। *সাবিত্রী উপাখ্যান* এ ধারারই উপন্যাস। হাসান আজিজুল হকের প্রথম উপন্যাস *আগুনপাখির* (২০০৬) মতো *সাবিত্রী উপাখ্যানও* একজন নারীর কথা; দুই নারী অবশ্য বিপরীত মেরুর। এই উপন্যাস সাবিত্রীর অতি দীর্ঘ জীবনের বয়ান। প্রতি মুহূর্তে দলিত পিষ্ট এই নারী প্রত্যাঘাতে অক্ষম। স্বামীর সঙ্গে তার মিলন হয় না। প্রথম যৌন অভিজ্ঞতাটি নারকীয় পৈশাচিকতায় দীর্ণ, এর ধারাবাহিকতায় অবিরত ছিন্নভিন্ন হতে থাকে তার পার্থিব শরীর, অনন্তকাল ধরে। যেন এক অন্তহীন কালরাত। অবশেষে লেখককেই হার মানতে হয় সাবিত্রীর অসহনীয় নিগ্রহের কাছে। সাবিত্রীর দুর্গতির বর্ণনা দিতে দিতে লেখকের বর্ণমালা বেঁকে যায়।

সাবিত্রীর সৌন্দর্য অতুলনীয়। লেখক তিল তিল করে তাকে গড়ে তুলেছেন। তার রূপের বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের রূপের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাবিত্রীর সহচর নিশিবালা বলে,

> ...মাগো মা, মানুষ এত সোন্দর হয় গো দিদি! লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুগ্‌গা-পিতিমে এমন সোন্দর হতে পারে না। তাই বলে দিদি, এত রূপ নিয়ে তুমিই বা কি করবে আর এই পোড়া সংসারই বা কি করবে।
>
> [পৃ. ১৮]

সাবিত্রী ব্রাহ্মণকন্যা, শাস্ত্রের নিয়ম মেনে সাত বছর বয়সে তার বাবা গৌরীদান করেন। পিতৃ-মাতৃহীন সাবিত্রীর একমাত্র সঙ্গী তার চেয়ে বয়সে একটু বড় হাড়িদিদি অর্থাৎ নিশিবালা। সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ির দারিদ্র্য ঘোচে না। স্বামী দুকড়ি কলকাতায় যেতে চায় কাজ খুঁজতে। সেজন্য প্রয়োজন দশ টাকা। টাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে সাবিত্রকেই।

টাকার জন্য সাবিত্রী নিজের বিয়ের গয়না, অনন্ত বাঁধা দেয়। টাকা পেয়ে দুকড়ি চলে যায়। বিপদে পড়তে হয় সাবিত্রীকে। ক'দিন পরে তাকে পতিগৃহে যেতে হবে। সেখানে শুরু হবে তার সংসারযাত্রা। এর আগে গয়না ছাড়িয়ে নিতে হবে। নিশিবালার হাতে গয়না ফেরত দেয় না মহাজন দুর্গাপদ। সাবিত্রীকেই যেতে হবে তার কাছে। পূর্ণিমার সেই রাতে দ্বিধান্বিত চিত্তে বাড়ি থেকে বের হয় সাবিত্রী।

দুর্গাপদ ওরফে তেলা, বটকৃষ্ণ ও সবুর নলিন কেওটের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মেতে সাবিত্রীর পথ রুখে দাঁড়ায়। মনুষ্যরূপী এই শ্বাপদকুল পালাক্রমে সাবিত্রীর কুমারী দেহ লুণ্ঠন করে। কে আগে সাবিত্রীকে ভোগ করবে—এ নিয়ে কিঞ্চিৎ বচসা হয় তাদের মধ্যে। এতে

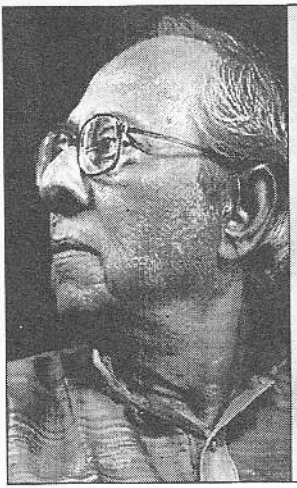

১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলমানদের সাফল্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, হিন্দু-মুসলিম টানাপড়েন, ফজলুল হকের প্রজাস্বত্ব আইন—ইতিহাসের অনিবার্য উপকরণগুলো অবলীলায় ঠাঁই পায় *সাবিত্রী উপাখ্যানে*। এভাবে মানব-ভাগ্যের পাঠোদ্ধারের দুর্মর দুঃসাহস, ঘটনাপুঞ্জের বহুরূপী ছলাকলা ভেদ করে তার স্ফটিকস্বচ্ছ সারাৎসার পরম মমতায় ও চরম নিস্পৃহতায় তুলে এনে সত্য কাহিনীকে সৃষ্টিশীল কল্পনায় লেখক বেগবান করে তুলেছেন।

হাসান আজিজুল হক

সাবিত্রীর কোনো লাভ হয় না, সর্বনাশের পালা আরম্ভ হতে কিছুটা দেরি হয়। সর্বনাশের সূচনা ঘটায় দুর্গাপদ। লেখকের অনুকম্পাহীন বর্ণনায়—

> ... সে (দুর্গাপদ) হাত বাড়িয়ে সাবিত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। বটা, হাত দুটো চেপে ধর, সবুর, তুই ধর পা দুটো। আগে ধরতো, তারপর দেখছি। ঘাড়ে কাজ এসে পড়ল। ওদের খিদেটিদে মাথায় উঠল। সাবিত্রী এখন শুধুই মাথা নাড়তে পারে, মাথার পেছনটা ঠুকতে পারে বালির ওপর আর একটানা না, না, আমার সব্বোনাশ কোরো না, কোরো না। ভীষণ বিরক্ত দুর্গাদাস বটার দিকে চেয়ে বলল, মুখটা চেপে ধরতে পারছিস না! দুই হাতের ওপর বোস, মুখটা চেপে ধর। খুব ধীরে ধীরে কাজ এগোতে লাগল। দুর্গাপদ সাবিত্রীকে ভালো করে শুইয়ে দিচ্ছে। নিজের হাতে সাবিত্রীর পা দুটোকে শান্তভাবে বিছিয়ে দিচ্ছে। তারপর নাভির ওপর ধীরে ধীরে চেপে বসছে, সবুর আস্তে আস্তে পা দুটো হাঁটু অব্দি গুটিয়ে দিচ্ছে, শাড়িটা এতক্ষণে বাতাসে উড়ে গিয়ে একটা মাটির ঢিবিতে আটকে রক্ত-পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে। দুর্গাপদ সযত্নে শুয়ে পড়ল সাবিত্রীর ওপর। ইস্পাতের একটা বল্লম স্বচ্ছ আচ্ছাদনটুকু ছিঁড়ে মাখনের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছুল। সাবিত্রী আর একবার মাত্র চিৎকার করে

উঠল। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ, সংক্ষিপ্ত মৃত্যু-চিৎকার এই একটাই।'

[পৃ. ৩৫]

অদ্ভুত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে হাসান এই বীভৎস দৃশ্য রচনা করলেন। এই পাশবিকতার পুনরাবৃত্তির বর্ণনা দিয়েছেন বারবার। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এমন পাশবিক ঘটনা বয়ানের সিদ্ধি লেখকের অনায়াসলব্ধ যার প্রমাণ রয়েছে তাঁর একাধিক গল্পে। স্মরণ করা যাক 'মা-মেয়ের সংসার' গল্পটি। এই কাহিনীতেও ভক্ষকের ভূমিকায় চারটি দ্বিপদী জন্তু যারা পালাক্রমে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে। এখানেও হাসান নিস্পৃহ ও ক্ষমাহীন :

> ...গোলপাতার বনে একরকম কাদার মধ্যেই ওরা চিৎ করে শুইয়ে দিলো মেয়েকে। একজন গেল পেচ্ছাপ করতে। কাদার উপর দাঁড়িয়ে সে তলপেট খালি করে খলখল শব্দে পেচ্ছাপ করলো, অন্য তিনজনের একজন মেয়েকে মাটিতে চেপে ধরে রাখলো, একজন তার মুখে গামছাটা আর একটু গুঁজে দিয়ে ধরে রইল আর তৃতীয়জন তৈরি হতে লাগলো। মা-মেয়ে এমনি একা যে মেয়ে জ্ঞান হয়ে অব্দি ভালো করে পুরুষ মানুষ প্রায় দেখেইনি। কি করে কি হয় সে জানে না, মা-ও কোনোদিন তাকে বলেনি। চোখদুটি তার খোলা ছিল, আবছা আঁধারে পুরোদস্তুর ন্যাংটো একটা পুরুষমানুষ সে এই প্রথম দেখল। আতঙ্কে হয়তো তখুনি অক্কা পেত। তবে এটা বাঘ-বাঘিনীর এলাকা। ত্রাসে দম আটকে এলেও সে চেয়ে রইলো, ছোরা বেঁধানোর তীব্র যন্ত্রণায় একবার উঠল মেয়ে। গলার প্রায় ভিতর পর্যন্ত কাপড় গোঁজা থাকায় আওয়াজটা গোঙানির বেশি কিছু হলো না। চারজনে চারবার দখল করল তাকে। চারজনের শেষ হয়ে যাবার পর প্রথমজন আর একবার। মেয়ের তাতে কিছুই যায় আসেনা, তার জ্ঞান ছিলোনা। লাল রক্তমাখা ঢলঢলে কালো কাদার বিছানায় সে শুয়ে রইল। খানিক পরে মা-ও নিজেদের ঘরে মেয়ের মতোই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে রইল। দুজনের ভাত চারজনে ভাগ করে খেয়ে শেয়াল চারটে এইবার হুক্কা-হুয়া আওয়াজ তুলে চলে গেল।

[পৃ. ৩]

তবে *সাবিত্রী উপাখ্যানে* দলবদ্ধভাবে ভোগ করার পর দুর্গাপদরা বিপদে পড়ে—এই জীবন্ত খাবার নিয়ে কী করবে তারা। ছেড়ে দিলে জেলে যেতে হবে, ফাঁসির আশঙ্কাও রয়েছে। এদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বোঝাতে হাসান লিখেছেন :

> ...তাদের শিশ্নগুলি একেবারে গর্তে ঢুকে পড়েছে। নিরেট তালাবন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা!

[পৃ. ৪০]

ঘটনাচক্রে ধর্ষণকারীদের একজন সবুরের 'সবুরে মেওয়া ফলে'। সাবিত্রীর একক মালিকানা পায় সে। গ্রামে, গঞ্জে, বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে সবুরের সঙ্গে নারকীয় কাল পাড়ি দিতে থাকে সাবিত্রী। আশ্রয়দাতাদের প্রায় সবাই—সৈয়দ, হুদা, মওলা, বখশ সাবিত্রীর শরীর জবরদখল করে। কলাকাতা-বগুড়া-বর্ধমান সর্বত্র সাবিত্রীর একই অভিজ্ঞতা—পৌনঃপুনিক ধর্ষণ। দ্বিপদী জন্তুদের রিরংসা ও সামূহিক অন্যায়ের সামনে সাবিত্রীর নীরব হাহাকারের ধিক্কার বারবার পরাজিত হয়। লেখকের অনন্য ভাষাশৈলীতে :

> ...অন্ধকারে পৃথিবী দুলছে নাগরদোলার মতো—উঠছে, নামছে, উপরে উঠে গেলেই ভয়ানক বমি পাচ্ছে—হুশ করে যখন নিচে নেমে আসছে তলপেট হয়ে যাচ্ছে ফাঁকা।

> এত অসহ্য এত তীব্র! এত অসহ্য কি—যন্ত্রণা নয় কি? এত ভয়ানক কষ্টই বা কি জন্যে, আনন্দই কি সেটি? কোনো আনন্দই তো এমন হয় না। কোনো কষ্টই কি এরকম হয়? স্রেফ জন্তুশরীর ছাড়া যেন আর কিছু নেই। শরীরের ওপরে কি মানুষ, জানোয়ার, হিন্দু, মুসলমান, মুচি, বাউরি, কাহার? নাকি কেউ নয়, আকাশ থেকে নেমে আসা আগুনের একটা হল্কা? এই এবার সেটা আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, মনে হচ্ছে বুঝি ফুঁড়েই বেরিয়ে গেল আকাশের পাতলা চাদর।
>
> [পৃ. ৬৯]

দেশভাগের দশ বছর আগেকার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখিত *সাবিত্রী উপাখ্যান*। উপন্যাসে তাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অমোঘ সত্য গোপন থাকে না। বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণের ঘটনায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলমানদের সাফল্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, হিন্দু-মুসলিম টানাপড়েন, ফজলুল হকের প্রজাস্বত্ব আইন—ইতিহাসের অনিবার্য উপকরণগুলো অবলীলায় ঠাঁই পায় *সাবিত্রী উপাখ্যানে*। এভাবে মানবভাগ্যের পাঠোদ্ধারের দুর্মর দুঃসাহস, ঘটনাপুঞ্জের বহুরূপী ছলাকলা ভেদ করে তার স্ফটিকস্বচ্ছ সারাৎসার পরম মমতায় ও চরম নিস্পৃহতায় তুলে এনে সত্য কাহিনীকে সৃষ্টিশীল কল্পনায় লেখক বেগবান করে তুলেছেন।

সাবিত্রীভোগের পালা এক সময় শেষ হয়। সাবিত্রীকে ফেলে সবুর চলে যায়। সাবিত্রীর ভাই তাকে উদ্ধার করে ধর্ষণের মামলা করেন। ভাইয়ের সংসারে অতিবাহিত হতে থাকে সাবিত্রীর যৌবন। সাবিত্রীর বয়স বাড়ে, মামলার আয়ু বাড়ে। সাবিত্রী বৃদ্ধ হয়। তার বয়স যখন পঁচাশি তখন এ উপাখ্যানের আরম্ভ। এ ফ্ল্যাশব্যাক আমাদেরকে নিক্ষেপ করে ঘূর্ণাবর্তে, যেখানে নিস্তারহীন ভবিষ্যৎ রচনা হবে সাবিত্রীর। সাবিত্রী এখন নিস্তেজ। পূর্ণিমার আলোকে সে ভয় পায়, অন্ধকারে প্রাণের প্রেরণা খোঁজে। যে শরীরের অনন্য সৌন্দর্যস্নাত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক সেই শরীরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে সাবিত্রীর মন :

> ...এখন আর তার শরীর নেই। খুব সাধের শরীর, কতো পাওনা তার, কিছু না পেলে কি ভয়ানক ক্ষিধে, কি ভয়ানক তৃষ্ণা, সেই শরীর তার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ। এখন আর তার সেটার দরকার নেই। এই সবের মধ্যে যেখানে সে সাবিত্রী সে এখন মুক্ত। হাজার দরজা তার আর পৃথিবীতে এখন এত হাওয়া!
>
> [পৃ. ১৩৪]

মুক্ত সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত মুক্ত থাকে না, ১৯৩৭-৩৮ এ অবসান ঘটে না এই মর্মান্তিক নরকযাত্রার। বরং সাবিত্রী উপাখ্যান পুনরাভিনীত হয় এই জনপদে এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও। নাম শুধু পাল্টে যায়। ঘটনা, চরিত্র আগের মতোই থেকে যায়। কোনো কোনো সমালোচক সন্দেহ পোষণ করে বলেছেন, এই বীভৎস (অবাস্তব কি?) কাহিনী রচনা করে হাসান পাঠকের স্নায়ুতন্ত্রের পরীক্ষা নিয়েছেন। হাসান কোনো অতিরঞ্জন করেননি। বাস্তবিক বীভৎসতা যদি আমাদের স্নায়ুর উপর বুলডোজার চালাতে না পারে তবে কাহিনীর এমন কী সাধ্য তা করার? যদি হাসান তা পেরে থাকেন সেটি তাঁর শিল্পসিদ্ধি। অগণিত ঘটনার মধ্যে। এক যুগ আগে এদেশে সংঘটিত এক পাপাখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে। ঘরে মা-মেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। বাইরে ১০/১২ জন লম্পট সন্ত্রাসী দরজায় কড়া নাড়ছে। মা

অনুনয়ের ভঙ্গিতে মনুষ্যরূপী পশুদেরকে বলছেন, "বাবারা, তোমরা ২/৩ জন করে এসো। আমার মেয়েটি ছোট। তোমরা সবাই একসঙ্গে এলে সে মরে যাবে।" হাসানের *সাবিত্রী উপাখ্যান* কি এর চেয়ে নির্মম ও বর্বরোচিত?

যত নির্মমই হোক হাসান কখনো স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন :

> ...কথাসাহিত্যিকের কাজ তাই জাদুর কাঠি বুলিয়ে বাস্তবকে ভুলিয়ে দেওয়া হতে পারে না বরং তাঁর পালন করা উচিত শল্যচিকিৎসকের নিষ্ঠুর নিস্পৃহ ভূমিকা। সমকালীন জীবনের বাস্তবতার ছবি আঁকাই নয় শুধু, এমনকি সামগ্রিক ছবি দেওয়াও নয়, তাঁর কাজ সমকালীন জীবনকে আমূল কেটে কেটে বিশ্লেষণ করে দেখানো, সবকটি স্তর, সবরকম আঁশ, তার গভীরতম স্বরূপ, জীবনের সমস্ত তন্তু আলাদা করে ফেলা এবং একেবারে চোখের সামনে আনা। এই বিশ্লিষ্ট করার কাজের পর তাঁর জন্যে থেকে যায় সংশ্লেষণের সংযোজনের কাজ—না হলে সমগ্র পাওয়া যায় না—সমগ্রে সমগ্র এবং অংশে প্রতিফলিত সমগ্র।
>
> [কথাসাহিত্যের কথকতা, পৃ. ২৯]

বাস্তবতার এই সামগ্রিক চিত্র অংকনে এক নিষ্ঠুর ও নিখুঁত জীবনশিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন লেখক। আশঙ্কা জেগেছে এই বোধহয় বিচ্যুতি ঘটলো। কিন্তু শিল্পীর নিপুণ হাত একটুও কাঁপেনি, কোনো রেখা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, কোনো রং কম-বেশি হয়নি।

বাস্তবের প্রতি নির্মোহ আনুগত্য হাসানকে প্ররোচিত করে থাকবে উপন্যাসের পরতে পরতে মামলার সাক্ষ্য, নথি বিবরণী, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশনামা প্রবিষ্ট করে দিতে। পাঠকের কাছে এই কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির জন্যই কি তার এই প্রয়াস? প্রবল কাণ্ডজ্ঞান ও আশ্চর্য পরিমিতিবোধের অধিকারী হাসান আজিজুল হক দলিল-দস্তাবেজ সহকারে এই কাহিনীটি উপস্থাপন না করলে বোধহয় কোনো ক্ষতি ছিল না।

তিন দশক আগে এক সাক্ষাৎকার গ্রহীতা হাসানকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে 'শামুক', 'এইসব দিনরাত্রি' নামে তিনি লেখক জীবনের শুরুতে উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেননি। জবাবে হাসান বলেছিলেন :

> ...ওগুলোকে আমি আর ছাড়পত্র দিতে চাই না।...ওগুলো পড়লে এখন মনে হয় পুরো ব্যাপারটা আবেগে খুব স্যাঁতস্যাঁতে... আমার ধারণা, এখন বাস্তব অনেক রূঢ় আর তাকে মোকাবিলাও করা দরকার শুকনো, খটখটে ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে।
>
> [*কথা পরম্পরা*, শাহাদুজ্জামান, পৃ. ৬৭]

হ্যাঁ, রূঢ় বাস্তবকে আরও রূঢ়ভাবে হাসান মোকাবেলা করেছেন *সাবিত্রী উপাখ্যান* উপন্যাসে, এর খটখটে কিন্তু চিরস্থায়ী ডাঙায় দাঁড়িয়ে।

রাজীব সরকার : জন্ম ২৬ অকটোবর ১৯৮০, প্রাবন্ধিক : পেশা: সরকারি চাকরি। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ* (২০১২) [প্রবন্ধ], *নিহত রবীন্দ্রনাথ* (২০১২) [প্রবন্ধ] , যুক্তি + তর্ক = বিতর্ক (২০১৩) [প্রবন্ধ], *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে* [প্রবন্ধ]

বইটির প্রাপ্তি উৎস: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১৫৪২৮২১০, ০১৭১২২৩৫৩৪২

জাতীয় অধ্যাপকের জাতির অবস্থা বিচার

আহ্‌মেদ লিপু

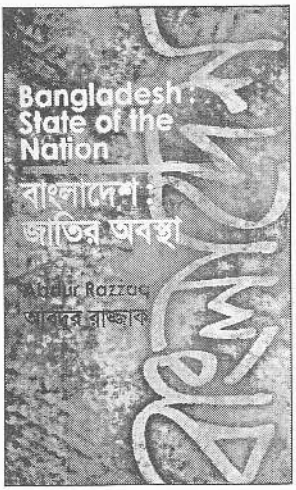

Bangladesh: State of the Nation
/বাংলাদেশ: জাতির অবস্থা
[দ্বিভাষিক সংস্করণ]
আবদুর রাজ্জাক
অনুবাদ : তানভীর মোজাম্মেল
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০১০
৬৩ পৃষ্ঠা
১০০.০০ টাকা

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বাংলার বিদ্বৎসমাজে কিংবদন্তি। অধ্যয়নে তাঁর একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতা যেমন ছিল প্রবল ঠিক তেমনি লেখালেখিতে অনুৎসাহ ততটাই। তবে এতে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের বিস্ময়কর গভীরতার কথা চাউর হতে বিঘ্ন ঘটেনি। তিনি ১৯৩১-এ অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে ও ১৯৩৬ থেকে শিক্ষক হিসেবে আমাদের আজকের আলোচ্য বক্তৃতাদান পর্যন্ত সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিবারের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সুনামের সঙ্গে পড়িয়েছেন; মাঝে ১৯৪৫-এ তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির তত্ত্বাবধানে 'ভারতের রাজনৈতিক দল' শিরোনামের গবেষণার কাজ করেছিলেন। কিন্তু, ১৯৫০-এ লাস্কির দেহবসানের পর গবেষণা অসামপ্ত রেখেই দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের যে সংবিধান তখনকার সংবিধান পরিষদে গৃহীত হয়েছিল সে সংবিধান তৈরির আগে পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আলোচ্য সংবিধান-কমিটিতে যে-সব দেন-দরবার চলেছিল তার পেছনে তিনি ছিলেন। ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নমেন্টের

প্ল্যানিং বোর্ডের মেম্বরও। নাই নাই করেও তাঁর Civil military relation- এর উপর ১৯৬০-এ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে দুটি বক্তৃতা আছে। এমনকি তৎকালীন ইসলামিক একাডেমি আয়োজিত 'why I wanted Pakistan' নামে একটি বক্তৃতা সিরিজে মোনেম খানের সঙ্গে তাঁর encounter-এর আয়োজন চূড়ান্ত হয়েছিল। মোনেম খান কথা দিয়ে পিছুটান দিলেও আব্দুর রাজ্জাক তাঁর নির্ধারিত বক্তৃতা করেছিলেন। হয়ত এর কোনো রেকর্ড ইসলামিক একাডেমিতে (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে) থেকে থাকবে। সে যা-ই হোক, এই কৃতবিদ্য পণ্ডিতের মোজাফফর আহমদ চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা ১৯৮০ 'বাংলাদেশ: জাতির অবস্থা' বিষয়ে আমরা নিজের মুখে ঝাল খেতে প্রবৃত্ত হই।

সত্যের পথ (ওয়ে অব ট্রুথ)

দুই দিনে সমাপ্ত বক্তৃতার প্রথম দিনে তিনি উপস্থিত সুধীজনকে জ্ঞানতাত্ত্বিক নায়কসুলভ প্রাসঙ্গিক আলাপ পাড়ার পর তাঁর মূল বক্তৃতায় প্রবেশ করেছেন। এখানে তিনি জাতির প্রয়োগিক সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর নির্ধারিত সংজ্ঞার নিরীখে কিভাবে জাতির আত্মপরিচয় নির্মিত/নির্ধারিত হয়েছে সেটা নির্দেশের পর তিনি এর সঙ্গে প্রতিবেশের সম্পর্ক নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। অতঃপর তিনি জাতির 'ঈমান ও নিশান' নিয়ে তাঁর বক্তব্য জারি করেছেন। তাছাড়া জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার জনসংখ্যার সম্পর্ক বিষয়ক মতামতও বক্তৃতার এই অংশে ঠাঁই পেয়েছে।

দ্বিতীয় দিন তিনি প্রয়াসী হয়েছেন জাতির জনসংখ্যার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মতামত উপস্থাপনে। এই প্রসঙ্গে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য,

> ... তারা বিংশ শতাব্দীতে অবস্থান করলেও বাস করে বহু অতীতে, মধ্যযুগের এক জগতে। [পৃ. ৫১]
>
> They may exist in the 20th century but they five in a world of long ago. [p. 23]

কিংবা

> ... মানব-সম্পদ একই সঙ্গে উপায় এবং লক্ষ্য: স্বয়ং এক লক্ষ্য। [পৃ. ৫৩]
>
> Human resources unlike the other ressources are both means and ends: are ends in themselves. [p. 25]

এরপর তিনি এই জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট 'জন্মনিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা, আবাসন, নাগরিক সুযোগ সুবিধা' ইত্যাকার বিষয়-আশয় নিয়ে তাঁর ভাবনা জানিয়েছেন। এ সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার বৈপরীত্যকে তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আলোতে এনেছেন। তিনি বেশ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই জনসংখ্যার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম শিক্ষিত অংশ নিয়ে; আলোচনা করেছেন তৎকথিত 'উন্নয়নশীল' দেশে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে। এখানে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য:

> ... সভ্যতার অর্থ হচ্ছে সরকারের উৎস হিসেবে শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা (পৃ. ৫৭)।

Civilization means less and less direct force as the basis of government.

[p-29]

এমনকি জমি ও পানি ব্যবস্থাপনা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, শক্তির কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক ইত্যাদিও তাঁর নজর এড়ায়নি।

মতের পথ (ওয়ে অব রিপ্রেজেন্টশন)

ক. তিনি যে জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা বিভার্স কান্টশিয়ান কিংবা হেগেলিয়ান অবস্থান (যেখানে মোটা দাগে জ্ঞানের শুরু হয় বুদ্ধি থেকে, অভিজ্ঞতা এর পূর্ণতা দেয় মাত্র)। তাঁর জাতিকে সংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা আমাদের হেগেলের সার্বভৌম ইচ্ছা (Sovereign will)- এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়:

> ... বাংলাদেশের মানুষ একটা জাতি, কারণ তারা একটা জাতি হতে চায়।
>
> [পৃ. ৪৪]
>
> ...The nation in Bangladesh is a nation because it intends to be a nation and nothing else.
>
> [p- 16]

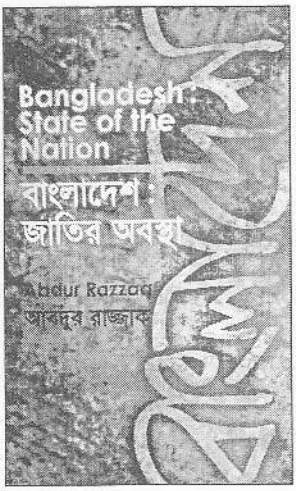

Bangladesh: State of the Nation /বাংলাদেশ: জাতির অবস্থা
[দ্বিভাষিক সংস্করণ]
আবদুর রাজ্জাক
অনুবাদ : তানভীর মোজাম্মেল
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০১
৬৩ পৃষ্ঠা
১০০.০০ টাকা

অথবা,

> ... তথাপি যা আমাদের একত্রে ধরে রেখেছে, পরিণত করেছে এক জাতিতে, তা হচ্ছে আমাদের শুধু এই জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়ার ঐকান্তিক কামনা।
>
> [পৃ. ৪৪]
>
> ...Yet, what holds us together, makes of us a nation is the exclusive passion of each to identify himself with this nation and not his else.
>
> [p- 17]

যদিও, তিনি Intention, Exclusive Pasion ইত্যাদি শব্দ দিয়েই তাঁর কাজ সেরেছেন, তবে তিনি যেভাবে এসব শব্দের ব্যবহার করেছেন তাতে এদের মর্ম হেগেলের Sovereign will- এ গিয়েই পৌঁছায়। তাই অবলীলায় তিনি জাতিকে নির্মাণ/ নির্ধারণের ভার জাতি-র চাওয়ার ঐকান্তিক কামনা (exclusive passion)-এর কাঁধেই চাপিয়েছেন। ফলে তাঁর জাতিকে সংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা এক ধরনের রাহস্যিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। যেমন:

> ...এই জাতিকে তৈরি করেছে তার অনমনীয় গর্ব, সুখে-দুঃখে আট কোটি মানুষের সঙ্গে একই পরিচয় বহন করা, অন্য কিছু নয় শুধু বাঙালি হতে চাওয়ার জেদ।
>
> [পৃ. ৪৪]
>
> ...The Unbending pride, the shared identity with 80 million people in weal and in woe, the insis-

tence on being a Bengali and nothing else, this is what makes the nation
[p- 16]

এখানে যে জেদের প্রসঙ্গটি তিনি টানছেন তা কেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের মাঝে ক্রিয়াশীল হয়ে তাদেরকে জাতিতে পরিণত করবে, কেন আগে কিংবা পরে তা সংগঠিত হবে না বা হতে পারবে না এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর এই উদ্ধৃতিটি মোটেই দিতে সক্ষম নয়।

খ. তিনি 'অনমনীয় গর্ব', 'হতে চাওয়ার জেদ', 'ঐকান্তিক কামনা', 'ভালবাসা' ইত্যাদি অধিবিদ্যক শব্দগুলি যেন অনেকটাই স্বতঃসিদ্ধের মতো ব্যবহার করেছেন। কোথা থেকে এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম, কেন ইচ্ছা জাগল—ইত্যাকার বিষয়ে তিনি যেন সম্পূর্ণ

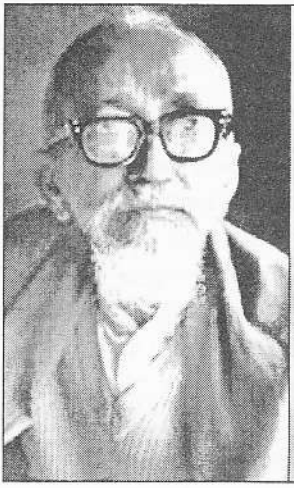

আব্দুর রাজ্জাক

এখানে তিনি জাতির প্রয়োগিক সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর নির্ধারিত সংজ্ঞার নিরীখে কিভাবে জাতির আত্মপরিচয় নির্মিত/নির্ধারিত হয়েছে সেটা নির্দেশের পর তিনি এর সঙ্গে প্রতিবেশের সম্পর্ক নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। অতঃপর তিনি জাতির 'ঈমান ও নিশান' নিয়ে তাঁর বক্তব্য জারি করেছেন। তাছাড়া জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার জনসংখ্যার সম্পর্ক বিষয়ক মতামতও বক্তৃতার এই অংশে ঠাঁই পেয়েছে।

নীরব। ফলত তাঁর বক্তব্য:

> ... উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশের অর্থনীতি যখন ধ্বংস হচ্ছিল তখন যার দেখার চোখ আছে সেই দেখেছে এবং বলেছে যে, বাংলার সমৃদ্ধি নির্ভর করেছিল তার কৃষির ওপরে নয়, হস্তশিল্প আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর।
>
> [পৃ. ৪৯]

এর সমর্থনে সমালোচকেরা পরিসংখ্যান ঘাঁটাঘাঁটি না করে যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলতে পারেন: যেখানে তিনি বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে পার পাওয়া মুশকিল মনে করেছেন সেখানে তথ্য হাজির করেছেন, আর যেখানে তথ্যে কুলায় না সেখানে যুক্তির (যা কিনা অনেক স্থানেই অধিবিদ্যক) আশ্রয় নিয়েছেন।

গ. তিনি 'উন্নয়নশীল', 'অনুন্নত' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে আরেকটু সতর্ক হলেও পারতেন। কেননা উন্নয়নতো শুধুমাত্র জিডিপি'র গাণিতিক কেরিক্যাচার মাত্র নয়। এরও অধিক। অধুনা উন্নয়ন সহযোগীরা আমাদের উন্নয়নশীল অভিধায় অভিহিত করছে বটে কিন্তু আমাদের স্মরণে থাকা ভালো যে, এখনো বিপুল সংখ্যক মানুষ যন্ত্রের পরিবর্তে খোদ

রাজধানীতেই ভার বহন করে। আর গ্রামাঞ্চলে 'পশু' ও 'মানুষ' উভয়ই।

ঘ. প্রেমিকের নিকট নির্মোহতা আশা করা বৃথা। তিনি গান্ধী কিংবা জিন্নাহর নামের পূর্বে কোনো প্রশংসাসূচক বিশেষণ ব্যবহার করেননি; অথচ শেখ মুজিবকে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় অভিহিত করেছেন। এখান থেকেই মুজিব সম্পর্কে তাঁর state of mind বোঝা যায়।

ঙ. 'জন্মনিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা' ও 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' নিয়ে তাঁর মত:

> ...এই কর্মসূচিও তৈরি হয়েছে উন্নত বিশ্বে, অবশ্য উন্নয়নশীল দেশের মঙ্গল কামনার মহান উদ্দেশ্যেই।
>
> [পৃ. ৫৫]
>
> ...This program me like the family planning programme originates in the developed world of course in the interest of the developing world.
>
> [পৃ. ৫৬]

তাঁর এই স্যাটায়ার থেকেই উপর্যুক্ত বিষয়ে তাঁর মতামত বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। তাঁর মতে জনসংখ্যা স্থির থাকলে কিংবা কমে গেলে সমাজ তাঁর চলার পথ হারিয়ে ফেলে। অতি ব্যতিক্রম বাদে (যেমন: সিঙ্গাপুর) তাঁর মত ইতিহাস সমর্থিত। তবে আমরা জনসংখ্যা সামান্য হারে বাড়িয়ে তাঁর মতে যা আধুনিক অতি উন্নত সমাজে সম্ভব—জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা—তা তৎকথিত উন্নয়নশীল সমাজে সম্ভব বলে হাতে কলমে দেখতে পেয়েছি। তবে তাঁর 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' নিয়ে বক্তব্যে সারবত্তা কিছু আছে বলেই মনে হয়। যদিও অনেকে মনে করেন 'এখন সভ্যতার মর্মবাণী হচ্ছে শহরটাকে গ্রামে টেনে আনা, গ্রামকে শহরে আনা নয়।' [*আহমদ ছফা বললেন*, পৃ. ২০]

চ. তিনি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ক্ষুদ্রনৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা-প্রাপ্তি, দেশে দেশে সশস্ত্র উগ্রপন্থী, ধর্মীয় চরমপন্থী ইত্যাদি নিয়ে তেমন কিছুই বলেন নি।

ছ. তাঁর বক্তৃতায় 'শ্রেণী-চরিত্র'-র প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকলেও সাম্রাজ্যবাদ কথাটি তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন বলেই মনে হয়। 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি-তো কেবল কোনো বুলি বা গালি নয়, রীতিমত scientific category। এখান থেকেই বোঝা যায় তিনি পুনঃ ঔপনিবেশীকরণ নিয়েও তেমন কিছুই বলেননি। কিন্তু একটি জাতির বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে তার আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চরিত্র, গুণ ও কার্যকরিতার নিকেশ গুরুত্বপূর্ণ।

জ. অনুবাদ প্রশ্নে সম্পাদক, প্রকাশকের আরো অধিকতর দায় নেবার সুযোগ ও প্রয়োজন উভয়ই জরুরি ছিল। দু-এক জায়গায় প্রুফ রিডিং-এরও গড়বড় রয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, সত্যিকারভাবে ভদ্রলোকের আত্মীয় ভদ্রলোকই। এ কথা আরেকবার দিবালোকের মতোই প্রস্ফুটিত হলো অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের ভাষণটি আগাগোড়া পাঠ করে। ধর্ম, বর্ণ কিংবা জাতীয়তা এক্ষেত্রে তেমন বাধার সৃষ্টি করে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস যুক্তিসঙ্গত কাঠামোতেই সম্ভব, তা 'প্রপাগেট' বা 'জেনারেট' যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। যদিও তিনি যে জাতির অবস্থার বিচার করেছেন তাদের প্রবণতা

প্রপাগেটের দিকেই। 'ওয়ান অব দি ওলডেস্ট সিটিজেন অব ঢাকা'র যদি বিষয়গুলি বক্তৃতা প্রদানকালের নিরিখে নজর না এড়াত তাহলে হতো সোনায় সোহাগা।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলি :

১. *বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থার চালচিত্র*, সলিমউল্লাহ খান, বাণিজ্য বিচিত্রা, প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩।

২. *আহমদ ছফা বললেন...*, আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার পুস্তক, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৬।

৩. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০০।

4. *The second five year plan 1980-81*, Planning Commission Bangladesh, Dacca 1980.

আহমেদ লিপু : জন্ম ২৮ নভেম্বর ১৯৮২। প্রাবন্ধিক। পেশা: দর্শন চর্চা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ব্যক্তিকতায় নৈর্ব্যক্তিক* (২০১১)।

বইটির প্রাপ্তি উৎস : সাহিত্য প্রকাশ, পল্টন টাওয়ার স্যুট # ৭০৫
৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০। ফোন : ০১৯২২১০৬৬০০
e-mail : mafidul-hoque@yehoo.com

আহমদ শরীফ, ভাবনালোক

আহ্‌মেদ লিপু

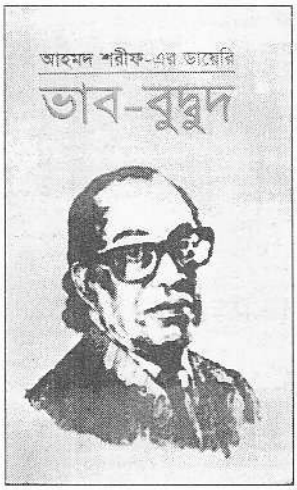

ভাব-বুদ্বুদ
আহমদ শরীফ
জাগৃতি প্রকাশনী
আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ: ২০০৯
২০৮ পৃষ্ঠা
২৭৫ টাকা

যা ভাবি, যা বুঝি এবং যা জানি তা-ই লিখি—ডরাই না। —আহমদ শরীফ
একের অভিজ্ঞতা অন্যদের জ্ঞান।—আহমদ শরীফ

My aim and mission in life to appeal to the educated people to be rational, because 'Humanity' grows out of and lies in rationality. Be reasonable and act like a human being.
—Ahmed Sharif

এ-কথা সুবিদিত যে, দেশ ও ভাষা—উভয় অর্থেই বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজে আহমদ শরীফ একটি অপরিহার্য নাম। তাঁর সময়কালের হাতে গোণা কয়েকজন অ্যাকাডেমিশিয়ানের একজন হিসেবে সমাজ-রাষ্ট্রেও তিনি ছিলেন পরিচিত। বিদ্যায়তনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে নিজ ইচ্ছা সমাজের সাপেক্ষে অ্যাক্টিভিস্টের ভূমিকাও তাঁর সম্পর্কে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া, ব্রিটিশ আমলে পরিবর্তিত পরিবেশ সৃষ্ট বাঙালি মুসলিমদের আত্মপরিচয় সঙ্কট থেকে উত্তরণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের যে ভূমিকা তা তাঁর মাধ্যমেই প্রাতিষ্ঠানিক পূর্ণতা পায়। এমন

একজন পণ্ডিত ব্যক্তির পরিণত বয়সের প্রায় ষোল বছরের খণ্ড খণ্ড ভাবনার লিখিত রূপ এই আলোচনার বিষয়।

কোনো ঘটনাকে বাহির থেকে দেখা, উপরি তল থেকে দেখা আর ভেতর থেকে দেখার তাৎপর্য ভিন্ন। ব্যক্তির লিখিত ডায়েরি তার মনোজগৎকে অনেকটাই ভেতর থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়, যা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে লোভনীয়ও বটে। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে ১৯৮৪ খ্রি. থেকে ১৯৯১ খ্রি. পর্যন্ত সময়পরিসরে আহমদ শরীফের ভাবনাচিন্তা, কিংবা বলা চলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ, এতে ক্ষুদ্র পরিসরে ঠাঁই পেয়েছে। এর কোনো কোনো অংশ রীতিমতো গবেষণা-নিবন্ধের মতো পরিকল্পিত, তথ্যবহুল। আবার কোনো কোনো অংশ নিতান্তই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। তবে, ১৯৮৪-র মাত্র একটি ভুক্তি আছে, ৮৬-র রয়েছে তিনটি। সব মিলিয়ে তাঁর ৮৪ থেকে ৯২ পর্যন্ত সময়পরিসরের ভাবনাগুলো মাত্র ৭ পৃষ্ঠার অবয়ব নিয়েছে; আর, ৯৯-এর নিয়েছে ৪ পৃষ্ঠা। তিনি সবচাইতে বেশি লিখেছেন ৯৭-তে–প্রায় ৬০ পৃষ্ঠা। ৯৫-তে ৪০ পৃষ্ঠার বেশি; ৯৩-তে ৩৫ পৃষ্ঠা। ৯৪, ৯৬ ও ৯৮-তে লিখেছেন প্রায় ২০ পৃষ্ঠার মতো করে। ৯৫ থেকে তাঁর চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তুতে পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়।

জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে তিনি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী (logical positivist) যদিও অসর্তকভাবে দেখলে তাকে বুদ্ধিবাদী মনে হতে পারে। বিশেষত Real এবং Ideal বিষয়ে তাঁর মত—শোভন ও পরিস্রুত পদ্ধতিতে Real-কে বরণ করব, যাতে তা Ideal-এর পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় (পৃ. ১৩২)—অসতর্ক পর্যবেক্ষককে প্ররোচিত করবে তাঁকে বুদ্ধিবাদী ভাবতে। কিন্তু অন্য সকল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর মতোই তিনি অধিবিদ্যার অপনোদন চান; চান জীবন ও জগতের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচেতনার বাস্তবায়ন। এজন্যই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন:

> ক. রোমান ক্যাথলিক গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানরা শাস্ত্রকে জীবনের প্রয়োজনীয় পুঁজি-পাথেয় বলে জানে। শাস্ত্রে যা নেই, জীবনেও তার কোন প্রয়োজন নেই—এমনি ধারণা বশে ওরা বিজ্ঞানবিমুখ। এজন্যই এরা বিজ্ঞানের অনুশীলনে অনীহ। কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, সন্দেহ মাত্রই তো শাস্ত্রে অনাস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণ। তাই বিজ্ঞান বর্জন ও শাস্ত্রানুগত্যই শ্রেয়স বলে মানে। মৌলবাদী মাত্রই বিজ্ঞানবিমুখ। বরং মনকে চোখ ঠাওরায় তাঁরা। শাস্ত্র থেকে বিজ্ঞানের মনগড়া সূত্র ও ইঙ্গিত বের করে।
>
> [পৃ. ৬৮]
>
> খ. তবে এদিন থাকবে না, এ বাধা টিকবে না—বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা মানুষকে নাস্তিক, প্রকৃতির নিয়মবাদী ও যুক্তিপ্রবণ করবেই। এসব অলীক, অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, ভয়-ভক্তি-ভরসা থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে। যুগান্তর আসন্ন। নতুন সূর্যের উদয়ে নতুন দিন, নতুন চেতনা, নতুন জীবন বোধ শুরু হয়ে যাবে।
>
> [পৃ. ৪৯]

আর তিনি যুগান্তরের সূর্যের উদয়ে যে নতুন দিন, নতুন চেতনা, নতুন জীবন বোধ দেখতে পান তা নীতিগত ভাবে মার্কসের মতবাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়নযোগ্য বলে আস্থা রাখেন।

যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, যুক্তিনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণী শক্তি থাকলে কোনো ব্যক্তির মত, মন্তব্য, সিদ্ধান্ত মনীষাসম্পন্ন যুক্তিবাদী পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তা তার মাঝে সন্তোষজনক মাত্রাতেই বিদ্যমান ছিল। যখন তিনি সুদূর কিংবা নিকট অতীতের অথবা সমসাময়িক সময়ের কোনো ঘটনা বা বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন তখন তা বেশ স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য বিষয়ানুগ, তথ্যবহুল; উপরন্তু দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও পঠন-পাঠনে ঋদ্ধ। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে—তার সুনির্দিষ্ট ধরনের মনোগঠনের দরুন তিনি অর্ধেক গ্লাস পূর্ণ না দেখে অর্ধেক খালিই দেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'মানবতার সঙ্কট' ও 'আজকের মানুষের চরম সমস্যা ও মানবতার শত্রু' নামের ভুক্তি দুটো থেকে কিয়দাংশ দেখে নেওয়া যাক:

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারের সংখ্যা স্ফীতি, জমি-জিরাত-ভিটার ক্রমবর্ধমান স্বল্পতা ও শূন্যতা, অর্থসম্পদের অভাব ও অনিশ্চয়তা প্রভৃতি মানুষকে মনুষ্যত্বহীন প্রাণীতে—নিতান্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর ও খাদ্য প্রতীক অর্থ সম্পদ লিপ্সু করে তুলেছে। ফলে জগৎব্যাপী সর্বত্র বাঁচার সংগ্রামে মেতে উঠেছে মানুষ মরিয়া হয়ে। প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ, তীব্র, সংকটসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। ছাত্র বাড়ছে, বিদ্যালয় বাড়ছে, বাড়ছে—কিন্তু বিদ্যা ও মনুষ্যত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ প্রাণীরূপেই, জীবরূপেই জিগীসা ও জিঘাংসা প্রবৃত্তি চালিত হতে থাকবে আরো বেশি মাত্রায়। কোন নৈতিক মহৎ আবেদনে-নিবেদনে-আপ্তবাক্যে কান-মন দেওয়ার আগ্রহ থাকবে না কারুর। এ জন্যই মনুষ্যত্ব, মানবতা, স্বার্থপরতা, কৃপা-করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ বা আকালের সময়ের মতোই মানুষের মনে-সমাজে-মর্মে প্রবেশপথ পাবে না। কাড়াকাড়ি-মারামারি ও হানাহানি বাড়তে থাকবে। মনুষ্যত্ব বা মানবিকতা কিংবা মানবতা রূপগুণ মানুষ নামের প্রাণী প্রজাতির কারো মনে-মগজে-মননে-মর্মে-মনীষায় ঠাঁই পাবে কেবল প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকারের সর্বজনীন স্বীকৃতি ও অঙ্গীকারের শর্তে।

[পৃ. ৩৮]

খ. Racial, Regional ও Religious conflict—এ তিনটে হচ্ছে মনুষ্যত্ব বিরোধী, মানবতার বিকাশ-বিস্তার প্রতিরোধক তিনটে মারাত্মক রক্তক্ষরা প্রাণহরা মানব সমাজ শত্রু। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এ তিনটেই বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত জিইয়ে রেখেছে লঘুগুরু ভাবে। পৃথিবী আজ হিংস্রতায় বীভৎস, মানুষ আজ যেন রক্তখেকো জানোয়ার! আফ্রো-এশিয়া-য়ুরোপ আজ Racial, Regional [linguistic] ও religious স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে চায়। যেহেতু এ যন্ত্র প্রকৌশল-প্রযুক্তি নির্ভর যুগেও জীবনে বিচ্ছিন্নতায় ও স্বাতন্ত্র্যে বাস সম্ভব নয়, সেহেতু এরা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়ে তারপরে সমবায়িক সমমর্যাদায়; সহস্বার্থে সহযোগিতায়ও সহাবস্থানের শর্তে মণ্ডলী (federation) কিংবা সমমেল (Confederation) করে মিলতে ও বাঁচতে চাইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আর বিভিন্ন গোষ্ঠিক, গৌত্রিক, ভাষিক,

> আঞ্চলিক, শাস্ত্রিক, সম্প্রদায় বা জাতি বা উপজাতি এককেন্দ্রিক Unitery সরকারের শাসনের মধ্যে থাকবে না। ...
>
> [পৃ. ৩৮-৩৯]

তবে এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট থাকা ভালো যে, আহমদ শরীফ অত্র গ্রন্থে Idea অর্থে কোনো ভাব নিয়ে কাজ করেননি; করেছেন Concept অর্থে ভাব নিয়ে কাজ। তাছাড়া এখানে তিনি এমন কোনো নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি যা সামষ্টিক মানবমন পূর্ব থেকেই অবগত ছিল না। উপরন্তু তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বল্প হলেও Ethico-cognitive paralalism প্রবণতা বিদ্যমান। তবে তাঁর যাপন ও চর্চার অভেদ ভুক্তিগুলো থেকে

শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনের অনেকের সম্পর্কেই তাঁর মূল্যায়নে সাধারণ পাঠক হয়ত ধাক্কা খাবেন কিন্তু এর বাস্তবতা ও একে তত্ত্ব-তথ্য সহযোগে পরিপূর্ণরূপে খারিজও হয়ত করতে পারবেন না। তবে যে তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে মূল্যবিচার করেছেন, তার উৎস, গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা নিয়ে আরো অধিকতর সাবধানী হওয়া ছিল সঙ্গত।

আহমদ শরীফ

স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে এ প্রবণতা বিদ্যমান। যা আমাদের সমাজে বিরল থেকে বিরলতরতে পর্যবসিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

নিজ (Self) নিয়ে তাঁর স্ব-মূল্যায়নও *ভাব-বদ্বদ*-এর একাধিক স্থানে বিদ্যমান, এমনকি তাঁকে নিয়ে অন্যদের মতামত সম্পর্কেও[১] তিনি সম্যক ওয়াকিবহাল। কোনো ধরনের আত্মম্ভরিতা তাতে দৃশ্যগোচর হয় না বরং তাতে যেন অনেকাংশেই ফলের ভাবে নুইয়ে পড়া বৃক্ষের সৌন্দর্যই দৃশ্যমান। তিনি কিছু Techinical terms-কে সংজ্ঞায়নের প্রয়োগও এতে পেয়েছিলেন সেখানেও একই বৈশিষ্ট্য গোচরীভূত হয়। তবে উঁচু আত্মমর্যাদা বোধ ও তৎ অনুযায়ী কর্মপ্রয়াসের কিছু বয়ানও এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন, আত্মমর্যাদাবোধ তিনি তাঁর পিতামহ মুনশী আইনুদ্দীনের কাছ থেকে পেয়েছেন বা প্রভাবিত হয়ে নিয়েছেন। এর নিরিখেই তিনি শিক্ষক পেশা, শিক্ষক রাজনীতি ও তাঁর কতিপয় সহকর্মী সম্পর্কে বলেছেন মন্তব্য করেছেন: যা সাধারণের জন্য কৌতূহল উদ্দীপক। নিজ সম্পর্কে তাঁর অন্যতম মূল্যায়ন, তিনি 'স্পষ্টভাষী, অবিমৃষ্যবাক অপ্রিয় কথা উচ্চারণে অভীক [পৃ. ১০৮]।' 'দুষ্ট ও অপছন্দের লোকের সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে নিন্দাবাক্যে বা

নিন্দাজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগে দক্ষ [পৃ. ১১৮]। তাঁর একসময়ের রেডিও পাকিস্তানে ঢাকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী সৈয়দ আলী আহসানকে নিয়ে করা তাঁর মন্তব্যগুলো এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে এতে যথেষ্ট fact (উপাত্ত) আছে, এর উপর ভিত্তি করেই তিনি value judgment (মূল্য বিচার) করেছেন। এছাড়াও তিনি ড. করিম, ড. মযহারুল ইসলাম, মুনীর চৌধুরী, কবীর চৌধুরী এঁদের নিয়েও তথ্যসম্পন্ন কটু মন্তব্য করেছেন। শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনের অনেকের সম্পর্কেই তাঁর মূল্যায়নে সাধারণ পাঠক হয়ত ধাক্কা খাবেন কিন্তু এর বাস্তবতা ও একে তত্ত্ব-তথ্য সহযোগে পরিপূর্ণরূপে খারিজও হয়ত করতে পারবেন না। তবে যে তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে মূল্যবিচার করেছেন, তার উৎস, গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা নিয়ে আরো অধিকতর সাবধানী হওয়া ছিল সঙ্গত।

দুএকটি ক্ষেত্রে আহমদ শরীফের ধারণার (concept) স্বচ্ছতার অবকাশ রয়েছে। যেমন: তিনি মনে করেন 'সত্য'কে নিয়ে বিজ্ঞান কাজ করে। কিন্তু বাস্তবে বিজ্ঞান পদ্ধতি, উপায় ও উপকরণের অনুপুঙ্খতা working solution তৈরি করে মাত্র—যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাছাড়া সত্যের সঙ্গে তথ্যেরও কিছুটা ফারাক আছে বৈকি। যদিও তিনি সঠিকভাবেই নির্দেশ করতে পেরেছেন যে, 'বিজ্ঞানের তথ্য ও শাস্ত্রের সত্যে পার্থক্য দুই মেরুর [পৃ. ১৮১]।' তাছাড়া সৃষ্টিকর্তা অনপেক্ষা ধর্ম ও যারা মনে করেন জগতের সৃষ্টিকর্তা আছে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো ক্লাব সেন্টিমেন্ট থেকে উদ্ভূত—এই ধরনের অধিবিদ্যক মতামতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁর ধারণাসমূহ (concept) অনেক দূর পর্যন্ত সক্ষম হলেও সবটুকু সক্ষম নয়। way of representation এর ক্ষেত্রে বলতে হয়, অনেকেই অভিযোগ করেন 'তাঁর ভাষা নাকি দুর্বোধ্য জটিল', এই কথায় অল্প হলেও বাস্তবতা বিদ্যমান। তাছাড়া সম্পাদকত্রয় ভুক্তিগুলোকে (অনেক দিনের মতামত) সর্বক্ষেত্রে সময়ক্রম অনুসারে সাজাতে পারেন নি। বিস্তর ভুল বানান ও দু-এক স্থানে উপস্থাপন-ত্রুটি বিদ্যমান। একটি Index থাকলে গ্রন্থটির ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পেত। আশা করি প্রকাশক গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে উপর্যুক্ত বিষয়ে নজর দেবেন।

যে চেতনা প্রবাহ ও বোধের স্তর থেকে এই *ভাব-বন্ধুদ*গুলোর উৎসারণ সেখান থেকে লেখক অবলীলায় আমাদের জানাতে পারেন, 'একালের specialization মানবপ্রজাতির অনেক ধনী মানী বিশেষজ্ঞকে মানুষ হিসেবে মানবিক গুণে মানে মাপে মাত্রায় প্রত্যাশিত স্তরে তোলে না। এটি মনুষ্যত্বের বিকাশের উৎকর্ষের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। তাই সবাইকে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী করে তোলা আবশ্যক (পৃ. ১২৫)।' আমাদের আলোচ্য text-টি শ্রেণীকরণে যে প্রকারেই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন 'মানুষ হিসেবে মানবিক গুণে মানে মাপে মাত্রায় প্রত্যাশিত স্তরে' পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এর পাঠ নিশ্চিতভাবেই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উদ্ধৃতি:

১. আমি কখনো কখনো স্পষ্টবাক ও রূঢ়, তাই লোকে আমাকে অবিনয়ী, উদ্ধত ও দাম্ভিক রূঢ়ভাষী বলে জানে। অথচ আমি জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় কারো ক্ষতি কামনা করি না। ঈর্ষা

বা হিংসা বা ঘৃণা রাখি অন্তরে সংগুপ্ত। কখনো কাজে ও আচরণে পরিব্যক্ত করিনি সারাজীবনে চরম শত্রুর বিরুদ্ধেও। তবু আমার আন্তরিকতায়, সততায়, যুক্তি নিষ্ঠায়, বিবেকানুগত্যে প্রীতি আদর্শচেতনায় লোকে আস্থা বা ভরসা রাখে না। মনে করে আমিও অন্যদের মতোই মুখে-বুকে অভিন্ন নই।... [পৃ. ১৬৯]

আহ্‌মেদ লিপু : জন্ম ২৮ নভেম্বর ১৯৮২। প্রাবন্ধিক। পেশা: দর্শন চর্চা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ব্যক্তিকতায় নৈর্ব্যক্তিক* (২০১১)।

বইটির প্রাপ্তি উৎস: জাগৃতি প্রকাশনী; ফোন: ৮৬২৩২৩০, ৮৬২৪২১৮, ০১৮১৯২১৪৩৬১

‘সেই মত চলিছে প্রাণের মীন’

নিপা জাহান

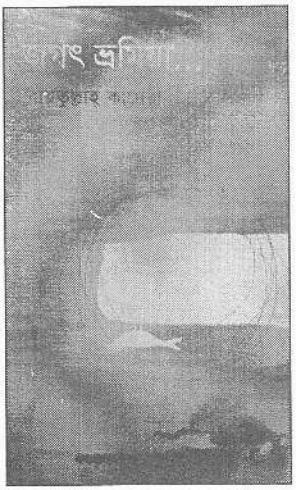

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী
জগৎ ভ্রমিয়া...
লেখাপ্রকাশ,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪
৪৮ পৃষ্ঠা
১০০ টাকা

> ...আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।
> [*কবিতার কথা*, জীবনানন্দ দাশ]

বলতে যাচ্ছি এটাই যে কবির নিগূঢ় অনুভবের শব্দিত প্রকাশই কবিতা। কবিতার এ ধরনের সংজ্ঞায়ন নতুন নয়, সাহিত্য হিসেবে কবিতাও নতুন নয়। প্রেম-প্রকৃতি প্রতিবাদ—এ-সবের বাহ্য ও অন্তর্গূঢ় সমাচার নিয়ে প্রতিদিন কেন লেখা হয় অযুত-নিযুত কবিতা? ‘চর্যাপদ’ থেকে উত্তর শূন্য পর্যন্ত বাংলা কবিতার হৃষ্টপুষ্ট ভাণ্ডের কী প্রয়োজন আর নতুন গ্রহণের? কোন কোন কারণে পুরাতন বাতিলের খাতায় নাম লেখায়, আর কোন বৈশিষ্ট্য নতুনের সঙ্গে আনকোরা যোগ হয়?—সময়, রুচি, মূল্যবোধের সঙ্গে ধ্রুপদত্বের সমন্বয়ে সম্ভবত এর উত্তর খোঁজা যেতে পারে। জীবনের অভূতপূর্ব যোগসাজস ও টেকনোসায়েন্সের জামানায় শিল্প-সাহিত্য মূলত সমন্বয়-অবলম্বী। আর সমন্বয়ের মহাসমারোহে

শিল্পী-সাহিত্যিক পড়েন ব্যক্তি-পরিচয়ের সংকটে। একটি শতাব্দী কতজন কবিকে ধারণ করে? কিংবা প্রতিটি নতুন দশকে কতজন কবিকে পাই, যাকে বলা যেতে পারে আনকোরা? অথবা পেছনের অনেকটা বা খানিকটা গ্রহণ-বর্জন করে নিজের সময় ও সমাগতের জন্য কিছুটা হলেও নতুন সৃষ্টি করতে পারেন কতজন কবি?—এ সংখ্যা অল্প নয়, বলা যায় অত্যল্প। কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে এইটুকু আলাপ সেরে এবার আমরা দেখবো *জগৎ ভ্রমিয়া...* (২০১৪)-র কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (জ. ১৯৬৮) তাঁর কাব্য, জীবন জগতের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কেমন ছান্দিক। এই ভ্রমণে পাঠকের আমোদই-বা কেমন।

নিবিড় *জগৎ ভ্রমিয়া...* কবিতাসমূহের প্রথম পাঠে পাঠক চমকিত হন 'রুহ' এর ব্যবহারে। লোগোসেন্ট্রিজম বা শব্দকেন্দ্রিকতা যদি আমলে আনি তাহলে এই পাঠ দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা বহুপাঠে পরিণত হয়। 'চমক' শব্দটায় বাজারি গন্ধ আছে, তাই নিষ্ঠ পাঠকের তা সয় না। রুহ-এর বিবিধ গতিবিধিতে কবির যে সওদাগরি নেই, তাতে যে মুন্সীয়ানা আছে সেটা পরের পাঠেই আবিষ্কার তাই স্বস্তিদায়ক। চমক কেটে নিমগ্নতায় ভ্রমণসঙ্গী হতে উদ্‌গ্রীব হই আমরা। আমরা প্রথম কবিতাতেই কালহাঁসের নৃত্যময় ভ্রমণের কথা শুনি, যে কি-না 'পৃথিবীর বিবাহের দিন থেকে' তার আচার সেরে আসছে; এতে কবির যোগাযোগ দক্ষতায় পাঠক এবার নিজেই নটী হয়ে উঠছেন বলে মনে হতে পারে। সত্তাস্থিত 'আমি' এবং 'অপর' এর চাপান-উতোরে হাঁস, ময়ূরী কিংবা কবি সত্তাদর্শনের নির্বিশেষ কুশীলবে পরিণত হন, ফলে 'ভূমিবিদ্ধ একটি পালক' হয়ে ওঠে জৈব-আচরণের শেষতম স্মৃতিচিহ্ন। গ্রন্থের প্রথম কবিতাতে যে নাচ আমরা দেখি, তা উচ্ছল নৃত্য নয়, তা 'এক ধরনের থমথমে নৃত্য'। এই নৃত্য দ্বিতীয় কবিতায় এসে হয় 'মন্ত্র'। প্রথম কবিতার 'অন্যরকম আলোক' দ্বিতীয় কবিতায় স্পষ্টতা পায় 'ধূসর' হিসেবে—

> ...জগৎ ভ্রমিয়া দেখি অপার ধূসর আলো জগৎ ভ্রমিয়া
> পৃথিবীও নীবিহীন খসিয়া পড়ার মতো খসখসে পাতা—
> বাস্তবে জগৎ কার্বনের।
>
> ['মন্ত্র', পৃ. ৮]

প্রথমে জাগতিক স্বার্থগৃধ্নুতা এবং এরপর পৃথিবীকে খসে পড়ার মতো খসখসে পাতা আবিষ্কারের পর গুরুমন্ত্র 'জ্বলন্ত সন্তের আব্রু' শুনে কবি স্পষ্টতই পলায়নপর মরমীয়া হিসেবে প্রতিভাত হন, সহজ স্বীকারোক্তিতে জানান দেন মানবীয় সীমাবদ্ধতা—

> ...বাস্তবিক এক পক্ষী-পরিমাণ দেহ মোর
> শীতল পঞ্জির মতো এতটুকুন জমন্ত বুক
> কীভাবে পালান দোব? কীভাবে পালান দোব আমি
> আরেক পক্ষিণীগোত্রে?
>
> ['মন্ত্র', পৃ. ৮]

প্রাত্যহিক জীবন-ছক ভেঙে দিয়ে অধ্যাত্মের কুয়াশাময় জ্ঞানতৃষ্ণায় সাধু-সন্তের যে জীবন মিথ আর গল্পে মিশে গেছে কবি যেন সেই হাতছানিতেই ভ্রমণ পিয়াসী।

জগৎ ভ্রমিয়া... কাব্যে মানবজীবন পরিক্রমার সূক্ষ্ম কাব্যিক বয়ান একদিকে, অন্যদিকে রয়েছে জৈব-অজৈবসত্তার দার্শনিক অভিযাত্রা। প্রাকৃত জীবন-বীক্ষণের অভূতপূর্ব প্রতিফলন

এবং এর মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র ডিকশন কবি নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। পূর্ব-ডিকশন স্বীকার করে যাওয়া মানে কবিতার লাশকে কবির কাঁধে নিয়ে বেড়ানো—*জগৎ ভ্রমিয়া*...-র কবি সেটা খুব ভালোভাবেই জানতেন। আর জানতেন বলেই মানবজীবন ও সত্তা সম্পর্কে গূঢ় অথচ বহুচর্চিত দার্শনিক তত্ত্ব-বয়ানের সারকে কেন্দ্রে রেখে গড়ে তুলতে পেরেছেন বলয়। বলে নেয়া প্রয়োজন যে, বক্তব্যই কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতার করণ-কৌশল নির্মাণ করে দেয়।

ক. ...আমি জানি,
স্নায়ুর তরল অগ্নি কখন বিজলির রূপ
কখনই-বা বজ্রপাত আবার কখন
একতাল স্তব্ধ মেঘের অহম: সেইমত
চলিছে প্রাণের মীন ঘোর অমানিশার শিয়রে
একটি সবুজ বাতি।

['মেঘের অহম', পৃ. ১৫]

খ. ...অতিকায় তরুর সতের পাছাপেড়ে
আঁচল টানার মত অবগুণ্ঠনের সন্ধ্যা
মারীচমায়ায়
বেহুদা বিভ্রমে
আমাকে গুলিয়ে ফেলে,
দীঘল শরীরব্যাপী যে-প্যাঁচানো হিমঝড়
আমার মস্তকজুড়ে এধারে-ওধারে
লেজ ঝাপটায় তার কি অবসান নাই?

['এমন মানবজমিন', পৃ. ২৫]

গ. ...অতঃপর চলা শুরু হবে— যেরকম কানা ঘোড়া
হঠাৎ আলোর দেখা পেয়ে জলপানে ঈষৎ ইচ্ছুক হয়ে ওঠে,
সে রকম রুহ আমার জামার ভিতর থেকেই ধুকপুক জবাব দেয়
সে আছে, সে আছে অন্ধকার ঘরের কোণায়। দেখি—
অবিরাম কলবের টানাটানি। আমি কি উহারে
ঘোড়ায় ওঠায়ে নেবো? আমি কি জিগাবো তারে তড়পানো মাছ
সে কেন উজায় শূন্যঘরে? তলে-তলে
পানি বাড়ে, দেখে না আমার রুহ, ডুবে যেতে থাকে
গোটানো আগুন ভেসে থাকা শাড়ির মতন, হয়তোবা শেষচুল
গাছি,
ডুবন্ত মনের ঘোড়া কদমের তল নেই
শরীর ভেসেই থাকে জলে যেন উল্টানো খড়ম!"

['খড়ম', পৃ. ৪৫]

ঘ. ...সারাদিন হামেশাই রুহের কদম ধরে বসি
পাগল মনার খোঁজে। ভবিতব্য কোথায় পালালো

পৈখা, পৈখা মোর, মনভুলে কত বাত্তিজ্বালো
অবোধ ফুঁয়ের মধ্যে, ছিঁড়ে পড়ে, কৈতরির রশি!"

['মনা', পৃ. ৪৩]

ঙ. ...আমি এক সন্দিগ্ধ কৃষক, জ্বালিয়ে আগুন অবিরাম
নোংরা করে ফেলি আমার খামার; তুমি রুহ,
জগৎ ভ্রমিয়া চাহ কি উদোম হতে?
চাহ কি গতর খুলে গতরে ফিরিতে?

['যখন সন্ন্যাসে থাকি', পৃ. ৪৮]

কবির সত্তাদর্শন মূলত 'আমি'কে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়ে অল্টার ইগো-তে জারিত হয়ে হিউমেন বিয়িং-এর সত্তানুসন্ধানের পথে মিশে যায়। নিরীক্ষাপ্রবণ কবির নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্যের এই কবিতাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় আরও কিছু কবিতা, যার আস্বাদ ঠিক পূর্বের সঙ্গে মিশ যায় না।

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী

এখানে উদ্ধৃতি ক-তে 'স্নায়ুর তরল অগ্নি' বলতে বীর্য, মীন মানে মাছ, দেহরূপ সমুদ্রে মাছরূপ হলো আত্মা, এই আত্মাই জগতের সব আলোর মধ্যে স্পষ্টতম এক সবুজ বাতি। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষে সাধকদের কায়াসাধনের কথা স্মরণ করা যায়। তাদের মতে যা আছে ভাণ্ডে (দেহে), তা-ই আছে ব্রহ্মাণ্ডে (পৃথিবী)। তাই তারা অবাক বিস্ময়ে দেখেছে দেহ, সাধনায় জানতে ও বুঝতে চেয়েছে এর আদ্যান্ত। কাহ্নপাদের যে সাধনা বৈষ্ণব-বাউলের যে সাধনা, তান্ত্রিক-কাপাকিদের যে সাধনা, সহজিয়া-মরমীয়াদের যে সাধনা—তার সারাৎসার *জগৎ ভ্রমিয়া*...র 'আমি'র সাধন-উচ্চারণে প্রতিরূপিত। উদ্ধৃতি খ-তে 'আঁচল টানার মত অবগুণ্ঠনের সন্ধ্যা' হলো অজ্ঞানতার কালিমা, আবার কায়াসাধনায় কামের আগ্রাসন। কবিতায় 'আমার মস্তকজুড়ে' এর লেজ ঝাপ্টানোতে এই আগ্রাসনের প্রকার সার্থকতা পায়। আর 'চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল'-রূপ এই আগ্রাসন থেকে 'আমি' অবসান চায়। উল্লেখ্য লুইপা গুরুকে জিজ্ঞাসা করে এর উপায় জানতে বলেছিলেন তাঁর পদে। আমরা দেখি কবিও একাধিক কবিতায় এই গুরু প্রসঙ্গ টেনেছেন। এতে এটাই স্পষ্টতা পায় যে নব্বইয়ের এই

কবি মানবজীবনের আদি জিজ্ঞাসার পথ ধরে ভ্রমণ করেছেন, ভ্রমণ করেছেন নিজের ইচ্ছানুযায়ী। উদ্ধৃতি গ-তে 'কানা ঘোড়া' হলো নির্মোহ গতি এবং অন্য অর্থে অবদমিত কামনার প্রতীক। দেহস্থিত আত্মা এখানে 'তড়পানো মাছ' হিসেবে এসেছে। অবদমিত কাম নিয়ে শরীর যখন উল্টানো খড়মের মতো ভেসে থাকে সেই জলের ভেতরেই আত্মারূপ মাছ তড়পায়। এই কবিতাতেই দেহ ও আত্মার অবস্থানগত এক তাত্ত্বিক সমীকরণে কবি এসে পৌঁছেছেন। পরের উদ্ধৃতি অর্থাৎ উদ্ধৃতি ঘ-তে আত্মাকে কেন্দ্রে রেখে কবির ভাবনা বিকশিত হয়েছে। কেবল আত্মা নয় তা বিস্তার নিয়েছে অধ্যাত্ম ভাবনাতেও। 'রুহের কদম ধরে' বসে থাকেন সাধক কবি 'পাগল মনা' অর্থাৎ পরমাত্মা কিংবা বাউল কথিত অলখ সাঁই-এর সন্ধানে। উদ্ধৃতি ঙ-তে কৃষক-রূপী আধ্যাত্মিক সাধক কবি রুহ সম্পর্কে এক অবিনশ্বর ধারণায় স্থিত হন। আমরা এ পর্যায়ে যেতে পারি জন্মান্তরবাদে কিংবা পবিত্র আত্মার অবিনাশী তত্ত্বে যেখানে বহুরূপে বহুবার আত্মা পৃথিবীতে আসে। আত্মাধারী দেহ এক সময় বিলীন হয়, আত্মা রূপবদল করে খুঁজে নেয় নিজ আশ্রয়। আত্মার এমন রূপান্তরকামী ভ্রমণে কবির সত্তা চংক্রমণের শ্রুত কিন্তু সন্দিগ্ধ অথচ আশাসঞ্চারী জিজ্ঞাসা এখানে দার্শনিক ভিত্তি পেয়েছে। বুদ্ধের মতে জন্ম নেওয়াটাই কষ্ট; মানবজীবন শাপ, সন্তাপ, দুঃখে জর্জরিত; কবির বাণীও ছুঁয়ে যায় এর মর্ম—

...মাটির ভিতরে অবাক ঢুকছে দেখি
মাছের মতন ধলা একটুকরো তড়পানো রুহি
এমন অস্থির রুহ পইপই ঘোরে আর বের হয়ে যায়
আমার জামায়,
অবোধ মুর্দার মতো আমি পড়ে থাকি
কয়েক শো বছর, যেন বা অযুতবর্ষ, বা কয়েক কোটি,
রুহ শুধু ঘোরে— আমার সিথান থেকে হরিণার কালঘুম
দক্ষিণার নদীনালা, উত্তরার ফিঙাশীত
পশ্চিমের দরবেশ, পুবে যে করুণ পৈখা
জ্বালা নিয়ে বিড়বিড় করে চাদরের নিচে
আমার সিথান আমার কালঘুম
হায় এভাবেই ভ্রমিয়া-ভ্রমিয়া
দুঃখ পেতে থাকে জাগতিকে

['পূর্বনদী স্মৃতিধোয়া', পৃ. ৪৭]

কবির পারঙ্গমতা এখানে কেবল আত্মা ও দুঃখবোধ প্রসঙ্গে বুদ্ধের দর্শন বয়ানে নয়, রুহ বা আত্মার মূর্ততা ও ক্রিয়া নির্মাণেও। অর্থাৎ কাব্যাংশের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের বাইরেও আমরা অজৈব 'রুহ'কে জৈব চোখে যেন দেখতে পাচ্ছি, দেখছি এর 'ধলা' বর্ণ, 'তড়পানো' অবস্থা, 'পইপই' ঘূর্ণন, 'দুঃখ' পাওয়ার অনুভূতি।

এভাবে কবির সত্তাদর্শন মূলত 'আমি'কে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়ে অল্টার ইগো-তে জারিত হয়ে হিউমেন বিয়িং-এর সত্তানুসন্ধানের পথে মিশে যায়। নিরীক্ষাপ্রবণ কবির নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্যের এই কবিতাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় আরও কিছু কবিতা, যার

আস্বাদ ঠিক পূর্বের সঙ্গে মিশ যায় না।

ক. ...সবকিছু এমন মিশেল ধুলো রাগানুভূতির মতো শিরশিরে
সূক্ষ্ম রোঁয়া ওঠে মনে।
... .
... ...
তাই বলি, ডানায় হিমেল ধুলো তাই বলি ধুলো পড়ে
থাকে প্রতি আঁখিপাতে।

['ধুলো, পৃ. ৩১]

খ. ... যে জগৎ ধূসর আগুনে
পুড়িয়ে ফেলেছি, চলেছি সে-জগতের স্বপ্ন-সোয়াটার বুনে;
আসলে বিরানভূমি! এ-বাড়ি ও-বাড়ি সারাদিন তুলো ধোনে
উড়নচণ্ডীর হাওয়া; ঘরময় আসবাবে পড়ে থাকে ধুলো;—
মনে জাগে ভ্রম: আজীবন এক কাব্যকুহকীর ডাক শুনে...

['আমি কবি', পৃ. ৩৫]

গ. ...মুখ ছেয়ে গেছে শৈতিক বিষণ্ণতায়;
মনে পড়ে, তুমি ছিলে অগ্নিসঙ্গিনী। জিয়নকাঠি। শূন্যতায়
আমার আগুনে এসে এলোমেলো কখনো তোমার মৃতধূপ
জঙ্গম পারঙ্গমতা পায়, বিস্মৃতির নগ্ন তাসের তুরূপ
তুমি জলহীনা,... ... ...
... ... ভাসানো সময় ;
রয়ে যায় কিছু ছায়া, জলছাপ, না ফেরার নির্জন বৈঠকে।"

['অগ্নিসঙ্গী, পৃ. ৩৬]

ঘ. ... কবরের মাটি ঈষৎ সরলে
আকাশ দেখার ভান করে মৃতলোকে লজ্জাবন্ত
গুমহাসি হাসে... হঠাৎ পথের শেষে তার গাঢ় অবগুণ্ঠন;
এইবার তাকে দেখে লই যেইভাবে মনে লয়,
নদীর জল নিংড়ে তাকে দেখি... নৌকা লয়ে সে চলেছে—
জল ঘাস ডিঙি আর মানুষের দেশে।

['মানুষের দেশে' পৃ. ২৭]

পূর্বে উদ্ধৃত (ক-ঙ পর্যন্ত) কবিতাংশে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম কবির তত্ত্ব দর্শন অভিযাত্রা; নস্টালজিয়া ও মন্তব্য আক্রান্ত পরের উদ্ধৃতি চতুষ্টয়ে আমরা পূর্বসূত্রের জের আবিষ্কার করতে পারি, আর যদি তা না চাই তা হলেও এর পাঠ বিক্ষিপ্ত মনে হয় না, মনে হয়না অসম্পূর্ণও। যেমন—উদ্ধৃতি ক-তে 'রাগানুভূতির মতো শিরশিরে সূক্ষ্ম রোঁয়া' ওঠা অনুভব তত্ত্বলব্ধ নয়, তা অনুভবলব্ধ এবং সন্দেহাতীতভাবে তা কবিতা আক্রান্তই। 'ধুলো' নামধারী এই কবিতায় মানবদেহকে 'পুতুল' আখ্যা দিয়ে তার ধুলোময় বিলীনতার গল্পাভাস

নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্ধৃতি খ-তে কবির চৈতন্যের সমান বয়সী যে কবিতা—যা লেখা হয়েছে জীবনে ও স্মৃতিতে— তার ক্ষীয়মাণ অংশ ধুলোর রূপকে ঢেকে কবির ভবিতব্য ও প্রেরণার উৎস নির্দেশিত হয়েছে। উদ্ধৃতি গ-তে স্মৃতি—হাতড়ানো কবি সময়ের নির্মোহ স্রোতের উজানে 'না ফেরার নির্জন বৈঠকে' স্মৃতির অবশিষ্টাংশ থেকে যাবার প্রত্যয় আবেগের কাব্যিক পেলবতায় অথচ দার্শনিক নিষ্ঠায় ঘোষণা করেছেন। আর এই প্রত্যয়-ই যেন উদ্ধৃতি ঘ-তে মৃতলোকের 'লজ্জাবন্ত গুমহাসি' ও 'গাঢ় অবগুণ্ঠন'সহ যেভাবে কবির 'মনে লয়' সেভাবে দেখার মধ্যে প্রকাশ পায়। আর স্বর্গ নয় নরক নয়, সেই জায়গাতেই কবির এই কাব্যপরিভ্রমণ কিংবা কল্পপরিভ্রমণ যা 'জল ঘাস ডিঙি আর মানুষের দেশ'।

'মানুষের দেশে'তে সৌন্দর্য অনুসন্ধী কবি মন, মস্তিষ্ক কিংবা অনুভূতির ঠিক যে জায়গাটা থেকে কবিতার জন্ম দেন, সেখানটায় সঞ্চিত সব সৌন্দর্য দিয়ে এক পরীকে নির্মাণ করেন। সেই পরীকে কবি ইচ্ছানুযায়ী দেখে নেন গড়ার সময় ও গড়ার পর। আমরা ধরে নেবো 'সুজাতা'কে দেখা হয়নি বলে কবি এমন মানবী বা নারী বা প্রেয়সীকে নির্মাণ করেন—

...অনেক আলোক ফেলে গেছি, যেইবার সৌরঝড়ে
তোমাকে দেখার কথা ছিল, আঁচলখসানো পাতা,
...অঢেল হলুদ দেহ সারাদিন তুমিও সুজাতা,
শাড়ি-ছিপছিপে দেহ ঢুকে গেছো হয়তো গহ্বরে।

['নয়নাভিরাম', পৃ. ১০]

'বিধিবাম' হওয়ায় এমনতরো সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে যায়, জাগরূক থাকে কেবল কবির কল্পনা। তারপর হারিয়ে যাওয়া মানবী এবং প্রেয়সীকে নিয়ে কবি লেখেন নিরলস—

...সেসব বুঝেই আমি তোমার মাটির দেহটিকে ভয়ানক
ভালবেসে জাগিয়ে রেখেছি। যদিওবা জানি, মাটি দেহ
হলেও, দেহ ত মাটি নয়। তবু ধুরন্ধর লোকে সুবিধাজনক,
দেহকে ধূসর মাটি বলে সন্তর্পণে মনে জাগায় সন্দেহ।
সে কারণে অনিদ্রার ঘুম থেকে স্মৃতিগন্ধ জেগে আচানক,
তোমার ওষ্ঠের ধুলো ঝেড়ে বুকে তুলে নিই তোমাকে সস্নেহ।

['তারুণ্য-নিংড়ানো আলো', পৃ. ৩৪]

অন্তর্জাগতিক এইসব কুশীলব কবির প্রাত্যহিকতার বাইরের। অনির্দেশ্য প্রেম, প্রেমময়তার সৌকর্যে এইসব পঙ্‌ক্তিসমূহে পরিশুদ্ধ মানবীয় আবেগ বিন্যস্ত। এর বাইরে একটি কবিতায় কবি প্রাত্যহিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন—

...কালরাতে প্রেয়সীকে মনে পড়েছিল; মহিলাটি
আমাকে যায়নি ভুলে, সে আজ কারুর ঘরে আছে
জটিল রমণী হয়ে অহেতুক সপ্তাহের কাছে
সে যাচে প্রয়াত রবিবার খোঁড়ে হৃদয়ের মাটি;
... ...

দেহলোমে সে মেখেছে নুন। নারী তাকে বলি আমি
কীভাবে এখন? ... ...
... ...এ এক অদ্ভুত মাতলামি।
জঠরে সন্তান থাকে, বহু শতাব্দীর ডোরা ঘেঁটে
ফের সে ঔরস পায়... জগৎ ভ্রমিয়া হেঁটে হেঁটে
মহিলাটি আমারে শুধায়: মুই তোর অন্তর্যামি!

['লবেজান', পৃ. ৪৪]

কবি এবং কবি-প্রেয়সী 'মহিলা'টির অবস্থা অবস্থানের জের ধরে জীনবচক্রের অন্তিমে আত্মার দোসর হয়ে থাকা মানবকে মানবীর এই প্রশ্ন প্রাত্যহিকতার সীমাকে অতিক্রম করে যায়। আমাদের স্মরণে আসে আত্মাস্থিত প্রেমসত্য এবং সংসার তথা লোকাচারের মধ্যেকার ফারাক, আমরা মনে করে ফেলি আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধাকে, রাধার কৃষ্ণানুরাগকে তথা পরমাত্মাকে ছুঁড়ে দেয়া জীবাত্মার প্রশ্নকে।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অভিসার কৃষ্ণ-রাধার রূপকে 'আশেক-মাশুক' হিসেবে সুফি-সাহিত্যে বহুপ্রজ। কাদেরীর সুজাতা কিংবা প্রেয়সী মহিলাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই 'জগৎ ভ্রমিয়া'য়। আরও কিছু নারীকে আমরা পেয়ে যাই সচকিতে কাব্যের দুটি কবিতায়, তাদেরকে আমরা পেয়েছিলাম যদিও অনেক আগে। চারুলতা, মৃণাল, কাদম্বরী, চন্দরা—এদের কথা বলছি। ত্রিশোত্তর কবিদের আবির্ভাব-মূলে ছিল রবীন্দ্র-বিদ্বেষ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে 'ক্লান্তি' দেখি আমাদের বর্তমান কবির। তিনি সেমিনার কিংবা যে-কোনো রবীন্দ্রসাহিত্যে রবীন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রে— সবখানেই ক্লান্তি নিয়ে দেখেন এই 'শুশ্রূময়' কবিকে। বিশেষ করে 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালকে অবলম্বন করে সাম্প্রতিক সময়ের নারীদের অবস্থান মূল্যায়ন করে তাদের কারুণ্য ও প্রতিবাদের তাৎপর্যহীনতার ভাষ্য করেন কবিতাকে—

...তোমার চিঠির ঘাম চুয়ে পড়ে বেলাভূমে অতি রাবীন্দ্রিক
মৃণাল হে। যে আঁধার গলিটাকে ভীতিহীনা গিয়েছো মাড়িয়ে
সে যে এক অদ্ভুত বেড়াল। লজ্জাপিতজ্যোতি সে দেয় বাড়িয়ে—
বার বার আসে, দুধ খায় চুকচুক, যেন সুপ্রাচীন গ্রিক
ধূসর পুরাণবৃত ক্লান্তির অমোঘ ট্রাজেডিতে সামগ্রিক
এক বিড়ালের পদছাপ, মৃণাল হে, আজ ঠিকানা হারিয়ে।

['রবীন্দ্রনাথ ও ক্লান্তি—২', পৃ. ৪১]

সমসময়ের অভিঘাত স্পষ্টতই কবি ধারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক এই কবিতা দুটিতে।

সত্তাসন্ধানের তত্ত্ব-দর্শনে *জগৎ ভ্রমিয়া*...-র কবি কখনো আরোহী আবার কখনো অবরোহী হিসেবে নিগূঢ় চিন্তাশীলতায় এবং জাত কবির সংবেদী নিষ্ঠায় কবিতাকে ঠিক কবিতা হিসেবেই হাজির করেছেন। কবি বায়তুল্লাহ কাদেরী তাঁর অপরাপর কাব্যেও দর্শন-পরিশ্রুত জীবনকে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন অগ্রজদের ঋণ, স্পষ্টভাবে দেখাতে পারেন নিজের স্বতন্ত্র সংযোজন,

...দেখলাম, আঞ্চলিক শব্দ, ভাষাভঙ্গি লোকজ ফর্ম বাংলা কবিতায় অগ্রজেরা করেছেন দারুণভাবে। এ পথের জনপ্রিয়তা এমন আকাশচুম্বী হল যে, এর প্রচুর

অনুকারক তৈরি হতেও সময় লাগে নি। অতএব আমি এ রাস্তায় কি করে হাঁটি? দেখেছি, অগ্রজদের কবিতায় প্রেম আছে, স্বদেশ আছে, আন্দোলন আছে, মানুষ আছে, যন্ত্রণাও আছে কিন্তু নেই সর্বৈব জীবনচেতনাজাত সামগ্রিক দার্শনিক বোধ— যা দিয়ে চিহ্নিত হতে পারেন। আবার দার্শনিকবোধ বাংলা কবিতায় দূর অতীতে যে ছিল না তা-ও নয়; তাহলে কীভাবে আলাদা হব? ভাবলাম; জীবন সম্ভবত দুরকম: অন্ত্যজও ধ্রুপদী। চাইলাম এ-দুয়ের সমন্বয় কবিতায় আনতে। আর একারণে আমার দু-জীবনের উপযোগী একটি ভাষাভঙ্গি আবশ্যক। একই আমি অন্ত্যজ এবং ধ্রুপদী জীবনকে দিতে চাই একটি সর্বৈব রূপাবয়ব।

['অমিত্রাক্ষর', পৃ. ১৫৫]

কবির জবানির একাংশ এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। অপরাংশের সমর্থনে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'উল্টাভ্রমণ' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটি—

...ওইভাবে ডাক পাড়ো কেআঁ, কে আঁ ডাকিবাম মোরে
সৈকালে দৈফরে? পঙ্খির পাখ্নাটাকে উল্টে ডানা ফড়ফড়
এটুকুন বুক ডাকিতে ডাকিতে উল্টা ভ্রমণ শুরুর গুঁড়াচূর্ণ
জগতের সাদা শারিলের ধুল, আউলাঝাউলা
মনের ভিতরে ছাতা পরা ভেজা মেঘ,
অমন ওমের মেয়ে এভাবেই চাহন্ত জগৎ ভ্রমিবারে?
টঙ্কা ফেলে টঙ্কা গুনে চলে যায়...উথাল-পাথাল যায়
প্রিয়ভোম্বী, অগ্নিশাড়ি...জগতের কুয়াশায়
বেঘোর রতির ঘোরে হরবোলা কার লাশ মিশে যায়!"

['উল্টাভ্রমণ', পৃ. ২২]

এই কাব্যগ্রন্থের প্রধান ধারার কবিতা এটি। সত্তার দ্বৈতরূপ ও এর তাত্ত্বিক সম্পর্ক তথা সংযোগ-আকর্ষণের কাব্যরূপ এটা। ভাষিক নির্মাণশৈলী এই কবিতার বিশেষায়িত দিক। কুমিল্লা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় গড়ন এর গূঢ় তত্ত্বকে ধারণ করেও আলাদাভাবে আমাদের নজর কাড়ে। আমরা স্বীকার করে নিই এটা অন্যদের মতো নয়। মিথের প্রাণবন্ত ব্যবহারে, লোকজ মোটিফের বিশেষ প্রয়োগে বাইতুল্লাহ্ কাদেরী যে ডিকশন নির্মাণ করেছেন তাতে 'নিজস্বতা' সব প্রভাব ও সমন্বয়কে ছাপিয়ে সামনে চলে আসে।

এবার আসা যাক পাঠকের অপ্রাপ্তির জায়গায়। আমরা জানি শতভাগ প্রত্যাশার সবটুকু কোনো একজনকে অপর একজন দিতে পারে না। আর কবিতায়, বিশেষত যেখানে একজন সংবেদনশীল উচ্চ অহঙ্কবোধসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি সেখানে, যেকোনো একজন বা অনেক পাঠক তার বক্তব্য ও ভঙ্গিকে একইভাবে গ্রহণ করবেন না এটা স্বাভাবিক। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কবিতা প্রসঙ্গে নতুন নয়। *জগৎ ভ্রমিয়া*...তেও এই অভিযোগের পাঠক-পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। এ কাব্যের অনেক কবিতা তত্ত্ব-অজ্ঞ পাঠকের বোধের নাগালের বাইরে।

...এই যে ঘোড়ার রোগ, বেপরোয়া, শুধাই কাহারে—

মানায় কি মোরে? পাপ, পুণ্যিতে চিরুণ নদী মুই—
আর তো কিছুই নই, বুঝলি না রে পাগল ওই!
ভবেতে মজিলি আর জলহীন অবোধ সাঁতারে
ভাসালি নাও রে তোর, অন্য পারে অথচ নিতুই
পারানিবিহীন নদী: পা'লাম না উজাতে আন্ধারে...

['ঢঙ'/রুহের কবিতা, পৃ. ৪২]

'রুহ'-এর সৃষ্টি ও ক্রিয়ার তাত্ত্বিক দিক না জেনে উপর্যুক্ত কাব্যাংশের অনুধাবন সম্ভব কি? তাছাড়া এই কাব্যগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ দিক এর সিরিজকবিতা 'রুহের কবিতা'-এর অন্তর্গত খণ্ড-কবিতাগুলোর সরলীকৃত শিরোনাম বিন্যাস কাব্য-পরিবেশনাগত দৃষ্টিকটু ত্রুটি। ব্যাপারটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন— নিবিড় পাঠে সহজেই অনুমেয় 'ঢঙ' থেকে 'যখন সন্ন্যাসে থাকি' পর্যন্ত সাতটি বিষয়গত যোগসাযুজ্যপূর্ণ কবিতা মিলে সৃষ্টি হয়েছে একটি সিরিজ, যার নাম 'রুহের কবিতা'। কিন্তু সূচিপত্রে তো নয়-ই গ্রন্থের অভ্যন্তরগত বিন্যাসেও তা স্পষ্টতা পায় নি। এর বাইরেও দু-একটা কবিতার অক্ষর-বিন্যাসে প্রকাশকের মনোযোগহীনতার ছাপ স্পষ্ট। যাহোক, এমনতরো ত্রুটি মুক্ত হয়ে কবির আগামীর গ্রন্থগুলো হোক নতুন কাব্যাস্বাদের বাহক।

তথ্যসূত্র

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, *জগৎ ভ্রমিয়া...*, লেখাপ্রকাশ, ঢাকা ২০১৪

আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত *অমিত্রাক্ষর*, কবি বায়তুল্লাহ কাদেরী সংখ্যা, বর্ষ ১১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১২

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫

শওকত হোসেন এবং নিশাত শারমিন সম্পাদিত *হালখাতা*, 'বাংলাদেশের কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা', ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১১

খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *কবিতার অন্তর্যামী : আধুনিক উত্তর আধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা ২০০৮

নীপা জাহান : জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯৮৯। প্রাবন্ধিক-গবেষক-সমালোচক। পেশা : বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা।

প্রাপ্তি উৎস : লেখা প্রকাশ, ফোন : ০১৭১৫৪৫৭২৩৪, ০১৭১৮১১৭৭৫৫, ০১৯২৭৩৮৬১৬৮

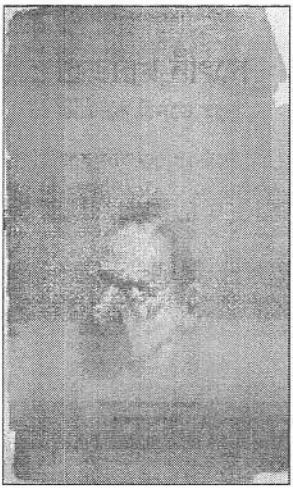

সমালোচক-লেখক দ্বন্দ্ব : আহ্‌মেদ লিপুর সমালোচনার দিক দিগন্ত—বিস্তৃত ও সংকীর্ণ

ফজলুল আলম

গত সংখ্যা (এগারোতম সংখ্যা নভেম্বর ২০১৩) *বইয়ের জগৎ*-এ আহ্‌মেদ লিপুর সমালোচনা প্রায় একচতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি পাঁচ-পাঁচটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছেন। তথ্যটি উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, এত মনোযোগ দিয়ে লেখকদের শিক্ষিত করার সদিচ্ছা আছে তেমন দার্শনিক-পণ্ডিত-সাহিত্যিক ব্যক্তি আছেন সেটা জেনে রাখা ভালো।

আমার দর্শনের অধ্যাপককে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি উল্টো প্রশ্ন করতেন, "ওহ তুমি ওটা বোঝো নাই, তাই কি?" যদি উত্তর দিতাম "হ্যাঁ স্যার!" তা'হলে তাঁর উত্তর হতো, "তুমি যে বোঝো নাই সেটা তো বুঝেছো, ঠিক? তা'হলেই বোঝা হয়ে গেছে।" এই হলো দর্শন সম্পর্কে আমার দর্শন। অত্যন্ত সহজ এই দর্শন। দর্শনকে সকল বিষয়ের মধ্যে উচ্চতম স্তরে স্থান দেওয়া হয়—সেটা কতটা যথাযথ তা বিচার্য। দর্শন ও দার্শনিক যদি এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতো তাহলে আজ বিশ্ব পরিস্থিতি সম্ভবত এতটা নিম্নগামী হতো না। আমার এই অতি সরল ব্যাখ্যায় অনেকে বিব্রতবোধ করতেও পারেন। তবে নীৎসে সম্পর্কে আমি যা বলি নাই সেটা দিয়ে আমার ভাষান্তরিত ও সম্পাদিত পুস্তকটিকে আলোকিত করার প্রয়াস লক্ষ করে আমি হাসি সামলাতে পারলাম না। সমালোচক আমার পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই সৈয়দ আলী আহসানের উদ্ধৃতি কেন বিশাল পর্দায় উদ্ভাসিত করলেন তা বুঝলাম না। পাঠক উদ্ধৃতিটা আরেকবার পড়ে দেখুন এই বাগাড়ম্বর সত্যি বলতে কি নীৎসের ওপর কোনোই আলোকপাত করে না। নীৎসেকে 'অতিমানব' হিসেবে উপস্থাপন করার ইচ্ছা আমি কি প্রকাশ করেছি? এই বইটি পাঠকদের কাছে তুলে

ধরেছি অনেক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখা যে, নীৎসের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কিছু রচনা একশর বেশি বছর পরে পুনঃপ্রকাশ পাঠকের মনের কোনো অনুসন্ধিৎসা পূরণ করতে পারে কি না।

অনুবাদক হিসেবে আমি খুব এটা পরিপক্ব হয়েছি কি না, তা আমার বাক্য বিন্যাসে মূল বইয়ের জটিলতা শুদ্ধ বাক্যে রক্ষা করার ক্ষমতা দেখে পাঠক ও সমালোচকগণ বুঝতে পারবেন। আহ্‌মেদ লিপু ঠিকই জানেন যে 'প্যারাফ্রেজিং' বা সহজভাষায় বোঝার মতো করে মূল বক্তব্য শব্দান্তরিত করা এবং অনুবাদ এক কর্ম নয়। মূল বইয়ের পাঠকের কাছে যেটা জটিল সেটা অনুবাদে সরলীকরণ মূল বইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। নীৎসের মূল জার্মান বা ইংরেজি অনুবাদ এবং দু'হাত ঘুরে আমার বাংলা অনুবাদ—তিনটাতেই দুর্বোধ্যতা থাকবেই, কারণ সেটাই নীৎসের মন। মূল গ্রন্থের দুর্বোধ্যতা অপসারণ করার নোটবুক আমি লিখছি না, সে রকমের অখাদ্য নোটবই লেখার অনেকের মধ্যে আমি একজন নই।

লিটেরো-ফিলোসফি একটা নতুন ব্যাখ্যামাত্র, নতুন সাহিত্যকর্ম বা সমালোচনার ধারা নয়, কারণ কোনো সফল মননশীল এবং সৃজনশীল সাহিত্য দার্শনিক উপলব্ধি ব্যতিরেকে কখনোই সৃষ্টি হয় নি?

আহমেদ লিপু যথেষ্ট সংযত হয়ে সমালোচনা করেন, কিন্তু তিনি লেখক বা সম্পাদকের মনোভঙ্গি বোঝার চেষ্টা না করে নিজের মনোভঙ্গি থেকে সমালোচনা করেন। যেমন, তিনি লিখেছেন,

> প্রকাশক একটি টপিক নির্বাচন করতে পেরেছেন যার পাঠক আবেদন আছে কিন্তু এই ভাবুক-শিল্পী ও তাঁর নির্বাচিত কিছু কর্মকে কিভাবে পাঠক, বোদ্ধাদের সম্মুখে তুলে ধরবেন সে ব্যাপারে রুচিসম্মত কার্যকর-নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে উঠতে পারেন নাই।

হা হতোস্মি! সম্পাদক না বলে 'প্রকাশক' কেন? 'পাঠক আবেদন' কী ও কেন বিচার্য? 'রুচিসম্মত' কী জিনিস, অন্তত এই পুস্তকের ক্ষেত্রে—এখানে অরুচিকর কিছু লিখেছিলাম কি? অবাস্তবায়িত পরিকল্পনা বলে আহ্‌মেদ লিপু যা ভাবছেন তা তাঁরই আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা হতে পারে, আমার নয়।

আহ্‌মেদ লিপু যে বইটির পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা পরবর্তী একটা বাক্য থেকে পরিষ্কার হয়। তিনি লিখেছেন,

> অন্যদিকে আমাদের অনুবাদক কিংবা সম্পাদক মহোদয় নীৎসের পাঠ কী রকম ভীতিকর ধরনের জটিল, তাঁর চিন্তাধারা থেকে কোন চিন্তার উৎসারণ ঘটেছে ইত্যাদির বয়ানেই যেন মশগুল।

সেটা লেখকের বা সম্পাদকের স্বাধীনতা—তাতে সমালোচক বাদ সাধছেন কি?

এর পরেই তিনি তাঁর মত চাপিয়ে চাপিয়ে দিলেন,

> সম্পাদক-অনুবাদক যদি লেখার নির্বাচনে অধিকতর মনোযোগী হতেন তাহলে ... 'সাধ্যানুযায়ী আত্মসমালোচনা' লেখাটি অন্তর্ভুক্ত হলে পাঠক নীৎসে-কে অধিকতর চিনতে পারত।

দুঃখিত সমালোচক সাহেব, আপনাকে সে-সব সংগ্রহ করে আরেকটা নীৎসে আপনিই লিখবেন, আমি নই। আমার ছোট্ট প্রয়াসে তাঁর আসল মনোভাব হচ্ছে নিম্নরূপ,

> অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যেহেতু তিনি নীৎসে বিশেষজ্ঞ নন তাই এই ঝক্কিঝামেলায় জড়াতে চান নি।

বইটি যদি এতই অর্থহীন হয়, তবে সমালোচক সেটা নিয়ে সমালোচনা লিখে সময় ও কালির অপচয় করছেন কেন?

তাঁর অন্য কোনও সমালোচনায় লেখক-সম্পাদককে ব্যঙ্গ করে 'মহোদয়' বলতে দেখিনি, আমার ক্ষেত্রে সেটা কেন? তবে বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার বিষয়ে তাঁর উপদেশের ভালি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি নিজেই নীৎসে সম্পর্কে 'অতিরিক্ত' পড়াশোনা করেছেন, সেই পড়াশোনার উদ্দেশ্য সম্ভবত উদ্ধৃতি করে করে ধার করা পাণ্ডিত্য প্রকাশ, নীৎসে বোঝার ক্ষমতা অর্জনে নয়।

তবে এটাও এই সমালোচনা থেকে জানা গেল যে এতেও তাঁর জন্য বিশেষত, সার্ত্রে, ফ্রয়েড, দেরিদা, ফুকো প্রমুখের সঙ্গে নীৎসের দার্শনিক চিন্তার সংশ্লিষ্টতা সম্ভবত দৃষ্টি-উন্মোচক হয়েছে। অবশ্য তিনি এদের সঙ্গে আরো কিছু নাম যোগ করার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে-নীৎসীয় তত্ত্ব বা ধারণা আলোচনা করেছি বা তাঁর অনূদিত রচনায় যে তত্ত্ব ও ধারণা আছে সেসবের সম্পৃক্ততা আমার কাছে অতি ক্ষীণ।

আহ্‌মেদ লিপুকে কিছু গৎ-বাঁধা বাক্য নিক্ষেপ থেকে বিরত হতে উপদেশ না দিয়ে পারছি না। এই বইটি টিউটোরিয়াল লেখা নয়, বা সমালোচকদের মতো স্ব-জ্ঞানে মশগুল ব্যক্তিদের জন্য লেখা হয় নি। ফলে এটাতে কোনো স্কলারলি অ্যাপ্রোচের প্রশ্ন আসে না। তবে এটা পপুলিস্টও নয়। এটা সাধারণ শিক্ষিত চিন্তাশীল পাঠকদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করার প্রচেষ্টা—এটাই শেষ কথা নয়। লেখক-সম্পাদক একটা লক্ষ নিয়ে এগোয়, সেটা কী তা না জেনে আবোল-তাবোল সমালোচনা পাঠকদের বিভ্রান্ত করে মাত্র। এই কাজে আহ্‌মেদ লিপু মাঝে মাঝে (সর্বদা নয়) উৎসাহিত হয়ে ওঠেন কেন সেটার পেছনে কী মনস্তত্ত্ব কাজ করে সেটা জানা গেলে আমিও হয়তো এই প্রতিক্রিয়া দিতাম না।

একটা ভিন্ন কথা লিখে এই বিরক্তি-উদ্রেক করা সমালোচনার সমালোচনা-কর্মটি শেষ করি। কথাটি হলো, যে ইউরোপের বা ভিন্ন দেশের লেখা আমরা অনেকেই হয়তো বুঝেছি বলে মনে করি, কিন্তু সে-সব দেশের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মননের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। সে-সবের ওপরে আছে সে-সব দেশের নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্ক (এথনিক রিলেশানস), ধর্মীয় বিভাজন ও শত সহস্র বিষয়ের জটিলতা। পুস্তকের জ্ঞান দিয়ে সে-সব কথাটা বোঝা সম্ভব সে-সম্পর্কে অনেকেই আমার সঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করবেন।

জ্ঞান আন্তর্জাতিক হতে পারে কিন্তু হয়নি, যা হয়েছে তা ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে হয়েছে। জ্ঞান আন্তর্জাতিক হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বজ্ঞান-অর্জন ও অনুধাবন-ক্ষমতা সীমিত থাকবে—এটা মেনে নিয়ে ধার করা পাণ্ডিত্য নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ মন্দ পরামর্শ হবে না।

ড. বিনয় বর্মন

একজন গবেষক ও প্রাবন্ধিক। দুই যুগেরও অধিক সময় ধরে বাংলা ও ইংরেজিতে লিখছেন ছড়া ও কবিতা। এ পর্যন্ত বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে বই লিখেছেন এক ডজনের বেশি। বাংলাদেশে নোয়াম চমস্কির ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তিনি একমাত্র পিএইচ ডি ডিগ্রিধারী।

ভূত ভূত খুঁত খুঁত

২০১১
মূল্য : ৬০ টাকা
ছড়া

প্রকৃতি
১, কনকর্ড এম্পোরিয়াম (বেসমেন্ট),
কাঁটাবন, ঢাকা

ছড়া যত কড়া

২০০৪
মূল্য : ৪০ টাকা
ছড়া
কথাপ্রকাশ (৮৭, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

হাবিজাবি

২০০২
মূল্য : ৫০ টাকা
নন্দিনী সাহিত্য পরিষদ
৮৯, আরামবাগ, ঢাকা

মানুষের কিছু কিছু বেদনা থাকতে হয়

পাঠসূত্র
৪৫, আল আমিন রোড, গ্রীনরোড, ঢাকা

র‍্যাঁবোর কবিতা

ফেব্রুয়ারি ২০১৩
মূল্য : ৪৫০ টাকা

পান্থজন
৪৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
কাঁটাবন, ঢাকা

বিনিময়ে তাকে তুমি কতোটুকু দাও

মূল্য : ৯০.০০ টাকা

ঝিনুক প্রকাশনী
১, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা।

হ্রস্ব পংক্তিমালা

ফেব্রুয়ারি ২০১৩
মূল্য : ৬০ টাকা

প্রকৃতি
১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা

Music of Silence

(Poetry) 2011
Price : Tk. 100

খুচরা কবিতা ১০১

(কবিতা) ২০১১
মূল্য : ১০০ টাকা

প্রকৃতি
১, কনকর্ড এম্পোরিয়াম (বেসমেন্ট) কাঁটাবন, ঢাকা

জনপ্রিয় বাংলা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ

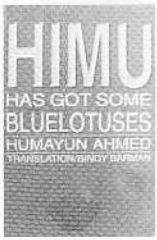

Price: Tk. 100
Dibya Prakash
(38/4, Banglabazar, Dhaka)

Price: Tk. 100
Asia Publications
36/7, Banglabazar, Dhaka

তরুণ ছড়াকার

মামুন সারওয়ার-এর

নতুন বই

দোল দিয়ে যায় বাতাস এসে
প্রচ্ছদ : হাশেম খান
অলংকরণ : মামুন হোসাইন
প্রকাশক : ছোটদের মেলা
মূল্য : ৭৫ টাকা

লাল ফড়িঙের ছড়া
প্রচ্ছদ : মামুন হোসাইন
অলংকরণ : সোহাগ পারভেজ
প্রকাশক : জিনিয়াস পাবলিকেশন্স
মূল্য : ১০০ টাকা

রাজীব সরকারের

সাহিত্যবিষয়ক
প্রবন্ধের বই

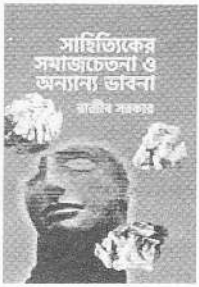

সাহিত্যিকের সমাজচেতনা ও অন্যান্য ভাবনা

অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা) ঢাকা-১১০০
anindya.praokash@yahoo.com

আলম তালুকদারের
কয়েকটি বই

গল্পসমগ্র
ছড়াসমগ্র
বিজয় প্রকাশ
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ছড়া পড়লে চুল পাকে না
অনিন্দ্য প্রকাশ,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ছড়াকারের নির্বাচিত ছড়া
সময় প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিজয় প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা সময় প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

বইমেলা ২০১৫-এ নতুন বই

ছড়ার ডিম
অনন্যা প্রকাশন
৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা

হাওয়া আর রোদের ছড়া
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা

যখন লাইব্রেরিতে ছিলাম
আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা

বইমেলা ২০১৪ নতুন বই

নানারকম ছড়া
অনন্যা, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিশ ও একুশের ছড়া
বিভাস, বাংলাবাজার, ঢাকা

স্বপ্ন ঢোকে আমার বুকে
বাংলাপ্রকাশ, ৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট, ঢাকা

ছড়ার জলে সূর্য জ্বলে
সদ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রম্য রহস্য
নান্দনিক, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা

সংবেদ প্রকাশিত বই

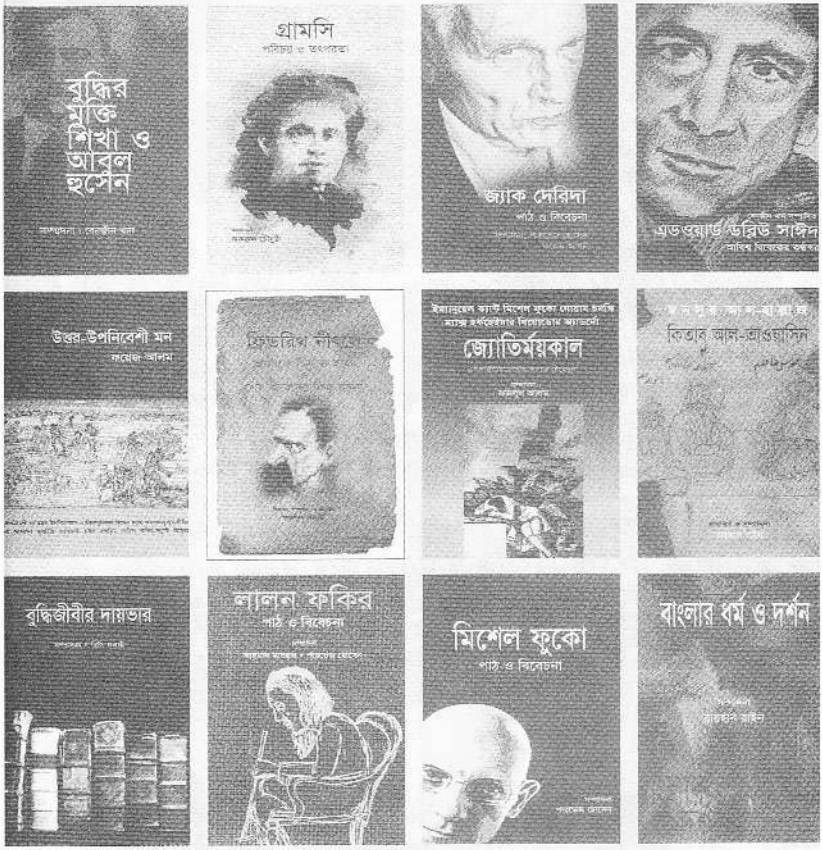

সংবেদ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নয় যা কেবল বই ছেপে দেয়
সংবেদ বই গড়তে চায়
এমন বই যা পাঠকের মনোজগতে সক্রিয় হয়ে থাকবে অনেকদিন

সংবেদ

৮৫/১ ফকিরের পুল, ঢাকা ১০০০, ফোন : ০১৮১৯ ৪৪১৮৮৮

বইমেলা ২০১৪-তে প্রকাশিত

অন্নদাশঙ্কর, খান আতা, নিলুফার ইয়াসমীন প্রমুখ খ্যাতিমান নয়জন মানুষের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা

দূরের পানে পথের টানে গীতালি হাসানের একটি ভ্রমণ অ্যালবাম। ভ্রমণকে তিনি দেখেন আনন্দের বিষয় হিসেবে। ভিন্ন দেশের ভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে ভ্রমণ-সংক্রান্ত যে আনন্দ-রস আস্বাদন করেছেন স্মৃতি জাগানিয়া সেসব রসানন্দের নির্যাসই হচ্ছে *দূরের পানে পথের টানে*।

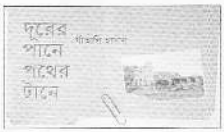

মীরা প্রকাশনী, ৬৮-৬৯, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

ভ্রমণবিলাসী পাঠকের কাছে বইটি ভালো লাগার এবং চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে মাসাই জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ সম্পর্কে চিন্তার খোরাক যোগাবার উপাদানস্বরূপ।

সূচীপত্র,
বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০

অজানা জনপদে আমিশদের সান্নিধ্যে

আমেরিকার নিভৃতচারী প্রযুক্তি ও আধুনিকতা-বিমুখ এক ভিন্ন ধরনের সম্প্রদায়ের কথা।

অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আবদুর রউফের *কর্বট কন্যা*

উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে তৎকালীন ঐতিহাসিক পটভূমিতে। ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রসমূহ কল্পনায় নির্মিত, তবে অনৈতিহাসিক নয়।

দারুচিনি প্রকাশনী
২১৪, ফকিরাপুল, ঢাকা

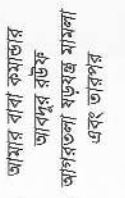

মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব উত্তাল রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার দিনগুলি ও যুদ্ধোত্তর অস্থির কাল পরিসরের কিছু ঘটনা ও স্মৃতি নিয়ে গীতালি হাসানের এই বইটি।

মীরা প্রকাশন, ঢাকা

পাওয়া যাচ্ছে : প্রথমা, বিদিত ও প্যাপিরাস, অভিজ্ঞ কো-অপারেটিভ মার্কেট
শাহবাগ; মধুমিতা, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা এবং কথাকলি, চট্টগ্রামে।

গীতালি হাসান সম্পাদিত দুটি বই

কমান্ডার আবদুর রউফ : সম্মাননা স্মারক

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ত্যাগী নেতা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত মানুষকে নিয়ে দেশের বিশিষ্ট মানুষের রচনায় সমৃদ্ধ সংকলন।

মীরা প্রকাশন
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, ঢাকা

কণ্ঠশিল্পী নীলুফার ইয়াসমীন

বাংলাদেশের সংগীত জগতের অসামান্য শিল্পী নীলুফার ইয়াসমিনকে নিয়ে দেশের সেরা মানুষদের রচনাসমৃদ্ধ সংকলন। শিল্পীর জীবন ও কর্মের সচিত্র পরিচয়।

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ঢাকা

মোয়াজ্জেম হোসেন আলমগীর-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

দীর্ঘকাল ধরে প্রবাসী লেখক মোয়াজ্জেম হোসেন আলমগীর ছোটদের জন্য লিখে চলেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। তাঁর লেখায় পাওয়া যায় উপদেশ ও শিক্ষামূলক উপাদানের উদ্দীপক সমাহার। মানুষ, প্রকৃতি, পশুপাখি, সমমর্মিতা, লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয় তিনি তাঁর ছোটদের লেখায় হাজির করেছেন।

রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষের নিবেদন
মূর্ধন্য, কনকর্ড এম্পোরিয়াম

নবরাগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার

প্রকাশক : জোনাকী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

ছোটদের গল্পের বই
ছোট্ট শিরিন, রায়েরবাজার

ছোটদের গল্পের বই

ছোটদের গল্পের বই

কবিতার বই

প্রকাশক : প্রিতম প্রকাশ, ১১/ ১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ছোটদের গল্পের বই
নবরাগ প্রকাশনী, ৬৮-৬৯ বাংলাবাজার

ছোটদের গল্পের বই
পিয়াল পাবলিকেশন্স ১১/১ বাংলাবাজার

ছোটদের গল্পের বই

ছোটদের ছড়া

ছোটদের গল্পের বই

বই তিনটি প্রকাশ করেছে : মুক্তদেশ, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় মাওলা ব্রাদার্স -এর ২০১৫ নতুন বই

প্রবন্ধ/গবেষণা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
প্রবন্ধসংগ্রহ ১ম ও ২য় খণ্ড
Sheikh Hasina
The Quest for Vision 2021 Vol. 2

আবদুল মওদুদ
ইসলাম ইউরোপকে যা শিখিয়েছে
Masihur Rahman
Constitutional Democracy
Not Death Squads Again
আবদুল খালেক
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা
সাহিত্যে লোকজীবনের স্বরূপ
আনু মুহম্মদ
ঈশ্বর, পুঁজি ও মানুষ

ড. মোরশেদ শফিউল হাসান
খোলা চোখে মুক্ত মনে
ফয়জুল লতিফ চৌধুরী
জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র
কয়েকজন লেখক কয়েকটি বই
সালেহ মাহমুদ রিয়াদ
বাঙলা ভাষা : শুদ্ধ শিখুন শুদ্ধ লিখুন

জালাল ফিরোজ
বাংলাদেশের সাংঘর্ষিক
রাজনীতি ও পার্লামেন্ট
ড. মোহাম্মদ আমীন
অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম
ইঞ্জি. সাইদ আহমেদ
বঙ্গাব্দের ইতিহাস
সাইমন জাকারিয়া
প্রণমহি বঙ্গমাতা (৫ম খণ্ড)
ড. আরজুমান আরা বেগম
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাসে নারী-জীবনের রূপায়ণ

মুক্তিযুদ্ধ

ড. জিল্লুর রহমান খান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের
সম্মোহনী নেতৃত্ব ও
স্বাধীনতা সংগ্রাম

রণজিৎ বিশ্বাস
কথা মানুষের কথা মুক্তিযুদ্ধের
কাজী জাফরুল ইসলাম
বাংলার মুক্তির আন্দোলন
অজয় দাশগুপ্ত
মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ

গল্প/উপন্যাস

সৈয়দ শামসুল হক
বিন্দু
শাহাদুজ্জামান
গল্পসমগ্র ১

হাসনাত আবদুল হাই
উপন্যাসসমগ্র ৫
আনোয়ারা সৈয়দ হক
গলে যাচ্ছে কুলন্ত পদক
হরিশংকর জলদাস
মাকাল লতা
Mohammad Badrul Ahsan
Tales from the Heart

সালেহা চৌধুরী
আয়নায় সময়
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
গুলির শব্দ কিংবা বারুদের গন্ধ
মহি মুহাম্মদ
মেনকা
দিলরুবা আহমেদ
এসো, হাত ধরো

অনুবাদ

আবদুল মওদুদ
পৃথিবী ও পাশ্চাত্যজগৎ
মোস্তফা হারুণ
মান্টো এবং কালো শেলোয়ার
জাফর আলম
ইরানি পোলাও

কবিতা

মহাদেব সাহা
কে জড়ালো এই যন্ত্রজালে
মহাদেব সাহা
বিচ্ছেদ ব'লো না, একসাথে
লক্ষ লক্ষ বজ্রপাত হবে
হাসানআল আব্দুল্লাহ
বিশশতকের বাংলা কবিতা
ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম
অশ্রু, ওষ্ঠ ও তলোয়ার
সামীউল বাশীর
হৃৎকথন

ইতিহাস/স্মৃতি/ভাষণ/বাণী

সরদার ফজলুল করিম
দিনলিপি

বেবী মওদুদ সম্পাদিত
জাতীয় সংসদে
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ২০১২-১৩
মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত
ঢাকার স্মৃতিসমগ্র ১
ঢাকার স্মৃতি ॥ ১৫ ও ১৬ খণ্ড

আতাউর রহমান সম্পাদিত
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বহুমুখিতায় ও স্বপ্নচারিতায়
আমিনুল হক বাদশা
স্মৃতির পাতায় বেগম
ফজিলাতুন্নেছা মুজিব
শাহীন আখতার
গদ্যসমগ্র ১
স্বপন দাশগুপ্ত
আধুনিক বিক্রমপুরের ইতিহাস
এ এস এম আব্দুল মতিন
অন্বেষণ

শিশুতোষ/বিজ্ঞান

বেবী মওদুদ
জয় বাংলা

লুৎফর রহমান রিটন
ধুত্তরি
দস্যুস রওশন
একটি এলিয়েন পরিবার
মুস্তাফা মাসুদ
হাজী মোহাম্মদ মোহসীন
বেগম মমতাজ হোসেন
খুকি ও কাঁঠবিড়ালি
রোকেয়া খাতুন রুবি
ক্লাস এইটের গিয়াসউদ্দিন
ফ. র. আল সিদ্দিক
ইলেকট্রিসিটি শেখার
সহজ উপায়
সাহিদা বেগম
ছোটদের নজরুল

নাটক/সংগীত/শিল্পকলা/রচনাবলি

সেলিম আল দীন
কিত্তনখোলা
রচনাসমগ্র ৯
নাটকসমগ্র ৪

ওস্তাদ মুনশী রইসউদ্দিন
অভিনব শতরাগ
জাহাঙ্গীর হোসেন
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
জীবন ও কর্ম
সৈয়দ লুৎফুল হক
চিরায়ত চিত্রশিল্পী
ওমর ফারুক
ছোটদের গানের আসর
রাগসংগীত
সামারীন দেওয়ান
হাসন রাজা: জীবন ও কর্ম
সংগ্রাহক: চৌধুরী গোলাম
আকবর সাহিত্যভূষণ
রাধারমণ-সংগীত

মাওলা ব্রাদার্স ৩৯/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন: ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩ ই-মেইল: mowlabrothers@gmail.com

সকল ধরনের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা, পরিকল্পনা,
উন্নয়ন ও প্রকাশনায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সম্পাদনা
SOMPADONA
a manuscript editing & indexing house

ভাষা-সম্পাদনা
বিষয়-সম্পাদনা
বিন্যাস-উপস্থাপনা
নির্ঘণ্ট (index) প্রণয়ন
শব্দসংকেত (glossary) প্রণয়ন
শব্দসংক্ষেপ প্রণয়ন
গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন
তথ্যসূত্র প্রণয়ন
সূচিপত্র প্রণয়ন
প্রুফ সংশোধন ও শৈলী নির্ধারণ
অনুবাদ
অনুবাদ সম্পাদনা
বই পরিচিতি (blurb) লিখন
পাণ্ডুলিপি রিভিউ
পাণ্ডুলিপি পরিকল্পনা
প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র উন্নয়ন

সম্পাদনা
১১০ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
ফোন : +৮৮ ০১৭৬২-০১৬১৩১, + ৮৮ ০১৯১৩-০৪১৩৩৩
E-mail : sompadona@gmail.com
facebook.com/sompadona

শাহবাগের আজিজ মার্কেটের বিপরীতে পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রে আসুন

হোমার ইলিয়াড

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা
মাসরুর আরেফিন

পৃথিবীর প্রথম ক্ল্যাসিক ও প্রথম ট্র্যাজেডিটির এরকম দুর্দান্ত আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ এবারের বইমেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মাত্র ১৪ দিনে ২০০০ কপি নিঃশেষিত

বাঙালি পাঠককে ধন্যবাদ মাত্র ১৪ দিনে ইলিয়াড-এর প্রথম সংস্করণের পুরো ২০০০ কপি বই কিনে নেবার জন্য।

২৫ খণ্ডে
রবীন্দ্রসমগ্র

রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত সমস্ত বাংলা ও ইংরেজি রচনা
আলোকচিত্র, পাণ্ডুলিপি, চিত্রকলা ও চিঠিপত্রসহ

খণ্ড ২৩
রবীন্দ্রসমগ্র

'নারীসমাজ' শিরোনামায় এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৫৩ জন রবীন্দ্রচিঠিপ্রাপক নারীকে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন মুসলিম নারী।

চিঠিপ্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন : নির্মলকুমারী মহলানবিশ (চিঠির সংখ্যা ৫০২), হেমন্তবালা দেবী (২৬৪), রাণু মুখোপাধ্যায় (২০৮), মৈত্রেয়ী দেবী (১৩০), কাদম্বিনী দত্ত (৯৬), প্রমুখ। রবীন্দ্রচিঠিপ্রাপক মুসলিম নারীরা হলেন : সুফিয়া এন. হোসেন (সুফিয়া কামাল) (৩), বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (৩), প্রমুখ।

মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০১৪ -প্রাপ্ত

খণ্ড ২৪
রবীন্দ্রসমগ্র — প্রকাশিতব্য

'মুসলিম-সমাজ, বিদ্বজ্জন ও বিবিধ' শিরোনামায় এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রায় ১৬৫০টি চিঠি।

ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র

ও আরও চারটি ছোট বই

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা
মাসরুর আরেফিন

২০১৩ শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা হিসাবে "চিত্তরঞ্জন সাহা পুরস্কার"
"ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার-২০১৪"

প্লেটো

ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা:
আমিনুল ইসলাম ভুইয়া

বাংলায় সাত খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে প্লেটোসমগ্র। তার ভেতর থেকেই প্লেটোর অমূল্য ও জ্বলজ্বলে পাঁচটি সংলাপ বেরুলো ছোট বইয়ের আকারে।

ক্রিতো সক্রেটিসের জবানবন্দি
ইউথিফ্রো প্রোতাগোরাস মেনো

পাঠক সমাবেশ
৯৬৬৯৫৫৫, ৯৬৬৪৫৫৫, ০১৮১৯২১৯০৮১
pathak @bol-online.com

বইমেলা শেষে পাওয়া যাচ্ছে পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রে ও অন্যত্র।

নুরুল করিম নাসিমের বই

গুডমর্নিং গুরুদেব (কবিতা)
মূল্য : ১২০.০০ টাকা

যে শহরে এখন শেষরাত (উপন্যাস)
মূল্য : ১৫০.০০টাকা

অয়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (তিনতলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৮১৮০০৫২১৯

শিপুর দিনরাত্রি
কিশোর উপন্যাস
মূল্য : ৭০ টাকা

যে যার ভূমিকায়
গল্পগ্রন্থ

সাক্ষাৎকার ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য
মূল্য : ৩০০ টাকা

দূরের হাওয়া
বিশ্বসাহিত্যের প্রবন্ধ সংকলন
মূল্য : ১৫০ টাকা

অয়ন প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রিয়গল্প
গল্পগ্রন্থ
মূল্য : ১০০ টাকা

আড়িয়েল
কানাডা

বিশ্বসাহিত্যের কথাশিল্পী তেরো
বিশ্বসাহিত্যের প্রবন্ধ সংকলন

অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৭৭

দেবানন্দ সরকারের বই

আমাদের ছোটগল্পের গতানুগতিকতার বাইরে দেবানন্দের দেখার চোখ নতুন। উন্নত দেশগুলোতে প্রবাসী বাঙালিদের সংগ্রামকে তিনি স্বতন্ত্র চোখে দেখতে পারেন। আবার প্রবাসে থেকেও অনুভব করেন দেশের অভ্যন্তরের সামাজিক নানা টানকে। পাঠক ওর গল্প পড়লে কিছু ভাবনা আর আনন্দের খোরাক পাবেন।

মিজান পাবলিশার্স অনন্যা

সংঘ প্রকাশন শুদ্ধস্বর

পাওয়া যাচ্ছে rakamari.com-এ

লোকালপ্রেস

প্রকাশ উদ্যোগ

এর বই

রুদ্ধচিন্তায় আচ্ছন্ন রাজনীতি (প্রবন্ধ)/ রণেশ মৈত্র
দুর্মুখ দরবার (কলাম সংগ্রহ) / পঙ্কজ ভট্টাচার্য
চির বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা (কাব্যগ্রন্থ)/ পূরবী মৈত্র
প্রান্তিক বাঁকে বিস্মিত দৃশ্যাবলী (গল্পগ্রন্থ)/ মামুন ম আজিজ
অর্তনিশ (উপন্যাস)/ রুমানা বৈশাখী
উত্তরাধিকারের হাতে (কাব্যগ্রন্থ)/ মুনশী সাঈদ
নিত্যকেই দেখি চিরকাল (কাব্যগ্রন্থ)/ কাজী সুফিয়া আখতার
পাখি হব (ছড়াগ্রন্ধ)/আতিক হেলাল
নিশিপদ্ম দিন (গল্পগ্রন্থ)/ আক্তারুজ্জামান
বেশরম কাউয়ার গতর (রম্যরচনা)/ অহমেদ মুকুল
ঝুনঝুনি (ছড়াগ্রন্থ)/ মোহাম্মদ শাহজাহান
পা পিছলানো পাঁচ পংক্তি (কাব্যগ্রন্থ)/ মিলন মাযহার
সোনালী দেশের রুপালী ফসল (নিবন্ধগ্রন্থ)/ গৌতম কুমার রায়
আনকো গল্প (গল্পগ্রন্থ)/ লাইলা খালেদা
ওগো মোর দেহ প্রভু (কাব্যগ্রন্থ)/ আদিত্য শাহীন
Part of Sky (poetry book)/ Akash Samad

লোকালপ্রেস
৬৮/ক খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া (হাজীপাড়া)
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯। ফোন : ৯৩৩৬৮২৯
email: localpress2000@gmail.com

বইমেলা ২০১৫

লুৎফর রহমান রিটন-এর

নতুন বই

লিলিপুটের ছোটভাই/ছড়া
চন্দ্রাবতী
আমাদের ছোটনদী/স্মৃতিগদ্য
চন্দ্রাবতী একাডেমি
স্মৃতির জোনাকিরা/স্মৃতিগদ্য
কথাপ্রকাশ
বঙ্গবন্ধুসমগ্র
কথাপ্রকাশ
হরিণ একটা বান্ধা ছিল গাছেরই তলায়/বড়দের ছড়া
অন্যন্যা
রসগোল্লাটা কথা বলে!/গল্প
অনার্য
অ্যাভাল্ট ছড়াসমগ্র
অনিন্দ্য প্রকাশন
ধুত্তুরি/ছড়া
মাওলা ব্রাদার্স
বাঘের বাচ্চা/ছড়া
কালান্তর প্রকাশনী

বইমেলা ২০১৫

আমীরুল ইসলামের নতুন বই

ছড়া তুমি কোথা হইতে আসিতেছো
এক কম একশো ছড়া
ধ্রুব কি প্রচ্ছদ আঁকবে না
বেলুন, টাট্টুঘোড়া ও পরীদের ছড়া
অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা

এক শিকারী ও হীরামন পাখি
শিশুরাজ্য, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প
কথাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা

মিঠুয়া, বেলুনমামা ও গাছেদের গল্প
শাহীন প্রকাশনী, ঢাকা

রুমঝুমপুর
অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা

ছোট ছোট নীতিগল্প
(৫খণ্ড)
ছোটদের মেলা, ঢাকা

জলকন্যা, আনন্দনগর ও পাতালপুরের রূপকথা
অন্বেষা, বাংলাবাজার, ঢাকা

মিছিলের রূপকথা
চন্দ্রাবতী একাডেমী, ঢাকা

লুকোচুরি ও আমার মা
গোল্ডেন বুকস, ঢাকা

আমীরুলের নির্বাচিত ছড়া
পাঠক, কলকাতা

অবসর এবং প্রতীকের নতুন বই

গবেষণা

গোলাম মুরশিদ
রেনেসন্স, বাংলার রেনেসন্স ১০০০.০০

গোলাম মুরশিদ
রবীন্দ্রমানস ও সৃষ্টিকর্মে পূর্ববঙ্গ

রাজু আলাউদ্দিন
দক্ষিণে সূর্যোদয় ৫০০.০০

অভিজিৎ রায়
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো
এক রবি-বিদেশিনীর খোঁজে ৩০০.০০

উপন্যাস

শাহাবুদ্দীন নাগরী
নব্বই সেকেন্ড ১২৫.০০

পলাশ মাহবুব
হঠাৎ খলিল ১৬০.০০

মোস্তফা কামাল বিপ্লব
মেঘে ঢাকা নীলিমা ১৫০.০০

ফিওদর দস্তইয়েফস্কি
সাদা রাত ১৫০.০০
অনুবাদ : মশিউল আলম

গল্প

স্পেনের গল্প
হোসে মারিয়া মেরিনোর
নির্বাচিত গল্প ১৭৫.০০
অনুবাদ : তরুণ ঘটক

সংকলন

সম্পাদনা : সৈয়দ আজিজুল হক
শ্রেষ্ঠ মানিক/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
উপন্যাস সমগ্র ১৩/হুমায়ূন আহমেদ

অভিধান

পূরবী বসু
সম্প্রীতির জন্যে শব্দাবলি ১০০.০০

প্রবন্ধ

সম্পাদনা : বেগম আকতার কামাল
বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও
সমালোচনাতত্ত্ব ৫৫০.০০

আবদুল হক
ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব

কম্পিউটার

মোস্তফা কামাল বিপ্লব
কম্পিউটার টিপ্স ২০০.০০

দর্শন / সমাজতত্ত্ব

ড. এম. মতিউর রহমান সম্পাদিত
মার্কসীয় দর্শন : মানুষ ও সমাজ (৩ খণ্ড)
সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব (৩ খণ্ড)

ভ্রমণ

শাকুর মজিদ
প্রাগের ঠাকুরোভা লবণপুরের মোজার্ট

রম্য/জোকস

বিশ্বজিৎ দাস
মোখলেস ভাই উপাখ্যান-৪
ধরাশায়ী মোখলেস ভাই ১৫০.০০

আহসান হাবীব
জোকসসমগ্র-৪ ৫৫০.০০

আহসান হাবীব
রম্যসমগ্রং-৩ ৪৫০.০

চন্দ্রাবতী একাডেমির কয়েকটি নতুন বই

ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত হোক আগামী দিনের শক্তি

চন্দ্রাবতী একাডেমি

২/২-সি (চতুর্থ তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০ ফোন : ৯৫১৫৬৮৮ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১২৫৩২২
email : chandrabatiacademy@yahoo.com web : www.chandrabatiacademy.com

অনুপম প্রকাশনীর কিছু প্রকাশনা

স্বাধীনতার পটভূমি : ১৯৬০ দশক • ড. মোরশেদ শফিউল হাসান ৳ ৪৫০
বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত • মাহবুব-উল-আলম ৳ ৭০০
একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর • ড. সুকুমার বিশ্বাস ৳ ৬০০
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা • ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী ৳ ৫০০
স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম • পূর্ণেন্দু দস্তিদার ৳ ৩০০
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র • বেলাল মোহাম্মদ ৳ ৩০০
আমার একাত্তর ও অন্যান্য • স্বিজেন শর্মা ৳ ২৪০.০০
একাত্তরের রণাঙ্গন : অকথিত কিছু কথা • নজরুল ইসলাম ৳ ৩০০

বাংলাদেশ : রাজনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতি • আবদুল আউয়াল মিন্টু ৳ ১০০০/৮০০
পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া • ড. মোরশেদ শফিউল হাসান ৳ ৮০০
সন্তানকে পিতার কথামালা • আবদুল আউয়াল মিন্টু ৳ ৭০০
আহ্‌দিসুল খাওয়ানিন : চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস • মূল : মৌলভী হামিদুলাহ খান বাহাদুর ৳ ৪৫০
মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ • বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ৳ ১৬০
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ • বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ৳ ১০০

সাহিত্যে শিল্পপ্রতিমা • ড. মাহবুব সাদিক ৳ ৩০০
কিশোরসমগ্র • সাজেদুল করিম ৳ ২৫০
বিলুপ্ত জাতি : বিলুপ্ত জনপদ • ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ৳ ৬৭০
স্পেনে মুসলিম সভ্যতা • ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ৳ ১৮০
রচনাসমগ্র • জহির রায়হান ৳ ৬০০
উপন্যাসসমগ্র • জহির রায়হান ৳ ৪০০
রচনাসমগ্র (১-৪ খণ্ড) • যতীন সরকার ৳ ২৩৫০
গদ্যকার্টুনসমগ্র (১-৪ খণ্ড) • আনিসুল হক ৳ ১৯৫০

ভূতসমগ্র • মুহম্মদ জাফর ইকবাল ৳ ৪৫০
গণিত এবং আরো গণিত • ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও জাকারিয়া স্বপন ৳ ৪০০
লীলাবতী • মূল : ভাস্করাচার্য্য, অনুবাদ : সৌমেন সাহা ৳ ২৫০
প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ • সৌমেন সাহা ৳ ২৫০

কিশোর বিজ্ঞানসমগ্র • আবদুলাহ আল-মুতী ৳ ৪০০
বিজ্ঞানসমগ্র • এ. এম. হারুন অর রশীদ ৳ ৪০০
মহাকাশে প্রাণের সন্ধান • ভবেশ রায় ৳ ৩৫০

কিশোর বিশ্বকোষ জ্ঞানকোষ • ভবেশ রায় ৳ ৬০০
প্রাণিজগতের বিবর্তন : মানুষ যখন থাকবে না • ভবেশ রায় ৳ ৩০০
শতবর্ষে বাঙালির বিজ্ঞান সাধনা • তপন চক্রবর্তী ৳ ৩৫০
পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব • মূল : ডেভিড এটেনবরো অনুবাদ : তপন চক্রবর্তী ৳ ৩৫০

কিশোরসমগ্র • সুব্রত বড়ুয়া ৳ ৪৫০
শিশু-কিশোর বিজ্ঞানসমগ্র • সুব্রত বড়ুয়া ৳ ৩০০
ভয় কিংবা ভালোবাসা • মুহম্মদ জাফর ইকবাল ৳ ২০০
ব্যারন মুনশাউজেনের রোমাঞ্চকর অভিযান • মূল : রুডলফ এরিখ রাস্পে অনুবাদ : ফরহাদ খান ৳ ১৭৫

জ্যোতির্বিদ্যার খোশ খবর • মূল : ইয়াকিভ পেরেলমান, সম্পাদনা : সুব্রত দেবনাথ ৳ ১৫০
নক্ষত্র, নিউরন ও ন্যানো • ড. ফারসীম মাল্লান মোহাম্মদী ৳ ২০০
লোকজ চিকিৎসায় ছেষজ উদ্ভিদ • ড. সামসুদ্দিন আহমদ ৳ ৯০০
ভেসজ উদ্ভিদ লোকজ চিকিৎসা • ড. সামসুদ্দিন আহামদ ৳ ৫০০
আপনার স্বাস্থ্য : কুশলসমগ্র • অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী ৳ ৫০০
ডায়াবেটিস ব্লাডপ্রেশার কোলেস্টেরল হার্ট এটাক • অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী ৳ ৩০০
বাংলার আইনস্টাইন : অমল কুমার রায়চৌধুরী • শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী ৳ ১৪০
বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম • শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী ৳ ২০০

বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা • ভবেশ রায় ৳ ৫০০

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ 'শত বাঙালি মনীষীর কথা' • ভবেশ রায় ৳ ৪০০
শত মনীষীর কথা (১ম-৫ম খণ্ড) • ভবেশ রায় ৳ ১৬৭৫
শেক্সপিয়ার : সেরা ট্র্যাজেডি (জীবনীসহ) • অনুবাদ : ড. মোহীত উল আলম ৳ ৩০০
শেক্সপিয়ার : রোমান ট্রাজেডি (জীবনীসহ) • অনুবাদ : ড. মোহীত উল আলম ৳ ৩৫০
ভাষা ও দেশের গান (স্বরলিপিসহ) • ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ৳ ৩৫০
হারানো দিনের গান (স্বরলিপিসহ) • ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ৳ ৪৫০

নব আনন্দে জাগো (রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি) দুই খণ্ড • ড. করুণাময় গোস্বামী সম্পাদিত (প্রতি খণ্ড) ৳ ৫০০
সোনালি দিনের গান (স্বরলিপিসহ) • স্বরলিপিকার : নিখিলরঞ্জন নাথ (ভূমিকা : ড. করুণাময় গোস্বামী) ৳ ৪০০
সংগীত প্রবেশক (সংগীত শিক্ষার বই) • অনিল কুমার সাহা ৳ ২৫০
বাংলার লোক ও পল্লিগীতি (স্বরলিপিসহ) • সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা : বাবু রহমান ৳ ৬৭০
জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র (প্রকাশিত-অপ্রকাশিত) • ড. ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত [রঙিন ছবিসহ] ৳ ৬৫০

অনুপম প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১১৪২৪৩ email : bvbl@ asiatelnet.com

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের বই

আহমদ শরীফ

বাঙলার মনীষা ৪০০.০০
জাতীয়তা গণতন্ত্র রাজনীতি ৪০০.০০
বাঙলা বাঙালী বাঙালীত্ব ৩৫০.০০
অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ ১৫০

ফয়েজ আহমদ

রাজনীতির গতিধারা ২২৫.০০
রাজনীতি: সাম্প্রতিক ১৩০.০০
মধ্যরাতের অশ্বারোহী (অখণ্ড) ৭০০.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ ২২৫.০০

আল মাহমুদ

কবির আত্মবিশ্বাস ১০০.০০
দিনযাপন ৬৫.০০

ফজলুল আলম

সংস্কৃতিসমগ্র ৬০০.০০
সংস্কৃতির স্বরূপ ও বাঙালি মনন ২২৫.০০
সভ্যতার দুর্গে সংস্কৃতির করাঘাত ১৭৫.০০
সংস্কৃতির সত্যমিথ্যা ২৫০.০০
Told by an Idiot

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রবন্ধসংগ্রহ ১ ৫০০.০০

কবীর চৌধুরী

প্রবন্ধসমগ্র ১ ৪০০.০০
প্রবন্ধসমগ্র ২ ৩৫০.০০
প্রবন্ধসমগ্র ৩ ৩০০.০০
প্রবন্ধসমগ্র ৪ ৫০০.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ ২০০.০০
বিবিধ রচনা ১০০.০০

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

রচনাবলী
১ম খণ্ড ৫০০.০০
২য় খণ্ড ৪৫০.০০
৩য় খণ্ড ৪০০.০০
৪র্থ খণ্ড ৫০০.০০

অনন্যা

৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১৬৪৩, ই-মেইল : anannydhaka@gmail.com

কথাপ্রকাশ
নিবেদিত
শ্রেষ্ঠ ৫০
বরেণ্য জনের জীবনী

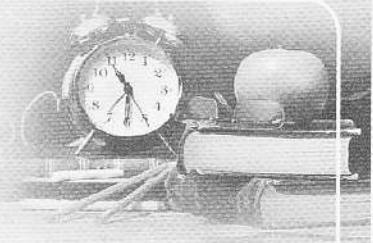

প্রতিটি বইয়ের দাম মাত্র ৭০ টাকা

বাংলার সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু মনীষীর অবদানে পূর্ণ। তাঁদের ত্যাগ, সাধনা, মনীষা ও সংগ্রাম আমাদের দিয়েছে সমৃদ্ধি; তাঁদের অবদানে আমরা দেশে ও বিদেশে একটি গৌরবময় জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত। নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করে গড়ে তুলতে এই সব মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে সবার জন্য সহজপাঠ্য **জীবনী গ্রন্থমালা** সিরিজ প্রকাশ করে চলেছে কথাপ্রকাশ। আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্য অবশ্যপাঠ্য এই জীবনীমালা তাঁদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

২০০৮
- ভাষা শহীদ
- কাজী নজরুল ইসলাম
- বীরশ্রেষ্ঠ
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- অম্বিকাচরণ মজুমদার

২০০৯
- প্রফুল্ল চাকী
- কবি জসীমউদ্‌দীন
- সোহরাওয়ার্দী
- সুকান্ত ভট্টাচার্য
- আরজ আলী মাতুব্বর
- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
- অশ্বিনীকুমার দত্ত
- সত্যজিৎ রায়
- মওলানা ভাসানী
- বেগম রোকেয়া
- জগদীশচন্দ্র বসু
- জয়নুল আবেদিন
- বিদ্রোহী তিতুমীর
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২০১০
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- সুফিয়া কামাল

২০১১
- এস এম সুলতান
- হাজী মুহম্মদ মহসীন
- কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন
- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
- মহাত্মা গান্ধী
- হাছন রাজা
- সোমেন চন্দ

২০১২
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- তাজউদ্দীন আহমদ
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
- ডিরোজিও
- রণেশ দাশগুপ্ত

২০১৩
- মাও সেতুং
- কার্ল মার্কস
- শেক্সপীয়র
- চারণকবি মুকুন্দদাস
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- কাজী আবদুল ওদুদ
- মাস্টারদা সূর্য সেন
- চে গুয়েভারা
- লেনিন
- আবুল হাসান
- মাদার তেরেসা
- কামিনী রায়
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২০১৪
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- মীর মশাররফ হোসেন

২০১৫
- আলফ্রেড নোবেল
- ইবনে সিনা
- লালন সাঁই
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- শামসুর রাহমান
- হুমায়ুন কবির
- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ ফোন : ৯৫৮১৯৪২, ০১৭১৪ ৬৬৬৯৪৬
Email : kathaprokash@gmail.com Web : www.professorsbd.com

কথাপ্রকাশ
সৃজনের আনন্দে পথচলা

আহমাদ মাযহারের নতুন বই

পূর্বসূরিগণ : স্মরণ সত্তা মনন
দাম : ২৫০ টাকা
কথাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা

ছোটদের রঙবেরঙের প্রবন্ধ
দাম : ২০০ টাকা
চন্দ্রাবতী একাডেমী, ঢাকা

রাবেয়া খাতুন : স্বপ্নের সংগ্রামী
(বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের রাবেয়া খাতুন সম্পর্কিত মূল্যায়ন ও পরিচয়ধর্মী রচনা সংকলন)
দাম : ৫৫০ টাকা
অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা

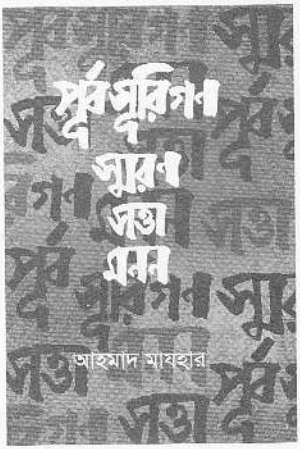

অন্তরশক্তির শ্রীবৃদ্ধির কারিগর

গ্রন্থজগতে জয়নাল হোসেনের প্রাঙ্গণ

জয়নাল হোসেন কোনো একাডেমিক ইতিহাসবিদ নন, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পরতে পরতে তাঁর অনুসন্ধানী বিচরণ। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ে এই ভূখণ্ডের বেশ কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্রের ওপর। জীবনের গল্পকথক বা ইতিহাস-লেখকের পাশাপাশি একজন প্রথাগত ইতিহাসবিদের মতো তিনি জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তুলে এনেছেন। তাঁর স্মৃতি গ্রাম থেকে শহরে নগর থেকে কৃষিক্ষেতে– তাই তার স্মৃতিকথা *প্রাঙ্গণে মোর: টোকা ডায়েরির পাতা থেকে* বইটি পাঠককে নিয়ে যেতে পারে ভিন্ন এক স্বাদে। অ্যাডর্ন থেকে প্রকাশিত ব্যতিক্রমধর্মী একটি স্মৃতিকথা।

প্রাঙ্গণে মোর: টোকা ডায়েরির পাতা থেকে
মূল্য : ৭৫০ টাকা

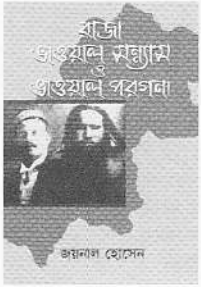

অ্যাডর্ন প্রকাশিত লেখকের আরো ৫টি আলোচিত গ্রন্থ–

বাংলাদেশের ভাওয়াল গড় এক পরিচিত নাম। ভাওয়ালের ইতিহাসে ভাওয়াল সন্ন্যাসী হিসেবে পরিচিত কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরীর দার্জিলিংয়ে অন্তর্ধান, একযুগ পরে আবির্ভাব, জমিদারি দাবি, মামলা, জমিদারি উদ্ধার ইত্যাদি নিয়ে জয়নাল হোসেনের চমৎকার গ্রন্থ *রাজা ভাওয়াল সন্ন্যাস ও ভাওয়াল পরগনা*। দ্বিতীয় সংস্করণ এখন বাজারে।

রাজা ভাওয়াল সন্ন্যাস ও ভাওয়াল পরগনা
মূল্য : ৪০০ টাকা

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে একসময়ে প্রভূত অবদান রেখে আলোচিত ছিলেন কিন্তু হালে বিস্মৃতপ্রায় এমন আটজন মনীষীর জীবনকথা নিয়ে জয়নাল হোসেন প্রণয়ন করেছেন *ব্যতিক্রমী আট* গ্রন্থটি। *ব্যতিক্রমী আট*-এ রয়েছেন– মীর আশরাফ আলী খান, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, কামিনীকুমার দত্ত, ক্যাপ্টেন ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফরিদ উদ্দিন খান ও মৌলবি আবদুল আজিজ।

পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে : ব্যতিক্রমী আট
মূল্য : ৩৫০ টাকা

পর্যটন গুরুত্বে আলোচিত স্থান কক্সবাজারের টেকনাফ। মগ কন্যা মাথিনের সাথে টেকনাফ থানার পুলিশ অফিসার, পরে চিত্রজগতের মহানায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্যের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রেমকাহিনী নিয়ে জয়নাল হোসেনের মাথিনের কূপ একটি অনবদ্য সৃষ্টি। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষের পথে।

মাথিনের কূপ : ধীরাজ ভট্টাচার্য ও তাঁর প্রেম-উপাখ্যান
মূল্য : ২৫০ টাকা

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর মুসলিম নীতি অনুসরণ করে হিন্দুস্তান শাসন করেছেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব। আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহানের নীতির অনুসরণ থেকে সরে এসে কঠোর ইসলামী নীতিতে প্রশাসন পরিচালনার কারণে অনেক ঐতিহাসিকের কাছে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নীতি প্রশ্নবিদ্ধ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রশাসনের নানা দিকের আলোকপাত করে লেখক গবেষক জয়নাল হোসেন চুম্বক আকারে প্রণয়ন করেছেন *উইলে চার টাকা দুই আনা : সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির*।

উইলে চার টাকা দুই আনা
সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভিতর-বাহির
মূল্য: ২৩০ টাকা

শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ জগতে এসে মানুষকে শুনিয়েছিলেন অহিংসার বাণী। সিদ্ধার্থ গৌতম বলেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞানী বা বুদ্ধ হওয়ার মহান শক্তি রয়েছে। যে সকল কাজ করলে তা অর্জন করা যায় সাধনার মাধ্যমে তা সকলের দ্বারাই করা সম্ভব। লেখক গবেষক জয়নাল হোসেন বুদ্ধের জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখেছেন *মানবপুত্র গৌতম : ধর্ম ও জীবনাচার*।

মানবপুত্র গৌতম : ধর্ম ও জীবনাচার
মূল্য: ২৩০ টাকা

Adorn BOOKS

অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০, ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ০১৯২২১০৩৬৩৫
e-mail : adorn@bol-online.com www.adornbooks.com
ঢাকায় পাওয়া যাচ্ছে : প্রথমা, মধ্যমা, পাঠক সমাবেশ, পলল প্রকাশনী, বিদিত, পাঠশালা, প্রকৃতি বাতিঘর, অরণ্য ক্রাফট, Words 'n Pages, PBS ও নিউমার্কেটে এবং চট্টগ্রামে জামাল খানের বাতিঘর

চট্টগ্রামে প্রাপ্তিস্থান
বইআড্ডা
মোহনা ম্যানসন (৩য় তলা), আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম, ফোন: ৬১৯০১০, ০১৮১৯০১৬২৬২

ঘরে বসে অ্যাডর্নের বই পেতে রকমারি অনলাইনে (www.rokomari.com) অথবা ফোনে (01841115115) অর্ডার দিতে পারেন, হটলাইন: ১৬২৯৭

www.adornbooks.com adornbd.com

কবি-লেখক-সাংবাদিক ও ভাষাসৈনিক

তোফাজ্জল হোসেন

কবি-লেখক-সাংবাদিক ও ভাষাসৈনিক তোফাজ্জল হোসেনের রয়েছে ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতাসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গত পাঁচ দশকের বলিষ্ঠ পদচারণা। নানা বিষয়ে লিখলেও তাঁর প্রধান পরিচয় কবি। পরিবেশ বিষয়ে যখন বাংলাদেশে প্রায় কিছুই লেখা হয় নি সে-সময় পরিবেশ নিয়ে লিখেছেন তিনি।

দাম : ১৮০.০০

দাম : ১৫০.০০

দাম : ৫০.০০

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯
দাম : ৩৫০.০০

কবি তোফাজ্জল হোসেন সেই সুদূর বাহান্নো থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করে নতুন শতাব্দ তো বটেই এমনকি নতুন সহস্রাব্দেও এসে উপনীত হয়েছেন।

দাম : ৬০০.০০

দাম : ১২০.০০

দাম : ১২৫.০০

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩
দাম : ২০০.০০

বাস্তবচিত্র সংবলিত অজস্র তথ্যসমৃদ্ধ ও বাস্তব পরিস্থিতির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি– সত্যিকার অর্থেই একটি পূর্ণাঙ্গ 'পরিবেশনামা'।

দাম : ১৫০.০০

দাম : ১৮০.০০

দাম : ৩০০.০০

আগামী প্রকাশনী ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১১১৩৩২

রাবেয়া খাতুনের নতুন বই

ছোটদের চার উপন্যাস
দাম : ৩০০.০০ টাকা
অনন্যা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১৬৪৩

মুক্তিযুদ্ধের গল্প
দাম : ১৫০.০০ টাকা
পাঠক, কলকাতা
৩৬ এ কলেজ রো,
কলকাতা, ৭০০ ০০৯

মূল্য : একশত টাকা মাত্র
সম্পাদক কর্তৃক ৩৬/ডি, ব্লক ডি, সড়ক-২, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত
এবং সংবেদ প্রিন্টিং প্রেস. ৮৫/১, ফকিরের পুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৪ । মুঠোফোন : ০১৭১১৮১৯১৪১, ই-মেইল : boierjagat@gmail.com